সম্পাদকীয়

বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন : অন্য ধারা

জমি আর শ্রম— এই দুই শোষণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে পুঁজি, পুঁজিতন্ত্র। মার্কসের এই বক্তব্য পুঁজিবাদের প্রথম যুগের মতই আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের পর থেকে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ তার সংকট মেটাতে বিশ্বায়নের নামে তার শোষণমূল আরো গভীর করছে। আমাদের দেশে তা একদিকে এসেছে এদেশের জল-জমি-জঙ্গল-খনিজের উপর আক্রমণের রূপ ধরে, অন্যদিকে শিল্পে শ্রমিকের ওপর আক্রমণ, স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ঠিকা শ্রমিক, নিজে উৎপাদন করার বদলে উৎপাদনের অধিকাংশটা ছোট ছোট অসংগঠিত ক্ষেত্রে স্থানান্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রকে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে হাত গোটানোর নির্দেশ দিয়ে, পেটেন্ট আইন বদলের মধ্য দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির শোষণ বাড়িয়ে, কৃষকের সার-বীজ-জলের ওপর তাদের থাবা বাড়িয়ে...। বলতে গেলে বলার নাইকো শেষ।

নব্বইয়ের দশকে শুধু বিশ্বায়নেরই শুরু নয়। সে সময় সোভিয়েত দেশের ও পূর্ব ইউরোপের পতনের সময়। চীনের দ্রুত পুঁজিবাদী বিশ্বের জন্য সস্তায় পণ্য উৎপাদকের ভূমিকা নেওয়ার শুরু। (আমাদের দেশে বাবরি মসজিদ ভাঙা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ দিয়ে নতুন করে আগ্রাসী হওয়ার সময়ও যে এটাই— সেটাও কাকতালীয় মনে হয় না)

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা নব্বইয়ের দশক ছিল এসবের অভিঘাতে বামপন্থীদের বিশ্বাসে চিড় খাওয়ার সময়, পুঁজিবাদীদের মতাদর্শগত বিজয়ের সময়। ভরতুকি বা গরিবদের সাহায্য ('ফ্রি মিল') দেওয়া যাবে না। শ্রম আইন সংশোধন করে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' করার অধিকার দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা : দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ (টিনা), অর্থাৎ পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প নেই।

আক্রমণ নামে মার্কসবাদের ওপর। বলা হয়, এটি একটি পুরনো দর্শন, আজকের দিনে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, এই ধরনের 'গ্রান্ড ন্যারেটিভ' আসলে অচল। সত্য হলো খণ্ড সত্য। মার্কসবাদী পার্টি হলো আর এক ধরনের হায়ারার্কিয়াল ক্ষমতাকেন্দ্র, তাই ত্যাজ্য। বাস্তবের মার্কসবাদী পার্টিগুলির কাজকর্ম, বলা বাহুল্য, এই আক্রমণের বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

কিন্তু এত করেও পুঁজিবাদের একপক্ষীয় বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'উঠোন' লাতিন আমেরিকায়। সেখানে শুরু হলো জন-জাগরণ। কোথাও স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন, কোথাও স্থানীয় নেতৃত্বে আন্দোলন, কোথাও বামপন্থী কোনও এক দলের নেতৃত্বে আন্দোলন। কোথাও রাষ্ট্রক্ষমতায় ক্ষমতাসীন দল জনতার এজেন্ডাকে কাজে লাগাতে শুরু করলে লাতিন আমেরিকার প্রতিবাদ বহু বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করল।

আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশকে একের পর এক বিশ্বায়নের ধাক্কা এসে পড়েছে। মানুষের ওপর নিপীড়ন নেমেছে। কর্ম-হীন 'উন্নয়ন'-এ বেকারি বেড়েছে। কিন্তু তেমন প্রতিবাদ দেখা যায় নি। বরং দেখা গেছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। স্ট্রাইক কমেছে, বেড়েছে মালিকের আক্রমণ, বেড়েছে লক-আউট। কৃষকের জমি কেড়ে বড়লোকের বাড়ি তৈরি হয়েছে। কৃষকদের প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়েছে।

কিন্তু একবিংশ শতকে দেখা গেল অন্য চিত্র। আমাদের রাজ্যের কথাই বলি। 'উন্নয়নের' জন্য চাই আরও শক্তি। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূল হরিপুরে বসবে পারমাণবিক চুল্লি। দেখা গেল, ব্যাপারটা এত সহজে হওয়ার নয়। গ্রামবাসীরা সবাই একজোট হয়ে এলাকা নির্বাচনের জন্য গ্রামে সরকারি প্রতিনিধিদের ঢোকা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা জমি ছাড়তে নারাজ। পণ্ডিত না হয়েও সেখানকার জেলেরা বুঝেছেন যে পরমাণবিক চুল্লি বসলে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁরা জীবিকা ও বাসস্থান হারাবেন।

তার পর সিঙ্গুর। নতুন ধরনের শিল্পে যে বিনিয়োগ হয় তাতে যে কর্মসংস্থান বিশেষ হয় না, সেকথা এতদিন ছিল বই ও পত্রিকার পাতায়। কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষক, বিশেষত ছোটচাষি ও ভূমিহীনরা এই চাষিদের উর্বর জমি দখল করে কর্পোরেট পুঁজি বাড়ানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কর্মসংস্থানের ভুয়ো গল্পে তাঁদের আস্থা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্জয় সাহস নিয়ে তাঁরা আন্দোলনের পথে তাঁরা তা রুখতে সক্ষম হলেন।

নন্দীগ্রাম। গ্রামবাসীদের বিশাল পরিমাণ জমি দখল করে সালেমদের *সেজ* গড়ার উদ্যোগও রুখে দিল গ্রামবাসীদের আন্দোলন। পথ ছিল বন্ধুর, রক্তাক্ত।

উড়িষ্যার পসকো, নিয়মগিরি। খনিজ সম্পদ দখল করে শিল্প গড়বে বহুজাতিক কোম্পানিরা। দীর্ঘদিন ধরে চললো আন্দোলন।

মহারাষ্ট্রের রায়গড়া, জয়িতাপুর, কুদানকুলাম— এই আন্দোলনগুলিও বহুজাতিকদের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ আন্দোলনগুলি মূলত স্বতস্ফূর্ত। স্থানীয়। রাজ্যের মানুষ, নাগরিক সমাজ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের প্রয়োজনেই তৎকালীন বিরোধী দলগুলিও পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আন্দোলন করেছেন স্থানীয় মানুষ, নিজেদের উদ্যোগে।

খনিজ সম্পদে ভরা ছত্তিশগড়ে বহুজাতিকদের আগ্রাসনের ইচ্ছাও ধাক্কা খেয়েছে সেখানে মাওবাদীদের নেতৃত্বে আন্দোলনে। আদিবাসী-প্রধান জঙ্গল এলাকার এ আন্দোলনের চরিত্র অন্য ধরনের।

সব মিলিয়ে আমরা দেখছি, তথাকথিত বামপন্থীরা পিছু হটলেও, অন্য বামপন্থীদের জোর না বাড়লেও জনগণ ইতিহাস গড়ছেন। তাঁরা বহুজাতিকদের বিরোধিতা করছেন, কিছু কিছু সাফল্যও পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বহুজাতিকদের 'উন্নয়নের' মিথ তাঁরা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছেন। তাঁরা জোর গলায় বলছেন, এ উন্নয়ন আমাদের জন্য নয়। এ উন্নয়ন আমাদের ঘর কেড়ে নেয়, আমাদের জীবিকা কেড়ে নেয়, আর পকেট ভরায় দেশবিদেশের বাবুদের। আমরা এ উন্নয়ন চাই না।

আমরা দেখলাম, পুঁজিবাদ শেষ কথা বলে না। বামপন্থীরা আন্দোলন করুন বা না করুন, পুঁজিবাদের রথের চাকায় নিষ্পিষ্ট মানুষ প্রতিবাদ করেন, বাঁচবার জন্য আন্দোলন করেন। কখনো কখনো তাদের থমকে দেন।

কিন্তু এটাও সত্যি যে এই আন্দোলনগুলি তাদের স্থানীয়, ইস্যুভিত্তিক চরিত্র থেকে বেরোতে পারছে না। মনে রাখতে হবে, বিপক্ষে আছে বহুজাতিক পুঁজির দৈত্য, তাদের পাশে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবক শেখাতে উদ্যত মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ, তাদের জোট। তাদের অস্ত্র শুধু মানুষ মারার অস্ত্র নয়, তাদের অস্ত্র কখনও মতাদর্শগত— ভোগবাদের দর্শন, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানসিকতা, মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা। কখনো বাইরে থেকে, কখনো বন্ধুর মুখোশে।

বিপক্ষে যখন দানবদের জোট, তখন জনগণকেও যে জোটবদ্ধ হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী তার প্রক্রিয়া, তা এখনও অজানা। কোথাও কোথাও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অনৈক্যই প্রধান ধারা।

এই অবস্থায় আমরা *অনীক*-এর এই সংখ্যাটির পরিকল্পনা করি, যাতে বিশ্বায়ন-বিরোধী এই আন্দোলনগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়। এগুলির শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করা যায়। আলোচনা ওঠে, কী করে এই আন্দোলনের শক্তিকে আরও জোরদার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সঠিক দিশায় চালিত করা যায়।

বলা বাহুল্য, আন্দোলনের শক্তিগুলির মধ্যে, আন্দোলনের সহযোগী শক্তিগুলির মধ্যে, বামপন্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। তাই লেখাগুলির বক্তব্য একমুখী নয়, নানা ধরনের। আজকের দিনে এটাই হওয়ার কথা, হওয়া দরকারও বটে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক জনগণের পক্ষকে শক্তিশালী করবে।

এই বিষয়ে লেখাগুলি আমরা সাজিয়েছি কয়েকটি পর্যায়ে। প্রথমে রতন খাসনবিশ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও সুচরিতা সেন-এর লেখাগুলি এই আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সাধারণ পর্যালোচনা। শ্রী খাসনবিশের লেখায় বামপন্থীরা কেন এই আন্দোলনগুলিকে ধরতে পারছেন না থেকে শুরু করে এই আন্দোলনগুলিকে সমাজতন্ত্রের দিকে সাধারণ দিশায় পরিচালিত করা কেন জরুরি সেটা বলা হয়েছে। শুভেন্দু দাশগুপ্ত জোর দিয়েছেন ছোট আন্দোলন, স্থানীয় আন্দোলন, স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের চরিত্রের ওপর। সুচরিতা সেনের লেখায় আলোচিত হয়েছে দেশবিদেশের নানা আন্দোলনের কথা। কোথাও স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন কোনও দলের জন্ম দিয়েছে। কোথাও আবার চরম নিপীড়নের সময় পার্টিও দলহীন আন্দোলন তৈরি করেছে, তাতে যোগ দিয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে কখনও শক্তিশালী হয়েছে বামপন্থীদের হাত, কোথাও আবার দক্ষিণপন্থীরা।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলি এদেশের বিভিন্ন ধারার আন্দোলনের বিশ্লেষণ। সুকান্ত রায় এই দশকের বিভিন্ন গণ আন্দোলনের কথা বলেছেন এবং সেখানে বিপ্লবী শক্তির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নব দত্ত দেখিয়েছেন, আজকের ভারতে অসংগঠিত শ্রমিক যেখানে সংখ্যার বিচারে বিশাল সংখ্যাগুরু, বামপন্থীরা তাদের সংগঠিত করার ব্যাপারে প্রায় কিছুই করে নি। এই ফাঁকা জায়গা পূরণ করেছে এনজিও-রা। কাম্য না হলেও এটাই বাস্তব। এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শ্রী দত্ত। পার্থসারথি রায় আলোচনা করেছেন শহরের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে। শ্রী প্রণব দে-র আলোচনার বিষয়বস্তু জমি নিয়ে আন্দোলন, যেটিকে এই বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলনগুলির প্রধান ধারা বলা যায়। শ্রী সমরেশ মিত্র-র লেখায় রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের কথা। এই আন্দোলনে বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারার অবস্থানের কথা তিনি এই লেখায় আলোচনা করেছেন।

এর পরবর্তী প্রবন্ধগুলি হলো কিছু বিশেষ আন্দোলনের কথা। পসকো আন্দোলনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন সন্দীপ কুমার পট্টনায়ক। পার্থসারথি রায়ের সংযোজনটি তার রাজনৈতিক পর্যালোচনা। ফেলিক্স পেডাল লিখেছেন নিয়মগিরির আন্দোলনের কথা।

এ পর্যন্ত যে আন্দোলনগুলির কথা আলোচনা হয়েছে তা সবই গ্রামীণ জনতার আন্দোলন। দিল্লীর কাছে গুরগাঁও অঞ্চলের মূলত অটোমোবাইল ও সহযোগী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের যে আন্দোলন চলছে সেগুলি সাবেকি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে কিছুটা অন্য ধরনের। শ্রমিক নেতৃত্বে চলা এই সংগ্রামের কথা লিখেছেন অমিত।

এই ধরনের আন্দোলনের কথা বললেই মনে আসে নর্মদা আন্দোলন ও মেধা পাটকরের কথা। এই সংখ্যায় আমরা মেধা পাটকরের একটি সাক্ষাৎকার ছাপছি। সাক্ষাৎকার থাকছে এআইটিইউসি নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত ও সিটু নেতা দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর।

এ ছাড়াও অন্য দুটি সাক্ষাৎকার আমরা প্রকাশ করছি। সাধারণভাবে বামপন্থা ও অন্য ধারার আন্দোলন নিয়ে সাক্ষাৎকারটি শোভনলাল দত্তগুপ্ত-র। অন্য ধারার আন্দোলন ও তাতে এনজিও-দের ভূমিকা নিয়ে সাক্ষাৎকারটি সত্যব্রত চক্রবর্তীর।

এই সংখ্যাটি পরিকল্পনা ও রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য করেছেন বন্ধু বিশ্বজিৎ রায়। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শেষ করার আগে এই সংখ্যার জন্য লেখায়, সাক্ষাৎকারে, অনুবাদে ও অন্য কাজে সাহায্য পেয়েছি সেই বন্ধুদের জানাই ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই প্রেসের কর্মীদের। এবং সর্বোপরি ধন্যবাদ আমাদের সাথী গ্রাহক ও পাঠক বন্ধুদের।

ঘটনাপ্রবাহ

ইতিহাসচর্চা ও সন্ত্রাসবাদ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী ইত্যাদি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীকে 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' বলায় বিতর্ক তীব্র রূপ নিয়েছে। কিছু টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদটি যে ভাবে প্রচারিত হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে বিষয়টি ঐতিহাসিক বিতর্কের ক্ষেত্র অতিক্রম করে রাজনৈতিক বিতর্কের পরিসরে চলে এসেছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমারও নিজস্ব একটা অবস্থান রয়েছে। প্রথমেই বলে রাখি, বিষয়টি সম্পূর্ণ সারস্বত; এখানে রাজনৈতিক বক্তব্যের কোনো স্থান নেই। দ্বিতীয়ত, 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' এই শব্দবন্ধটিকে আদৌ আপত্তিকর বলে আমি অন্তত মনে করি না। একজন বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বিদেশি শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির আশ্রয় নিতেই পারেন। আর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাস ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ধারা। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের তথাকথিত বিতর্কিত অংশ পড়ে মনে হয় না যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। বিষয়টিকে তদানীন্তন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবীরা নিজেদের সন্ত্রাসবাদী অভিধায় আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বয়ং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের লেখায় তার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত দেশজ ঐতিহাসিক 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে রচিত *স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৩) গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ের একটি অংশের নাম 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' (পৃ. ১২২)। এই অংশটির লেখক অমলেশ ত্রিপাঠি।

বিগত তিন দশক ধরে সুমিত সরকারের *মডার্ন ইন্ডিয়া*-র সংস্পর্শে আসেননি ইতিহাসের এমন ছাত্র বিরল। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত এই গ্রন্থ। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় Political and Social Movements। এই অধ্যায়ের একটি অংশ The Shift to Terrorism (সন্ত্রাসবাদের অভিমুখে)-এ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের কথা আছে। এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকারের সুচিন্তিত মন্তব্য— ''কখনও কখনও কারও ইচ্ছে থাকলেও এটি কখনোই নাগরিক গণ-অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা ভিত্তির পর্যায়ে ওঠেনি। 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি তাই বেঠিক নয়।'' (*মডার্ন ইন্ডিয়া*, ম্যাকমিলান, ১৯৮৩)

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ঐতিহাসিক শেখর বন্দোপাধ্যায় লিখিত *From Plassey to Partition : A History of Modern India* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে (Early Nationalism) 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ' (Revolutionary Terrorism) শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন— ''বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ইতিমধ্যে জনমানসে বৈধতা পেতে শুরু করেছিল, কারণ বহু মানুষই এই পন্থাকে নরমপন্থী ভিক্ষাবৃত্তির কার্যকর বিকল্প হিসাবে দেখেছিলেন (*From Plassey to Partition,* Orient Longman, 2004, p. 261)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক— জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী ও উদারপন্থী— সকলেই 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ' কথাটি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। উপরোক্ত ঐতিহাসিকরা কেউই কিন্তু বিপ্লবী জাতীয় সংগ্রামীদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি। একই সঙ্গে বলা যায়, বিতর্কিত স্কুলপাঠ্য বইটিতেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা হয় নি।

আমি একটি বিষয় বুঝতে পারি না, সমালোচকরা, বিশেষত যারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেন, তাঁরা সন্ত্রাস শব্দটির প্রতি এত স্পর্শকাতর কেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রচারপুস্তিকায় লেখা হয়— ''কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার কর্তব্য হল বিভিন্ন স্তরের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সমর্থন আদায় করা, বিশেষত যারা মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছে তাদের কাছে টানা'' (Horrace Williamson, *India and Communism*, Calcutta, pp.187-188)।

সাম্প্রতিক বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। বহু বিতর্কের পরও রাষ্ট্রসংঘ 'সন্ত্রাস' কথাটির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজে পায় নি। রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ১৯৮৪ সালে সন্ত্রাসের একটি সংজ্ঞা স্থির করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯৮-তম কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— ''সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলতে বোঝায় কোনো হিংসাত্মক কাজ যা মানুষের জীবনের প্রতি বিপজ্জনক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ যে কোনো দেশের ফৌজদারি আইনের পরিপন্থী এবং যে কাজ সাধারণ মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন ও দমন করে এবং দমনমূলক নীতির মাধ্যমে কোনো সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করে অথবা গুপ্তহত্যা ও অপহরণের মাধ্যমে কোনো সরকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।'' উপরোক্ত আইনের উল্লেখ করে নোয়াম চমস্কি বলেছেন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আইনের বিচারেই বলা যায়— ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পোষ্য রাষ্ট্রগুলি সবচেয়ে অগ্রণী সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র।'' (Noam Chonsky, *9/11*, Dehradun, 222, p.16)

আলেক্স জর্জ সম্পাদিত *Western State Terrorism* গ্রন্থে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিখাইল স্টোহ্ল লিখেছিলেন— ''বৃহৎ

শক্তিবর্গ যখন তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে অন্যায় হত্যালীলা চালায়, তখন আমরা তাকে বলি দমনমূলক কূটনীতি (Coercive diplomacy); তাকে আমরা সন্ত্রাসবাদ বলি না।'' সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতিতে যখন দেখি হামাস ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জঙ্গি আক্রমণ চালায়, তখন তাকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। কিন্তু ইজরায়েল যখন প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করে, তখন কিন্তু আমরা তাকে সন্ত্রাসবাদ বলি না।

একথা সত্যি যে বিগত ১০০ বছরে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু আজও অপরিবর্তিত। আবহমান কাল ধরে সন্ত্রাসের দুটি দিক স্পষ্ট। একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস, যা ওপর থেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর একটা হলো সেই সন্ত্রাস মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠী পরিচালিত তলা থেকে উঠে আসা সন্ত্রাস। দু ধরনের সন্ত্রাসই যখন নিরপরাধ সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, তখন তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করা উচিত। আবার একই সঙ্গে একথাও সত্যি যে রাষ্ট্র বনাম সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র অনেকেটাই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

স্কুলের পাঠ্য বইয়ে 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ' কথাটি থাকা উচিত কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। সব রকম মতামত সেই বিতর্ক থেকে উঠে আসুক। সমৃদ্ধতর হোক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্র। কিন্তু এই বিতর্কে রাজনীতির কোন স্থান নেই। একটি পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করা বা সংশ্লিষ্ট বইটিকে অগ্নিদগ্ধ করা— কোনোটাই সারস্বত সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। সবশেষে বলি— পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিককে নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গ্রহণ করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

সিদ্ধার্থ গুহ রায়

উটের নাক হইতে সাবধান

ডব্লিউটিও এবং খাদ্য নিরাপত্তা

বর্তমান তেলেঙ্গানার একটি চাষিদের গ্রাম। তার পাশে হঠাৎ এক রাসায়নিক কারখানা। তারপর দেখা দিল বীভৎস দূষণের প্রভাব। নদীর জল গেলো বিষিয়ে। জমির রং বিষের কারণে পাল্টে গেল। চাষ-আবাদ বন্ধ হল। গবাদি পশুরা নদীর জল খেয়ে অসুস্থ। গ্রামের মানুষ সুবিচার চাইতে গেল সরকারের কাছে। 'মানুষের সরকারের' তৈরি পিসিবি বা পলুশান কন্ট্রোল বোর্ডে গিয়ে আর্জি জানাল সুবিচারের আশায়। অদ্ভুত জবাব পাওয়া গেল পিসিবি-র কাছ থেকে। তাঁরা গ্রামের মানুষকে শাসালেন—

''তোমরা প্রমাণ করতে পারবে যে ঐ কারখানার জন্য জলের দূষণ হচ্ছে? শুধু শুধু তাদের দোষারোপ করে যাচ্ছো!''

যখন প্রেস থেকে প্রশ্ন করা হয়—

''আচ্ছা প্রমাণ-টমান করার কাজ, নমুনা সংগ্রহের কাজ তো আপনাদের, সেটা চাষিরা কি করে করবেন?''

তখন পিসিবি-র তরফ থেকে জবাব আসে—

''আরে মশাই আপনারা জানেন না, চাষাভুষাগুলো আসলে অলস, কাজ না করে ক্ষতিপূরণের টাকায় বসে বসে খাওয়ার জন্যই এসব ফন্দি-ফিকির করছে।''

এরকম এক আপাত অদ্ভুত কিন্তু প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনা দেখা গিয়েছিল সাম্প্রতিক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র মিটিং-এ। দেখা গেল, নতুন ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ আজেভেদো (ব্রাজিলের মানুষ) খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে সরাসরি আমেরিকার পক্ষ নিয়ে উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। তবে তাঁবেদারিতে তো ভারতীয়রা কোনোদিনও কম যাননা, মীরজাফরে উপচে পরা দেশ আমাদের, তাই আমাদের আগের বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা এবং মনমোহন সিং-এর সরকারের তরফ থেকেও আমেরিকার তরফদারিই করা হয়। কী বিষয়ে? এবার আসব সে কথায়, বিষয়টা বড়ই গভীর। বিষয়টা জড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে।

মুক্ত বাণিজ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

তো সাম্প্রতিক ইস্যুটি ঠিক কী? ইস্যুটি এই যে, ভারতকে ডব্লিউটিও-র তরফে চাপ দেওয়া হচ্ছে খাদ্য মজুত বাবদ যে ভর্তুকি সরকার দিয়ে থকেন তা কমিয়ে আনার জন্য। এবং অদ্ভুত এবং বেশ খানিকটা ব্যতিক্রমীভাবেই দেখা দেল যে ভারতের বর্তনাম সরকার এর চরম বিরোধিতা করলেন। ব্যাপারটা হল এই যে ভারত এই বাবদ ভর্তুকি দেয় ১২০ কোটি মার্কিন ডলার। তো আমেরিকার চাপটা এই যে ভারতকে এই ব্যয়টা ক্রমশ কমিয়ে আনতে হবে। আর খোদ আমেরিকার কৃষিতে ব্লু বক্স বা গ্রিন বক্স ইত্যাদি গালভরা নামে ভর্তুকির পরিমাণ কত? মাত্র ১২০ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু ও নিয়ে কোন কথা হল না। আলোচনা এবং শোরগোলটা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস যে দেশে সেই দেশের দেওয়া অপরিহার্য কিছু ভর্তুকি নিয়ে। কেন?

ডব্লিউটিও-র ইতিহাস

সাম্প্রতিক এই ধরনের ঘটনার গুরুত্বটা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সংক্ষেপে দেখে নিতে হবে ডব্লিউটিও-র ইতিহাস। আর তার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ১৯৩০-৪০-

এর দশকে। ১৯৩০-এর মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেশান-এর ফলে দেখা গিয়েছিল বিশ্বব্যাপী চাহিদার আকাল। বাজারে চাহিদা নেই। এবং অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও বাজারে চাহিদা বাড়ানো যাচ্ছিল না। আর ১৯৩০-এর দশকেই ধনী দেশগুলো প্রত্যেকেই 'বেগার দাই নেবার' পলিসি নিয়েছিল— যার অর্থ হলো প্রতিবেশী দেশের ক্ষতির মূল্যে নিজের লাভ করা। প্রত্যেকেই মুদ্রার ডি-ভ্যালুয়েশন করে রপ্তানি করতে চাইছিল। এবং কার্যত 'কারেন্সি ওয়ার' তৈরি হয়েছিল। ধনতন্ত্র চলে গিয়েছিল একেবারে খাদের কিনারে। এমতাবস্থায় প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ জন মেয়নার্ড কেইন্স বিশ্ব অর্থনীতির জগতে পা রেখে ধনতন্ত্রের রক্ষাকবচ তৈরি করেন। বলা হয় 'কেইন্স হলেন ধনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা'। কেইন্স এটা বুঝেছিলেন যে, ধনতন্ত্র টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতিতে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এবং তিনি আরও বুঝেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী বিকাশ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বরং অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ ধনতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করবে। তাই উনি ১৯৩০-এর মহামন্দার মোকাবিলায় সরকারকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বাজারে চাহিদা তৈরি করার কথা বলেন। ওনার সেই বিখ্যাত উক্তি হল— "প্রয়োজনে গর্ত খুঁড়ে আবার সেই গর্ত বোজান, আর বাজারে কাজ তৈরি করুন, চাহিদা তৈরি করুন।" ১৯৩৬-এ কেইন্সের বই 'জেনেরাল থিয়োরি' বের হয় কিন্তু তখনও কেইন্সের কথা পুঁজিপতিদের লবি এবং মুক্ত বাজারপন্থী অর্থনীতিবিদরা মেনে নেননি। বরং তাঁরা চাহিদা তৈরির এক আদিম রাস্তার দিকেই হেঁটে ছিলেন। ফলাফল ১৯৩৯-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। চাহিদা তৈরির সম্ভবত সব থেকে প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে 'মহত্তম' উপায়।

তবে যাই হোক, ১৯৪০-এর পর থেকে ধীরে ধীরে কেইন্সের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। কারণ এদিকে যেমন তখন ধনতন্ত্রের সঙ্কট চলছে, অন্যদিকে তখন মনে হয়েছিল যে গোকুলে বেড়ে চলেছে সমূহ বিপদ— যার নাম সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। অতএব পুঁজিবাদী বিশ্ব কেইন্সের মার্গ দর্শনে সরকার নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পথেই হাঁটা লাগাল। ১৯৪৫-১৯৭৫ সেই পথেই চলেছিল। তাই ১৯৪৪ সালে ব্রিটনউডসে ৪৪টি দেশকে নিয়ে তৈরি হয় দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা— আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড) এবং আইবিআরডি (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকসশান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)— এটাই পরবর্তীতে 'বিশ্ব ব্যাংক' নামে খ্যাত হয়। কিন্তু এটির প্রথম নামটি প্রণিধানযোগ্য— 'রিকন্সট্রাকসশান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর জন্য ব্যাংক, অর্থাৎ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ঋণ দেওয়া। খানিকটা ওই আগেকার দিনের জমিদারদের গল্পের মতো। যেখানে জমিদাররা প্রজাদের ঘরবাড়ি প্রথমে জ্বালিয়ে দিতেন আর তারপর তারাই আবার ঋণ দিয়ে সেই প্রজাদের সারা জীবনের মতো ঋণজালে বেঁধে ফেলতেন। অর্থাৎ একবার যুদ্ধ করে লুঠ করার নীতি আর তারপরে ঋণের জালে জড়িয়ে গরিব দেশগুলোক আরও একপ্রস্থ লুঠ করার এ এক অমোঘ নীতি। এই ঋণজালে জড়িয়ে গরিব দেশগুলোকে লুঠ করার গল্প গত সংখ্যায় অনীক-এর 'শকুনির উত্তরাধিকার' লেখাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

ফিরে আসা যাক আগের কথায়। আইএমএফ ও আইবিআরডি ছাড়াও ওই সময় কেইন্স আরও একটি সংস্থার রূপরেখা তৈরি করছিলেন— 'আইটিও' (ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অরগানাইজেশন), যা কিনা বিশ্ব বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু যেহেতু তখন পুঁজিবাদী শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে ছিল তাই তারা তখন চাইল সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকেই দেশীয় বাজারকে কব্জা করতে। তাই তখন আইটিও কলকে পেল না। কিন্তু ১৯৪৫-১৯৭৫ এই সময়কালে দেশীয় বাজার দখল ও পুঁজির বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ যে শক্তি সঞ্চয় করে তার ফলেই ১৯৭৫-এর পর থেকে মুক্ত বাণিজ্যের ধুয়ো তুলে বিশ্ব বাজারকে দখল করার জন্য এরা আদা-জল খেয়ে লেগে পড়ে। আর তারই ফলস্বরূপ আইটিও-র খসড়াকে মাথায় রেখেই ১৯৯৫ সালে এসে তৈরি হয় ডব্লিউটিও। যার একমাত্র লক্ষ্য হল বাজারের ক্রমাগত প্রসার। অর্থাৎ যেখানে যে দেশেই বহিরাগত পণ্যের ওপর যে বাধানিষেধ ছিল সেগুলো ক্রমশ তুলে দেওয়া। কুমারী বা ভার্জিন বাজারকে বৃহৎ পুঁজির সামনে নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এসেই ডব্লিইটিও প্রথমে যেটা করল সেটা হলো এর সদস্য দেশগুলিকে 'কোটা' তুলে দিতে বাধ্য করল।

"উটটা বলল তাঁবুর মধ্যে শুধু নাকটুকু রাখবো, আর কিছুটা, বাকিটা বাইরে থাকবে।" তারপর কী হয়েছিল সেটা আমাদের জানা আছে। সেই ট্র্যাডিশানকে চালিয়ে যেতেই হয়ত 'কোটা' (Quota)-র পর এল 'টারিফ' (Tariff) অথবা আমদানি শুল্কর পালা। ডব্লিউটিও-র সমস্ত সদস্য দেশগুলিকে বলা হল আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিতে। "কী করব বলুন, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা জমে যাচ্ছি, তাঁবুর মধ্যে অন্তত মাথাটুকু গলাতে দিন, বেশি না শুধু এই গলা অবধি, বাকিটা বাইরেই থাকবে, তাঁবুতে আপনার জায়গার কোন অভাব হবে না।" তাও হলো। আমদানি শুল্ক কমানো হল। এরপরে ডব্লিউটিও-র কর্তাব্যক্তিরা এবং বড়দাদা আমেরিকা ধীরে ধীরে সুর চড়ালেন— ভারত যে খাদ্যে ভর্তুকি দিচ্ছে সেটা বিশ্বে খাদ্যপণ্যের বাজারে একটি অসামঞ্জস্য তৈরি করছে, অতএব ভারতে খাদ্য ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। "আর পারা যাচ্ছেনা, অনেক সহ্য করেছি। এবার একটু সরুন দেখি, আমি আর আপনি তাঁবুতে ভাগাভাগি করে ঘুমোই। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপব আর আপনি আরামসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন সেটা হয় নাকি?" খাদ্যে ভর্তুকি কমানোর এই চাপটাকেই গতমাসে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা গেছে। এর মানে এটা নয়

যে সমস্যা মিটে গেছে। কারণ ভারত ভর্তুকি কমাতে রাজি না হওয়ায় দেখা গেল বিশ্বব্যাপী মিডিয়াতে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ভারত সহযোগিতা করছে না, ভারতের জন্য কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য, কোটি কোটি বেকারের চাকরি নাকি আটকে আছে, ভারতের জন্য নাকি ডব্লিউটিও ভেঙে যেতে বসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখানে প্রশ্নগুলো হলো, ভারতের বাজারকে আরও মুক্ত করলে, খাদ্যে ভর্তুকি কমালে— কোন্ বাণিজ্যিক সংস্থাদের লাভ হবে? মার্কিন খাদ্য সংস্থাগুলির নিশ্চয়ই। ভারতের কোটি কোটি গরিবের কি কোনও লাভ হবে? আর ওই কর্মসংস্থানের ফাঁকাবুলিকে আজকাল পাগলেও বিশ্বাস করে না। মনে রাখতে হবে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে যখন ভারতের বাজারকে মুক্ত করা ভারতে তখনও দাবি করা হয়েছিল— রপ্তানি বাড়বে, পণ্যের দাম কমবে, কর্মসংস্থান হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবে কী হয়েছে আমরা সবাই দেখছি— গোটা দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই আজ নুন-পান্তা কিছুই জুটছে না, মানুষ গিলছে শুধুই সস্তা 'এনটারটেনমেন্ট'। তাই শেষমেষ এই প্রশ্নটাই মনে আসছে যে উঠটাকে আমরা আরও জায়গা ছাড়ব, নাকি ঘুম থেকে উঠে উটটার পশ্চাদ্দেশে সজোরে আঘাত হানিয়া উহাকে বিতাড়িত করিব?

মানস

এই রাজ্যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন

গত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এরাজ্যে শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে লাগামছাড়া হয়েছিল। সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার কথা বলে সমস্ত কারখানায় বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের আন্দোলন করার মানসিকতাকে শুধু স্তিমিতই করেনি তার সাথে যেখানে যেখানে শ্রমিকরা মালিকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে সেই আন্দোলন দমন করতে সরকারি পুলিস বাহিনীর দমন চলেছে এবং সমস্ত সরকারি ট্রেড ইউনিয়ন সেই দমনের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন কলকারখানায় মালিকরা ধারাবাহিকভাবে শ্রম আইন ভঙ্গ সহ বিবিধ বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলেও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের বিরুদ্ধে কখনোই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বললেই চলে। ফলে শ্রমিকরা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে শ্রমিকরা বামফ্রন্টের বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে আহ্বান করেছিল। সারা রাজ্যে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মানুষের যে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল সেখানে শ্রমিকদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল।

নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য মমতা ব্যানার্জী শ্রমিকদের জন্য গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গত তিন বছরের তৃণমূলের শাসন এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বামফ্রন্ট যেখানে শেষ করেছিল তারা সেখান থেকেই শুরু করেছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের ওপর লকআউট, মজুরি হ্রাস-এর মতো সমস্ত আক্রমণ আরো বেড়েছে। বড়ো আঘাত এসেছে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের ওপরেও। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পরে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে। সরকারে আসার পরেই বন্ধ হয়েছে বিড়লা পরিচালিত হিন্দুস্তান হেভি কেমিক্যালস। সেখানে শ্রমিকদের ক্যাজুয়াল হিসেবে ৫০ টাকায় কাজ করানো হত। শ্রমিকরা ৮০ টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে কারখানাটাকেই সেই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার নিশ্চুপ থেকে বুঝিয়ে দেয় যে মালিকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ তারা নেবে না। আক্রমণ নামানো হয়েছে মেট্রো ডেয়ারির শ্রমিক আন্দোলনের ওপরে। ঘটা করে পবন রুইয়ার সাথে ডানলপ খোলার জন্য নির্বাচনে জেতার আগেই চুক্তি করলেও সেই কারখানার সরঞ্জাম বিক্রি করে দেওয়া ও ইচ্ছেমতো শ্রমিক ছাঁটাই করা ছাড়া আর কোনো কাজ হয়নি। ডানলপ বন্ধ রয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে হিন্দুস্থান মোটর্সের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। শালিমার পেইন্টসও বন্ধের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বন্ধ হয়েছে ডাকব্যাক। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জেশপ, এখন আবার খুললেও শ্রমিকরাই বলছেন যে নতুন করে আরও একদফা কারখানার ভেতরের দামী যন্ত্রাংশ ও কারখানার সামগ্রী বিক্রি করার জন্যই জেশপের দরজা খোলা হল। কারখানা বন্ধ থাকাকালীনই চুরি হয়ে যাওয়ার নাম করে কারখানার দামী জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মালিকপক্ষ চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বললেও শ্রমিকরা তা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, মালিকই কায়দা করে মালপত্র সরিয়েছে। এবারেও কারখানার গেট খুলেছে কিন্তু দুমাসের মেইনটেনেন্সের নাম করে কত মালপত্র যে সরানো হবে তার ইয়ত্তা নেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন 'মহাবলী'রা শ্রমিকদের ঠাণ্ডা রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মালিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। সেটা কোথাও কোথাও এরকম জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে যে তারা এত বেশি টাকা দাবি করছে যে মালিকরা তা দিতে চাইছে না। সেই নিয়েও শিল্পে অশান্তির ব্যাপক নজির তৈরি হয়েছে। শ্যাম স্টীল বা ইসিএল-এ তোলা আদায় করার যে ঘটনা সামনে এসেছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কোথাও তারা কিছু বলবে না, বরং মালিকদের কাছ থেকে যথেচ্ছ টাকা নেবে। মালিকরাও সেই টাকা তোলার চেষ্টা করবে আরো বেশি শ্রমিক শোষণ করে। এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা রাজ্যে শিল্পের শোচনীয় অবস্থার বিশেষ নজির হিসাবে এ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র জুট ও চা শিল্প এক

ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চা শিল্পের শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সরকার দু-একটি চটকদারি পদক্ষেপ নিয়ে নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করছেন। চটশিল্পের অবস্থাও সংকটজনক। চটশিল্পে অর্ডারের সমস্যার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার প্লাস্টিক লবির সাথে আঁতাত করে খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এ জুটের বস্তার বদলে প্লাস্টিকের বস্তার ব্যবহার বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে এই সংকট। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মমতা ব্যানার্জীর ঝামেলা তুঙ্গে উঠে গেলেও এই বিষয় নিয়ে মমতা ব্যানার্জীকে সরব হতে দেখা গেল না। চট অর্ডারের সাথে এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ যুক্ত, তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো মাথাব্যথা নেই। ফলে এবছরের শুরু থেকেই জুট শ্রমিকরা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল। মালিকরাও তাদের সংকটের বোঝা পুরোপুরি শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে দিল। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের ইচ্ছেমতো মজুরি কেটে নেওয়া, কাজের দিন কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের আক্রমণ হতে থাকল। সরকার নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলনও সরকারকে মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়াতে বাধ্য করতে পারল না। টিটাগড়ের লুমটেক্সের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়াতে বাধ্য করতে পারল না। সরকার তীব্রভাবে মালিকদের পাশে থাকল, টিটাগড়ের লুমটেক্সের শ্রমিকরা ২০১৩ সালের জুন মাস থেকে তাদের বকেয়া পিএফ গ্র্যাচুইটির টাকার দাবিতে ধর্ণা দিয়ে গেলেও, পুরো টিটাগড় অঞ্চল বন্‌ধ, রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ করে সারা রাজ্যে আন্দোলন তুলে দিলেও সরকারের ঘুম ভাঙাতে পারেনি। এখনও শ্রমিকরা ধর্নায় বসে রয়েছে। হুগলির নর্থব্রুকে ম্যানেজার হত্যার ঘটনাও ঘটেছে সরকারের শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে চূড়ান্ত অবহেলার কারণে। মালিকপক্ষের বল্গাহীন আক্রমণের মুখে শ্রমিকদের ফেলে দেওয়ার ফলে কোথাও শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সরকারের কোনো হেলদোল নেই। সাধারণভাবে চালু কারখানাকে ঠিকভাবে চালানো ও বন্ধ কারখানাকে খোলার যে দাবি ছিল তাকে নস্যাৎ করে বামফ্রন্ট সরকারের মতোই বিশ্বায়ন উদারীকরণের নীতিকে অনুসরণ করে বিদেশি শিল্পপতিদের ডেকে এনে শিল্পায়ন করার সেই রাস্তাতেই সরকার চলছে। সম্প্রতি মমতা ব্যানার্জীর সিঙ্গাপুর সফর ও শিল্পপতিদের ভজনা এই চিত্রটিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। এরাজ্য তথা সারা দেশের আত্মমর্যাদার জায়গা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে একজন মুখ্যমন্ত্রী বাইরের দেশ থেকে শিল্পপতিদের ধরে নিয়ে আসার জন্য বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন! অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের তথা দেশের শিল্প গড়ার নিজস্ব কোনো ক্ষমতাই নেই সেটাই তারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন!

শিল্পকে বাঁচানোর নাম করে, আন্দোলন করলে শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার অজুহাত দেখিয়ে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকারকেই হরণ করার কাজ পূর্বতন সরকার থেকে এই সরকার আরো দ্রুত গতিতে করে চলেছে। শিল্পনীতিকে শ্রমিক-বান্ধবের বদলে শিল্প-বান্ধব হিসেবে ঘোষণা করে শ্রমিক শোষণের মাত্রাকে লাগামছাড়া করা হয়েছে। ছোট মাঝারি সমস্ত মালিকরাও তাদের সংকটের সমস্ত বোঝাটাই শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বায়ন উদারীকরণের অনুসারী শিল্পনীতির মাধ্যমে রাজ্যের স্বাভাবিক শিল্পগুলিকে ধ্বংসের উপান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। যার ফলে আজকে শ্রমিকরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। এই অবস্থা আর কিছুই নয়, সারা পৃথিবীতে একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসনের ফল— যে পুঁজি তার নিজের স্বার্থে রাজ্যের শিল্পকে ধ্বংস করার কাজ করে, রাজ্যের তথা সারা দেশের বাজারকে নিজের মতো করে সাজাতে চায়, রাজ্য তথা দেশের স্বাভাবিক উৎপাদন ধ্বংস করে সমস্ত ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজির রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেয়। সিঙ্গুরে কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে টাটাকে দিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে জুট শিল্পে আয় কমিয়ে দেওয়া এই সবকিছুই একচেটিয়া আগ্রাসনের প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

কিন্তু এই অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা যারা রাখেন সেই শ্রমিকশ্রেণী আজকে সেভাবে সংগঠিত নয়। আজকে তার শ্রেণী সংগঠনগুলো সেভাবে শক্তিশালী হতে পারে নি। শ্রমিকশ্রেণী তার সংগঠনের অভাবে আজকে এক দিশাহারা অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই কারণেই আজকে বিজেপি তথা সংঘ পরিবারকেও বিকল্প শক্তি হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। হিন্দুস্তান মোটর্স বন্ধ হয়ে গেলেও শ্রমিকরা আজকে সেভাবে আন্দোলনে নামতে পারছেন না। আন্দোলনে নামছেন না শালিমার পেইন্টস-এর মতো কারখানার শ্রমিকরাও। অনেকে বলছেন, শ্রমিকরা আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়েছেন বলে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু ঘটনা ঠিক তা নয়। আজকে যেভাবে সংগঠিত হলে শ্রমিকরা সত্যিই প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে, এক সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে, সেই ধরনের ঐক্য যে শ্রমিকদের তৈরি হয়নি, তা শ্রমিকেরা নিজেরাই ভালো বুঝতে পারেন। কারণ আক্রমণগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে ধরনের সংগঠন দরকার, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আজকে তা নেই। শ্রমিকদের এক বৃহত্তর অংশ জানেন যে, আজকে যে কোনো লড়াইতে তখনই সফল হওয়া সম্ভব যখন সেই লড়াই সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারবে। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, তথাকথিত বামফ্রন্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি এর আগে বামফ্রন্ট জমানাতে সরকারকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলা তো দূর অস্ত্, সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল। এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তারা শেষপর্যন্ত মালিকের স্বার্থ রক্ষা করার কাজ করে গেছে।

সেই পর্যায়ে যারা শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ

করতে পারত, সেই নকশালপন্থী তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তি সত্তর দশকে গণ-আন্দোলন-গণ-সংগঠন বয়কট করে ও বামপন্থী হঠকারী লাইন নিয়ে প্রথমে শ্রমিকদের থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপরে গণ-আন্দোলন গণ-সংগঠনের কাজ অনেকেই শুরু করলেও শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সচেতন উদ্যোগ না নেবার ফলে শ্রমিকশ্রেণীকে কারখানা স্তরের বাইরের আন্দোলনে সংগঠিত করতেই সক্ষম হল না। পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করার লাইন অনেকে নিলেও সেই স্তরের শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল না ও নিজেদের মধ্যেই একের পর এক ভাঙন ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হল। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াকু কোনো সংগঠন থাকল কার্যত অনুপস্থিত।

এই অবস্থায় বামফ্রন্টের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে ইতস্তত উত্তরণ ঘটল না সরকারি নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ার স্তরে। সরকারে অধিষ্ঠিত 'বামপন্থী'রা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে লড়াকু মানসিকতাকে স্তিমিত করে সরকার নির্ভরশীলতার মানসিকতার চাষ করতেও সক্ষম হল। এরই ফল দাঁড়ালো যে, শ্রমিকরা যখন সরকারি নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তখন বামফ্রন্টকে হঠিয়ে তৃণমূলকে সরকারে আনার মধ্যেই তাঁদের ব্যাপক অংশ যথার্থতা খুঁজে পেলেন (আজকে তৃণমূলের প্রতি অনাস্থা আবার বিজেপির প্রতি আস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে)। ফল দাঁড়াল যে সরকার পরিবর্তন হল কিন্তু শ্রমিকরা হয়ে পড়ল সংগঠনহীন। যে অবস্থার ফায়দা আজকে তৃণমূল কংগ্রেস তুলছে।

সিটু সহ সমস্ত লালঝান্ডাধারী সরকারি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপরে ইতিবাচকভাবেই শ্রমিকদের যেমন আস্থা নেই, তেমনি তার বদলে শ্রমিকদের মধ্যে বিকল্প সংগঠনও গড়ে ওঠেনি। কারখানা স্তরে যেখানে শ্রমিকদের মধ্যে লড়াকু সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে শ্রমিকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করলেও সেই লড়াই কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলত শ্রমিকদের মধ্যেও লড়াই করার ক্ষেত্রে অনীহা তৈরি হচ্ছে ও তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ছেন।

এক্ষেত্রে টিটাগড়ের লুমটেক্স শ্রমিকদের লড়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে সামনে হাজির রয়েছে। এই কারখানায় শ্রমিকদের লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একের পর এক মালিকি ও প্রশাসনিক হামলার সামনে থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় শেষপর্যন্ত মিলের মধ্যেকার ১৬টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ১১টি ইউনিয়ন সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের সাথে আসতে বাধ্য হয়েছে ও শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে পথে নেমেছে। ১১টি ইউনিয়ন মিলিতভাবে গত প্রায় দু'বছর ধরে আন্দোলন করে চলেছে। ১১ ঘণ্টার রেল অবরোধ সারা রাজ্যে আন্দোলন তৈরি করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা সরকারকে একটি কার্যকর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করানোর উদ্যোগ গ্রহণ পর্যন্ত করাতে সক্ষম হয়নি। এর একটা বড়ো কারণ হল এই আন্দোলনের সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে পারার অক্ষমতা। যে শক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে তাঁরাও যেহেতু গোটা শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে নি সেই কারণে শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছেই এই আন্দোলনের সদর্থক বার্তা নিয়ে যাওয়া সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না। তাই লুমটেক্সের শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই লড়লেও সেই লড়াইকে তাঁরা অন্য কারখানায় ছড়িয়ে দিতে পারছেন না। সেইরকমই যে সমস্ত কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা বন্ধ পড়ে রয়েছে সেখানে লড়াই করে সরকারের নীতি পাল্টে ফেলতে পারবেন বা মালিককে বাধ্য করতে পারবেন সেইরকম কোনো প্রত্যাশাই শ্রমিকরা করেন না। এই সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা তাই আজকে জরুরি হয়ে উঠেছে।

শ্রমিক আন্দোলনের এই অসংগঠিত অবস্থা নিয়ে আলোচনাতে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে মাথায় রাখতে হবে তা হলো, যে প্রাথমিক হাতিয়ারকে ধরে শ্রমিকশ্রেণী একটা শ্রেণীগত রূপকে গড়ে তুলতে পারে তা হল ট্রেড ইউনিয়ন। আজকের অবস্থায় কারখানাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কোথাও কোথাও শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইতে নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য তা গড়ে তুলতে পারে না। অর্থাৎ তা কারখানার গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যাপক শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, যদি না তার জন্য বাইরের শক্তি তৈরি থাকে। সেই শক্তি সংগঠিত হবার ক্ষেত্রে সারা দেশব্যাপী ও রাজ্যব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে প্রতিনিধিত্বকারী ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র শ্রমিক শ্রেণীর কারখানাভিত্তিক সংগ্রাম ও সাধারণভাবে শ্রমিকস্বার্থে সংগ্রামরত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কার্যকরভাবে গড়ে উঠতে পারে। আজকে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকরভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে তারা কেউই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে সাধারণভাবে যেহেতু প্রতিনিধিত্ব করছে না তাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কারখানা-স্তর ছাড়িয়ে সংগ্রাম করার উদ্যোগ সেভাবে বিকশিত হচ্ছে না। আজকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে সমস্ত শক্তি যদি একযোগে সারা দেশব্যাপী মালিক রাজের বিরুদ্ধে, একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, কারখানাস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার জন্য এগিয়ে আসে তবে তা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামগুলিকে একত্রিত করে কারখানা-স্তরের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করতে পারে।

এরাজ্যেও যে সমস্ত শক্তি আজকে শাসকশ্রেণীর শিবিরের বাইরে একটি বিকল্প নীতি নিয়ে বর্তমান শাসনকাঠামোর বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে

তারা যদি ট্রেড ইউনিয়ন স্তরেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তবে সারা রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তা একটি ভরসা দিতে পারে। একটি কারখানার লড়াইকে কারখানা-স্তর অতিক্রম করে সারা রাজ্যব্যাপী আলোড়নে ছড়িয়ে দিতে পারে। শ্রমিকদের ওপর মালিকী হামলার প্রতিরোধকে বিশ্বায়নী নীতি ও রাজ্যে-দেশে সেই নীতির প্রণয়নকারী সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে পারে। একটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে বা কোনো কারখানার শ্রমিকদের ওপর কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করার জন্য তৈরি থাকতে পারে। এই ধরনের একটি উদ্যোগই পারে শ্রমিকদের মধ্যে অসহায়তার মনোভাবকে দ্রুত কাটিয়ে তুলতে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাতে একদিকে ক্রমবর্ধমান গেরুয়া মতাদর্শের বিস্তারকে রুখতে, তৃণমূলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, তথাকথিত বামপন্থীদের ভ্রষ্ট বামপন্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রমিকদের কারখানা স্তরের বাইরে এক বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপাদান সম্পন্ন সংগঠন গড়ে তোলা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। এর সাথে এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, আজকে কোনো একটি শিল্পক্ষেত্রে বা কারখানাতে যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা কেবল তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না তা সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে ও শাখাতে প্রযোজ্য হচ্ছে। সেই জায়গা থেকেও আজকে শ্রমিকেরা পুঁজির আক্রমণের কাছে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ছে। যেখানে সরকারগুলি যতটুকু আইন শ্রমিকদের স্বার্থে এই কাঠামোতে রয়েছে সেই আইন কানুনের তোয়াক্কা না করেই মালিকদের নিজেদের সুবিধা মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সহায়তা করে চলে সেখানে শ্রমিকদের পক্ষে অনেক বড়ো ঐক্য ছাড়া একটি কারখানাতেও তাদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যা আমরা দেখতে পাই, লুমটেক্সের আন্দোলনের দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে। হিন্দুস্তান মোটর্স, শালিমার পেইন্টস বা জেশপ কারখানার মতো ক্ষেত্রগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সেরকম কোনো প্রতিবাদ না হবার মধ্যে। একদিকে গত ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্টের শ্রেণী সমঝোতার নীতির মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে বৃহৎ পুঁজির পায়ে নিজেদের সমর্পণ করার মধ্য দিয়ে জনসমর্থন হারানো ও অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উঠে আসা শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আজকে যে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে তাকে সামলানো ও শ্রেণী শক্তিকে সংহত করার কাজ আজকে কীভাবে করা সম্ভব, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের কাছেই আলোচ্য বিষয় হিসেবে সামনে আসছে।

অলীক

কিন্তু পেটের খিদে যে বড্ড বেয়াড়া মাস্টারমশাই

এমনিতে আপনাদের সংবাদপত্রটা দৈনিকই পড়ি মাস্টারমশাই। টিভি চ্যানেলটাও দেখি। কেননা 'পিছিয়ে পড়ার' ইচ্ছে আমার নেই। ভেতো বাঙালি তো, তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হুজুগেও মাতি। এই যেমন সারা দেশ জুড়ে এখন মোদি জ্বর। ফলত প্রতিদিন মোদি কী বলছেন, কী করছেন, তা নিয়ে কিঞ্চিত আগ্রহ তৈরি হচ্ছে বইকি। মোদি যখন ভোটের আগে কলকাতায় এসে লাড্ডু খাওয়ানোর 'গপ্পো' শুনিয়ে গেলেন, মনে বেশ পুলক জেগে ছিল, চোখে ঘনিয়ে ছিল ঘোর, শত হলেও ভোজনরসিক বাঙালি কিনা। কিন্তু এক বন্ধু তখন বলল, "ওরে। এ লাড্ডু সে লাড্ডু নয়, এ একেবারে দিল্লীকা লাড্ডু। তুই খেতে চাস তো খা, তবে জেনে রাখ এ লাড্ডু খেলেও পস্তাতে হয়, না খেলেও।" তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "খেলে পস্তাতে হয়— না হয় তবু বোঝা গেল। পেট-টেট খারাপ হওয়ার ইঙ্গিত, কিন্তু না খেলে পস্তানোর ব্যাপারটা তো ঠিক বোঝা গেল না।" সে তখন বলল, "এটা সব থেকে ভাল বুঝেছে গুজরাটের মুসলমানরা, তাই তারা আগেভাগেই গিয়ে দলে দলে মোদিজীকে ভোট দিয়ে ওর হাতে লাড্ডু খেয়ে নিচ্ছে।"

এখন সম্ভবত দেশজুড়ে লাড্ডু খাওয়ার পালা। আপনাদের সংবাদপত্রেই দেখলাম ক'দিন আগে মোদিজী বলেছেন, দেশের আর্থিক বৃদ্ধির অবস্থা খুব শোচনীয়। পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে নাকি রাজকোষ একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে ছিল, তাই আপাতত 'উন্নয়নের স্বার্থে' তিনি এমন কিছু কড়া ব্যবস্থা নেবেন যা জনগণের অপছন্দ হবে। মোদিজীর এই এক গুণ, তিনি মুখে যা বলেন কাজে তা করেও দেখান। ইতিমধ্যেই আমরা তা দেখতেও শুরু করেছি। এই যেমন মোদিজী ক্ষমতায় বসা মাত্রই 'উন্নয়নের স্বার্থে' নর্মদা নদী উপত্যকায় সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে অস্বীকার করে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটিকে বাঁধের জন্য পাঁচিলকে আরো ১৭ মিটার উঁচু করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হলো। নিন্দুকরা অবশ্য বলছেন যে এর ফলে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের অন্তত আরো আড়াই লাখ জনতা জীবন, জীবিকা, বসতি থেকে উচ্ছেদ হবেন। যাদের অধিকাংশই আবার আদিবাসী। কিন্তু তাতে কী? 'উন্নয়ন' তো হচ্ছে।

মোদিজীর এই কড়া পদক্ষেপ নেবার কথা ঘোষণার পরই, ১০ই জুন আপনাদের পত্রিকা তার সাফাই গেয়ে বলেছে, "বস্তুত মোদীর অর্থনীতির মূল দর্শন এটাই। আর্থিক বৃদ্ধির পথ ধরেই গরিব মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব— জগদীশ ভগবতীদের এই অর্থনৈতিক দর্শনে ভরসা রেখেই গুজরাতের হাল ফিরিয়েছেন তিনি"। আপনার এহেন মন্তব্যের পরই মাথায়

প্রশ্নগুলি ঘোরাফেরা করতে শুরু করেছে। শত হলেও বাঙালি কিনা, মনের মধ্যে নানা বিপরীত প্রশ্ন ওঠা, এ হলো রক্তের দোষ।

তা, যেটা বলছিলাম মাস্টারমশাই। আপনি বলেছেন মোদিজীর আর্থিক বৃদ্ধির পথের কথা। যার মধ্যে দিয়ে উন্নয়ন হয়েছে। গরীবের। গুজরাটে। এমনিতে আপনাদের মুখে গরীবের প্রতি দরদ শুনতে আমরা ঠিক অভ্যস্ত নই। ওটা তো আপনাদের কাছে 'বামপন্থীদের' একটা বদভ্যাস মাত্র। আসলে আপনারা যে দর্শনটা সংবাদপত্র আর নিউজ চ্যানেলে ফেরি করেন সেখানে যেহেতু মুনাফাই মোক্ষ, তাই চটকলের কোন মালিকের যখন শ্রমিক অসন্তোষে মৃত্যু হয়, আপনারা তার মধ্যে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' খুঁজে পেলেও চটকলের শ্রমিকদের শোষণের মধ্যে মালিকপক্ষের মধ্যযুগীয় শোষণ লুণ্ঠনকে আপনাদের চোখে পড়ে না। অবশ্য এত কাছের জিনিস আপনাদের চোখে পড়বেই বা কী করে, আপনাদের খুব দূরদৃষ্টি কিনা? কিন্তু এখন উন্নয়নের মোদি মডেলের যে গল্পটা আপনারা শোনাচ্ছেন, ''দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে''। সেই উন্নয়নের 'চুঁইয়ে পড়া' সুফলের গল্প। যা পৌঁছাবে শেষমেশ নাকি গরিব জনতার হাতেও। এটাই মনমোহন, চিদাম্বরমরাও শুনিয়েছিলেন না! এর মধ্যে নতুনত্ব কই?

প্রশ্নটা এভাবেই মনে এসেছিল। তাই ভেবেই সৎ মনোভাব নিয়ে মোদি জমানার গুজরাটের তালাশ করতে গুগল সার্চে গেলাম। গিয়ে তো আমি থ। গুজরাটে মোদিজীর জমানায় আর্থিক বিকাশের যে গল্পটা ক'মাস ধরে শুনে এলাম তার সাথে তো কিছুই মিলছে না। মোদি জমানার আগে গুজরাটে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল মোদি জমানার সময়কার গুজরাটের আর্থিক বিকাশের হারের দ্বিগুণ। আর মোদির গুজরাটের দারিদ্রের চেহারাটাও তো দেখছি ভয়াবহ। ২০০১ সালে যেখানে দারিদ্র ছিল ৩২ শতাংশ, মোদি জমানায় দশ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৫ শতাংশ। ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল অবধি এনএসএসও-র যে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য মোচনের হার সবচেয়ে কম যে রাজ্যটিতে তার নাম গুজরাট। মাত্র ৪.৬ শতাংশ। নরেন্দ্র মোদির জমানায় ৯,৮২৯ জন শ্রমিক, ৫,৪৪৭ জন কৃষক ও ৯১৮ জন ফার্ম মজুর আর্থিক কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষুধার তালিকায় দেশের প্রধান ১৭টি রাজ্যের মধ্যে গুজরাটের স্থান দশম। নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে ৪৭.৯ শতাংশ আদিবাসী স্থায়ীভাবে বাস্তুভিটেহীন হয়ে গেছে। অন্তত অর্ধেক আদিবাসী দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। দলিতদের অবস্থাও করুণ। গুজরাটে ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে কোন শৌচালয় নেই। সারা দেশে শৌচালয়ের বিচারে গুজরাটের স্থান দশম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী মোদির গুজরাটে ২৯ শতাংশ মানুষই অপরিশোধিত পানীয় জল খেতে বাধ্য হয়। ভারতে প্রধান ১৭টা রাজ্যের মধ্যে ক্ষুধা দূরীকরণে গুজরাটের অবস্থা ১৩তম। জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা(৩) অনুযায়ী গুজরাটের ৪৭ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ৫ বছরের ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। ৭৫ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার শিকার। ৪৬ শতাংশের ওজন গড় ওজনের চেয়ে কম। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ২৮.২ শতাংশ পুরুষদের ও ৩২.৩ শতাংশ মহিলাদের ওজন গড় স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম।

তবে এটা ঠিক, শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। আদানির। আম্বানি ভাইদের। টাটা, এসারদের। কর্পোরেট মালিকদের দান-খয়রাতিতে মোদিজী মুক্তহস্ত। কৃপণ তিনি সাধারণ মানুষের বেলায়। কর্পোরেট মালিকরা সস্তায় জমি পেয়েছে। বিদ্যুৎ পেয়েছে। জল পেয়েছে। অথচ কৃষকরা ভরতুকি সবচেয়ে কম পেয়েছে মোদি শাসিত গুজরাটে। সারের উপর ভ্যাট নেওয়া হয় না। মোদি জমানায় গুজরাটে ৩.৯৮ লক্ষ কৃষক বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি। প্ল্যানিং কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গুজরাটে স্বাস্থ্য ব্যয় ১৯৯০-৯৫ সালে যেখানে ছিল ৪.২৫ শতাংশ, মোদিজীর জমানায় (২০০৫-২০১০ সালে) তা কমে হয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। কিন্তু রাজকোষের টাকা ক্ষতি করে আদানি, রিলায়েন্স, এসারদের জন্য হাজার একর জমি দেওয়া হয়েছে। যেমন মুন্দ্রার *সেজ* প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া হয়েছে বর্গ মিঃ পিছু ১ টাকা দরে। সুপ্রিম কোর্টের বনভূমি সংক্রান্ত নির্দেশকে কাঁচকলা দেখিয়ে এসার স্টিলকে বিরাট পরিমাণ বনভূমি দেওয়া হয়েছে। টাটার ন্যানো কারখানার জন্য মোদি জমি দিয়েছে বর্গ কিলোমিটার প্রতি ৯৮০ টাকা দরে, ফলত জমি থেকেই টাটারা লাভবান হয়েছে সরাসরি ২২ হাজার কোটি টাকা, কেননা এই জমির বাজার দর বর্গ কিলোমিটার পিছু ১০ হাজার টাকা। এতো শুধু ক'টা নমুনা মাত্র। মোদিজির কল্যাণে কর্পোরেট মালিকদের কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বোঝা যায় আদানি গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি দেখলে। ২০০২ সালে গৌতম আদানি ব্যবসার পরিমাণ ছিল যেখানে ২৮১৬ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫৮৮১ কোটি টাকা। মোদিজী দিল্লীতে সরকার গড়বে বুথ ফেরত এই এক্সিট পোল রিপোর্ট শুনেই যখন দেখি আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার সূচক এত বেড়ে গেল যে গত ১৬ মে শেয়ার বাজারের দৌলতেই তারা ঘরে তোলে ৬০ কোটি ডলার, টাকার অঙ্কে ৩৫০০ কোটি টাকা। আর একই দিনে মুকেশ আম্বানি লাভ করে প্রায় ৫৮০০ কোটি টাকা। উন্নয়নের এই সমগ্র গল্পটার মধ্যে গরিব স্বার্থ, গরিব উন্নয়ন কই মাস্টারমশাই?

এবার আসি গুজরাটের হাল ফেরানো প্রসঙ্গে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় থেকেই মোটামুটি আপনারা গুজরাটকে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্য বলে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান তো বলছে ঠিক এর উল্টো। ঠিক যে যে সূচকগুলো দিয়ে আপনারা অর্থাৎ বুর্জোয়া পণ্ডিতরা (থুরি আবার সেই বামপন্থী ভাষা বেরিয়ে গেল।) উন্নয়নের মানদণ্ড ঠিক করেন (যদিও এব্যাপারে আপনাদের নিজেদের মধ্যেই অনেক মতপার্থক্য রয়েছে) তার কোনোটা দিয়েই তো মোদির গুজরাটকে শ্রেষ্ঠ বলা যাচ্ছে না। এই যেমন ধরুন, যদি ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের (জিএসডিপি) বিচারে, তাহলেও দেখব মোদির গুজরাটকে ফেলে এগিয়ে ছিল বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু। এমনকি মোদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও গুজরাটের উৎপাদন ছিল পরবর্তী মোদি জমানার দ্বিগুণ।

রাজন কমিটির সুপারিশকে যদি ধরি, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রয়ক্ষমতা, নারী এবং তপশিলি জাতি উপজাতিদের অবস্থা, উন্নয়নের সমাজের সকল অংশের প্রতিনিধিত্বের মতো দশটি মানদণ্ডকে ধরা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে রাজন কমিটি যে উন্নয়নভিত্তিক রাজ্যের তালিকা প্রস্তুত করল তাতে মোদিজীর গুজরাটের স্থান হলো ২৮-টি রাজ্যের মধ্যে ১৭-তম। মানবোন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে ধরলে গুজরাটের স্থান দেশের মধ্যে ১১-তম। রঘুনাথম কমিটি পশ্চাদপদতার নিরিখে দেশের রাজ্যগুলির যে তালিকা বানালো তাতে ২৮-টা রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হলো। ৭-টি উন্নত রাজ্য, ১১-টি কম উন্নত রাজ্য এবং আরো স্বল্পোন্নত ১০-টি রাজ্য। মোদিজীর গুজরাটের স্থান সেখানে কোথায় ছিল জানেন মাস্টারমশাই? ১১-টি কম উন্নত রাজ্যের তালিকায়।

এখন উন্নয়নকে মাপতে আপনারা প্রায়শই এমন যুক্তি দেন যে, যে রাজ্যে যত বেশি বিনিয়োগ হবে (বিশেষত প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হবে) সে রাজ্যেরই নাকি উন্নয়নের সম্ভাবনা তত বেশি। শুধু আপনারাই নন, এদেশের বামপন্থী আন্দোলনের ঠিকাদারেরা, অর্থাৎ সিপিএম, সিপিআই-ও এমনটাই মনে করে। এই তো কিছু দিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধবাবু তো এ রাজ্যে বিনিয়োগ আনতে একেবারে কোমর কষে নেমে পড়েছিলেন। তার জন্য কত যুক্তি, কত ভাষ্য, কত রচনা, কত ঘটনা, সেগুলো নিশ্চয়ই কারোর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। তো সেই বিনিয়োগের নিরিখেই যদি ধরি তাহলেও কী মোদিজীকে এক নম্বর বলা যায়? পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না। যেমন সোশিয়ো ইকনমিক রিভিউ ২০১২-এর তথ্য বলছে, ২০১১ সালে গুজরাটে ২০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল কিন্তু বাস্তবে লগ্নি হয়েছিল ২৯,৮১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে ০.২৫ শতাংশ। ৮৩০০-টি মউ স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবায়িত হয়েছিল ২৫০-টি। ঘটনা হলো প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগেও গুজরাতের স্থান প্রথমে নয়, পঞ্চমে।

প্রথম স্থানে আছে মহারাষ্ট্র। আরো আছে কিছু কিছু পরিসংখ্যান। যেমন লিঙ্গ অনুপাতে গুজরাটের স্থান দেশের অন্য রাজ্যগুলির বিচারে ৯ নম্বরে। বিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউট ঠেকানোর প্রশ্নে ১৮ নম্বরে। সাক্ষরতায় প্রথম ১৫-টি রাজ্যের মধ্যে ৭ নম্বরে। ক্ষুধার তালিকায় দেশের প্রধান ১৭-টি রাজ্যের মধ্যে দশম।

তাই উন্নয়নের কোন্ মানদণ্ডে গুজরাটকে ভারতের মধ্যে আদর্শ রাজ্য বলব, কেন বলব, তার কোন সদুত্তর মিলছে না মাস্টারমশাই! তবে আমার আস্থা আছে আপনাদের অসীম ক্ষমতায়। বিশ্বাস করি, 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।' যেভাবে আপনাদের কল্যাণে হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নির্মাণ হয়েছে, যেভাবে নৈরাজ্য, গণহত্যার স্মৃতি আজ শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে (যদিও তা শ্মশানের শান্তি, কবরের নৈঃশব্দ), যেভাবে মৌলবাদ হয়ে গেছে আজ প্রগতির পতাকা বাহক, তাতে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ আর গরিব স্বার্থকে মেলানো অন্তত আপনাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মানতেই হবে এলেম আছে। নয়ত ভোটের আগে প্রচারের ঢক্কানিনাদে যেভাবে আপনারা চাপা দিলেন ইশরাত জাহানের কিংবা বেস্ট বেকারির খুন হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর প্রিয়জনদের আর্তনাদ, তা কি ভোলা যায়! অনেকেই তখন ভেবেছিলেন 'মোদিজীকে বহুমত দিতে হবে। সুদিন আসছে।'

সুদিন আসছে বইকি! একেবারে ঘরের দোরে কড়া নাড়ছে। রেলভাড়া বেড়ে গেল ১৪.২ শতাংশ। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে বাড়ল পণ্য মাশুলও ৬.৫ শতাংশ, অর্থাৎ সোজা হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়তে চলেছে একলাফে অনেকটাই। আরও একবার। বালাই ষাট! তাতে কী? উন্নয়ন তো হচ্ছে! এবার হবে হীরক চতুর্ভুজ। সঙ্গে আছে রেলে, মিডিয়ায়, প্রতিরক্ষায় এফডিআইয়ের কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র। লগ্নিপুঁজি একেবারে দেশের প্রত্যন্ত পৌঁছে যাবে। বিনা পয়সায় পানীয় জল না পাও, ঘরে ঘরে বিসলেরির জল পৌঁছে যাবে ঠিক। না হয় একটু পয়সা খরচ করতে হবে, কিন্তু হাইজেনিক তো?

'উন্নয়নের স্বার্থে' আরো চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। গত ২৩শে জুন ২০১৪ আপনার সংবাদপত্রেই লিখছে দেখলাম, এবার রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনে ভর্তুকি বন্ধ করতে চাইছে সরকার। সারের দাম, খাদ্য সুরক্ষা, একশদিনের কর্মসূচিতেও ভর্তুকি বন্ধ করতে চাইছে সরকার। এমনই খবর। যতই জনগণের টাকায় রাজকোষ তৈরি হোক না কেন, তা ফাঁকা করে জনগণের জন্য দান খয়রাতি আর চলবে না মশাই। উন্নয়নের নয়া তারিকা, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

কিন্তু পেটের খিদে যে বড্ড বেয়াড়া মাস্টারমশাই। উন্নয়নের এই রূপকথা মানুষ শেষমেশ শুনবে তো?

সব্যসাচী গোস্বামী

ভারতবর্ষের মোদীকরণ ও পশ্চিমবঙ্গের মমতায়ন

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত লোকসভা নির্বাচনকালীন প্রচারে, পশ্চিমবঙ্গে দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে শেষে হাজির হয়েছিল, একদিকে তৃণমূল আর অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি, অর্থাৎ বিজেপি। নিকট ভবিষ্যতেও— বিশেষ করে নিকটবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে (দুবছর পর) এ রাজ্যের মানুষ হয়ত এই দুই বিরোধী মেরুতে বিভক্ত হয়ে যাবে। যদি না অবশ্য ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলেরা নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সে সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারিত। দুই শক্তিরই ভরাডুবি।

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অবতীর্ণ হলেও, নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুজনেই ব্যাপক গুন্ডামি ও মস্তানির সাহায্যে নিজেদের দলের সংগঠন গড়ে তুলেছে। নরহত্যা ও ভয়প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সস্তা জনপ্রিয় শ্লোগান ও প্রচারের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভ— এই কৌশলে দুজনেই পারদর্শী। এবং ভিন্নমত ও প্রতিবাদ নির্মমভাবে দমন করতে উভয়ই বদ্ধপরিকর। আগামী দিনগুলিতে, ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রবাহ এই দুই নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতির দ্বারা নির্ধারিত হবে।

প্রথমে, জাতীয় রাজনীতিতে মোদীর আবির্ভাবের ও আধিপত্যের তাৎপর্য নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে ব্যাপক সুবিধা দেওয়া হবে (জমি অধিগ্রহণ, করমুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে)। কিন্তু নির্বাচনকালীন জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতি— অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি রোধ, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের চাকুরির সংস্থান, দুর্নীতির অবদমন— এই সব প্রতিশ্রুতি পালনে মোদী কতটা সক্ষম ও সৎ? মুদ্রাস্ফীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে বিশ্বায়ন অনুগামী বাজারি অর্থনীতি ও দেশীয় মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর (যারা বিজেপি-র তহবিল ভাণ্ডার ও প্রচারমাধ্যমকে ফাঁপিয়েছে গত নির্বাচনে) জটাজালের সঙ্গে। মোদী তো এই জটাজালের-ই প্রতিনিধি। চাকুরির ক্ষেত্রে— কারা কোথায় চাকরি পাবে? যে সব শিল্প কারখানা তৈরি হবে, সেগুলি অধিকাংশই হাইটেক বা উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর। যাতে একমাত্র উচ্চ শিক্ষিত যন্ত্রবিদ, এরাই ঢুকতে পারবে। ব্যাপক অবশিষ্ট কর্মক্ষম বেকার যুব সম্প্রদায় কিন্তু ঐ সব শিল্পে নিয়োগের অযোগ্য— তারা কোথায় যাবে?

এই সব যুবকদের জন্য মোদীর বিজেপি এক ভিন্ন কর্মসূচি তৈরি করেছে। এদের সংগ্রহ করা হচ্ছে দলের গুন্ডাবাহিনীর সদস্যরূপে। বজরং দল, হিন্দুরাষ্ট্র বাহিনী, ইত্যাদি নানা সংগঠনে (গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরভারতে) এদের ভর্তি করা হচ্ছে— মাসিক আর্থিক ভাতা ও ভরণ-পোষণের বদলে। পশ্চিমবঙ্গে আজ যখন বিজেপি অনুপ্রবেশ করছে, তখন এরাজ্যের শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের তাদের ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীতে ভর্তি করছে। অবশ্য বেকার যুবকদের ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীতে পরিণত করার নজির পশ্চিমবঙ্গে আগেও হয়েছে— সিপিএম-এর রাজত্বে 'হার্মাদ বাহিনী' দেখেছি— এখনও তৃণমূল আমলে হচ্ছে আরও ব্যাপকভাবে, শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে, নানা রূপে: তৃণমূল ছাত্রপরিষদের গুন্ডাবাহিনী, তৃণমূল নেতাদের প্রকাশ্য হুমকি ও বিরোধীদের খুন-জখমের অবারিত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গে যেটা হতে চলেছে— তা এক স্বৈরতান্ত্রিক অরাজকতা (যাকে বলা যায়, 'মমতায়ন')। এর পাশাপাশি আর এক অনুরূপ স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁক (অর্থাৎ ''মোদীকরণ'', যা এখন জাতীয় রাজনীতিকে দখল করে বসেছে)। গত নির্বাচনে যাঁরা মমতার তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর মন্ত্রে সম্মোহিত হয়ে তৃণমূলকে ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতা বসিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন কী মারাত্মক ভুল তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচকমণ্ডলী, 'মমতায়নের' বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে 'মোদীকরণের' পক্ষে রায় প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের থেকে এই বিপজ্জনক প্রবলতাই প্রকট হয়ে উঠছে।

এই লোকসভা নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট যোগাড় করেছে (গত ২০০৯ এর নির্বাচনে এর হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ)। কলকাতা, পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকাতে বিজেপি জিততে না পারলেও, আগের তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছে। দেখা গেছে, তৃণমূল শাসনে অসন্তুষ্ট ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষ বিজেপিকে বিকল্প ত্রাণদাতা রূপে দেখতে চাইছে। তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাম দলগুলি কোন কার্যোপযোগী ও সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারার ফলে, এই জন-অসন্তোষের প্রকাশের চাহিদা মেটাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির বড় সুবিধা— কেন্দ্রে তারা ক্ষমতাসীন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার-বিরোধী জনমানসকে সহজেই বিজেপি নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। সাদামাটা ভাষাতে, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্ব যা বলতে চাইছে তা এই— ''আমরা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। সুতরাং বাঁচতে চাও, সুযোগ সুবিধা চাও, তবে আমাদের দলে যোগ দাও।''

এবং এই সতর্কবাণী ও আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা— এমনকি কিছু মধ্যস্তরের নেতারা পর্যন্ত। সবচেয়ে বিস্ময়কর, একদা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মুসলমান পরিবারেরাও বিজেপি-র দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। দুটো দৃষ্টান্ত দিই। বর্ধমানের বিখ্যাত এক কমিউনিস্ট

নেতা মনসুর হবির-এর পরিবারের এক কন্যা গত নির্বাচনে বিজেপি-র প্রচারে নেমেছিলেন। দ্বিতীয়, দীর্ঘকালের কমিউনিস্ট নেতা সাধন গুপ্তের কন্যা ও তাঁর মুসলমান স্বামী (যিনি কিছু দিন আগে পর্যন্ত সিপিআই(এম)-এর সভ্য ছিলেন) সম্প্রতি বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। নন্দীগ্রামে সিপিআই(এম)-এর কলঙ্কের জন্য যে লোকটি সবচেয়ে দায়ী, সেই লক্ষণ শেঠকে দীর্ঘকাল ধরে তোয়াজ করার পর যখন সিপিআইএম-এর প্রাদেশিক নেতৃত্ব তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করলো, তার পরমুহূর্তেই সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিছু দিন পরেই ওর স্ত্রী-সহ আরও কিছু স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতা পার্টি থেকে পদত্যাগ করলো। নতুন দল গঠন করে এরা এবার হয়তো মোদীর দ্বারস্থ হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বামপন্থী দল— তথা সিপিআই(এম) — ভাঙ্গনের মুখে। বুদ্ধদেব-বিমান গোষ্ঠীর কোন ভবিষ্যৎ নেই। মমতার দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তার কাছে আবেদন-নিবেদন করে হয়তো এরা নিজেদের গা বাঁচাতে পারে। কিন্তু দলের অজস্র কর্মী— যারা তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে দৈনন্দিন মার খাচ্ছে— তাদের কী গতি হবে? তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। একদা প্রবল পরাক্রমশালী সিপিআই(এম)-এর 'হার্মাদ' বাহিনী আজ কোথায়? তাদের অনেকেই রাতারাতি তৃণমূলের গুন্ডার দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। ফলে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ কর্মীদের অনেকেই, স্রেফ বাঁচার তাগিদে আশ্রয় নিচ্ছে হয় তৃণমূলের ছত্রছায়াতে, নয় নব্য শক্তিশালী বিজেপি-র অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করছে। দীর্ঘকাল ধরে তার রাজত্বে সিপিআই(এম) এক ধরনের পৃষ্ঠপোষক-পোষ্যবৃন্দ বা প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের নজির স্থাপন করে এসেছে, যেখানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শর প্রতি আস্থা ও তার জন্য লড়াই করার কোন তাগিদ জনগণের মধ্যে তৈরি করা হয় নি। তার-ই অবশ্যম্ভাবী ফল এখন দেখা যাচ্ছে। এক পৃষ্ঠপোষক, অর্থাৎ শাসকদলের বদলে, আর এক নতুন পৃষ্ঠপোষকের দল গদিতে বসলে, জনগণের মধ্য থেকে এই পোষ্যবৃন্দও ভেড়ার পালের মতো নতুন শাসকদলের খাতাতে নাম লেখাবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।

তাই পশ্চিমবঙ্গে, আগামী দিনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তৃণমূল ও বিজেপি-ই আসরে অবতীর্ণ হবে। চতুর ও সুবিধাবাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকে চটাতে সাহস পাবে না, কারণ কেন্দ্রের সাহায্য দরকার পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। সম্প্রতি লোকসভাতে বিজেপি সরকার প্রস্তাবিত বিল তাই তৃণমূল সংসদেরা সমর্থন করেছে— গোড়ায় আপত্তি সত্ত্বেও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নিজের তৃণমূল দলের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য মমতা বিজেপি-র সম্প্রসারণ রুখবার চেষ্টা করবে। ফলে এলাকা দখল নিয়ে সংঘাত বাড়বে উভয় দলের মধ্যে। নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ এক ভয়াবহ অরাজকতার দিকে অবরোহণ করবে।

এই অবরোহণ রুখবার জন্য প্রয়োজনীয় এক বিকল্প আন্দোলন, যা বামপন্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনাকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে। চল্লিশের দশকে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে এই তিনটি মৌলিক ধারাকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল নানাবিধ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে— শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক সংগ্রাম, ছাত্র-বিক্ষোভ— সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে আজ প্রয়োজন এক নতুন কর্মসূচির, যার চাঁদমারি হবে : (১) নয়া-উদারনীতি ভিত্তিক বহুজাতিক ও দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থা, (২) হিন্দু-সাম্প্রদায়িক শাসক গোষ্ঠী, এবং তার পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বী মৌলবাদী ও জাতপাত ভিত্তিক সংকীর্ণতাবাদী ও ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব, ও (৩) গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব (উত্তরভারতে 'খাপ' পঞ্চায়েত, এবং পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চলে মোড়ল-নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত) ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন।

ভবিষ্যতের বিকল্প বামপন্থী কর্মসূচী নিয়ে যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের সামনে জাতীয় স্তরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ— ভারতবর্ষের 'মোদীকরণ'। মমতার মতোই নরেন্দ্র মোদী অতি চতুর বাস্তবধর্মী কর্মপন্থা অর্থাৎ প্রগম্যাটিজ্‌ম-এর অনুসারী। জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতি-ঝংকৃত বক্তৃতা দিয়ে জনমত নিজের স্বার্থে নিপুণভাবে তৈরি করে, তারপর ক্ষমতায় এসে নিজের দলের প্রয়োজনে ঐ সব প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়ে মোদী এখন বৃহৎ পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাদের হাতে আমাদের অর্থনীতির ধর্ষণের পুরো অধিকার দিয়ে দিচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই আত্মসমর্পণের পাশাপাশি সামাজিক স্তরে মোদীর পদাতিক বাহিনী মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির মাধ্যমে তাদেরকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' ও তার আচার অনুষ্ঠান (সরস্বতী বন্দনা, বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি স্লোগান আওড়ানো) অবলম্বন করতে বাধ্য করবে। সম্প্রতি, দিল্লীর মহারাষ্ট্র ভবনে, শিবসেনার সাংসদেরা (এমপি) দল বেঁধে গিয়ে, ওখানকার এক মুসলমান কর্মচারীকে রোজা ভাঙতে বাধ্য করে— তার মুখে জোর করে রুটি ঢুকিয়ে দিয়ে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজেপি শাসকদল বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বদলাতে শুরু করেছে। ঐ দলের এক অকাল কুখ্যাত নেতা দীননাথ বাত্রা কিছু পুস্তিকা রচনা করেছে যাতে ছাত্রদের কাছে কিছু আজগুবি ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এবং তাদের আচার আচারণ যাতে 'ভারতীয় ঐতিহ্য'-র অনুসারী হয় তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দু-একটা নমুনা— ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকতে হলে এবার থেকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করত হবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান। জন্মদিনে ভোজসভা করা ও 'কেক' পরিবেশন করা চলবে না, পরিবর্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও গোরুর সেবা করা উচিত! গুজরাটের বিদ্যালয়গুলিতে এই সব গাঁজাখুরি ছাইভস্ম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দেশিত করা

এর পর ৩২ পৃষ্ঠায়

অট্টহাসি

শঙ্খ ঘোষ

প্রতি রাত্রে স্বপ্নে আসে রেল লাইন, গাড়ির উড়ান, ছেঁড়া জামা
প্রতি রাত্রে পার্টি অফিসের সামনে চুরমার স্কুটার মুণ্ডমালা
প্রতি রাত্রে বদ্ধ ঘরে আহ্লাদ ছড়ানো কত ইঁদুরের খোলা ঘোড়দৌড়
প্রতি রাত্রে স্বপ্নের ভিতরে শুয়ে ধর্ষিতারা কিশোরী গলায় কেঁদে ওঠে
মাটির হৃদয় ভেঙে ফোয়ারার মতো ওঠে তেতো কালো জল প্রতি রাতে
ঝরে পড়ে উদাসীন শান্ত সব মুখে
প্রতি রাত্রে অতিকায় মুখোশেরা ঘুরে ফেরে চরিতার্থ লাশ গুনে গুনে
প্রতি ভোরে ঘুম ভেঙে যায়
প্রতি ভোরে ঘুম ভাঙে অনুগত পুলিশের সাবলীল অট্টহাসি শুনে।

জাল

বিশ্বনাথ গরাই

আমিও এসেছিলাম। আড়ালে দেখেছ। নক্ষত্রের
ভীরু আলোময়তার নীচে, এই বুড়োহাবড়া গ্রাম—
ফোকলা দাঁত, আর তার ঝামাঘষা মুখে যে রক্তের
মিহি কালো গুঁড়ো স্পষ্ট, সেখানে থেমেছে ছদ্মনাম:
কেউ ক্ষুধা, কেউ দ্রোহ, কেউ সর্বনাম, কিংবা টেট—
শূন্যতায় খোঁজে হাড়ে, কেউ কেউ ঘুনসির ফাঁস;
পোড়া জীবনের ক্ষতে একদৃষ্টে চেয়ে আছে প্রেত—
এখানে খালের ঠেকে হতাশায় বুঁদ এমএ পাস!

চোখাচুখি হলে রাত্রি মেলে ধরে তীক্ষ্ণ তরবারি—
সেই নগ্ন খরতায় ককিয়ে উঠছে জনাদেশ;
বারুদের গন্ধমাখা ঘাসফুলে ছেনি ও বাটালি
চালান করেছে যারা, জ্বালে তারা জেদি ঘরবাড়ি।
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, শিরে, যেই পোঁতো তোমার আবেশ,
এ-শরীর ধ্বনিময়, তুমি ঠোকো তীব্র করতালি!

শ্রীনগরে একটি রাত

সব্যসাচী দেব

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বয়ে আনে স্মৃতির সংরাগ
তাকে কি মিলিয়ে নেব সুন্দরের সাথে!
মোড়ে মোড়ে উর্দিপরা পাহারাদারি স্টেনগান হাতে
ঝিলামের স্রোতে ভাসে কার শব, কে জানে ঠিকানা!

এই শব ভাইয়ের রক্তাক্ত মুখ দূরে ঠেলে দেয়
স্বদেশ, যা ছিল চেনা কোনো একদিন
কী করে বা ফিরে পাবে সেই স্মৃতি সেই স্বপ্ন সেই ভালোবাসা
উপত্যকা কেঁপে যায় গুলির আওয়াজে

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতে ভাসে অবিশ্বাস, অচেনা পৃথিবী
ধূসর ধূসরতর হয়ে ওঠে, ভূস্বর্গের অতিকথা দ্রুত মুছে আসে

হাউসবোটের আলো জ্বলে থাকে ডাল হ্রদে, দূরে কাছে দূরে
সেও কি সুন্দর নাকি শুধু গল্পকথা!
শিকারায় যে মেয়েটি ফুল বেচে, হাসির আড়ালে
দীর্ঘশ্বাস বেচে না কখনও
তাকে ফিরে পেতে হবে নিজের স্বদেশ
আর কত মৃত্যু দিয়ে লেখাজোখাহীন...

ভোরের সূর্য

অশোক চট্টোপাধ্যায়

"They say that the dead die not but remain
Near to the rich heirs of their grief and mirth"

Rupert Brook

কে বলেছে মৃত তারা? রাত্রি গভীর হলে
সব শব্দ অচেতন ঘুমের ভেতর
আশ্চর্য নীরব যখন, তারা দলে দলে
চলে আসে। সভা করে। ভদ্র ইতর

কোনো বাছাবাছি নেই। শিষ্ট অশিষ্ট নেই
বুক-খালি-করা কথা, হৃদয় উজাড় করে সেই
কবেকার স্বপ্নশিশু— তার রক্তে সময়ের লাল
রঙগুলি অবিরাম এখনো রাস্তায় দিনকাল

গোল হয়ে বসে এক অন্ধকার ধুলো-ওড়া মাঠে
বুক খুলে বার করে শব্দময় গুহ্য ইতিহাস
সিসের বুলেটে বিদ্ধ সময়ের ধোপানীর ঘাটে
শহিদেরা রোজ বাঁচে গান গায় পূরবী বিভাস

তারা কেউ মৃত নয়। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে
স্মৃতিচিহ্ন রেখে তারা অন্ধকার রাতে
যখন ঝড়ের শেষে স্তব্ধতার শব্দগুলি বাজে
তারা আসে পালা করে হাত রাখে হাতে

ইতিহাস কথা বলে শব্দ বর্ণ ঘুম ভেঙে ওঠে
মধ্যবিত্ত রক্তে জবা ভোরের সূর্য হয়ে ফোটে...

বিসর্জনের বেলা

অজয় সেন

হাত বদল হয়,
অন্ধকারে ঝল্‌সে ওঠে কল্কের আগুন
সুন্‌সান খেতের ভিতর তিনটে শ্বাপদ শুধু নড়াচড়া করে:
ছুরির ফলার মতো দাঁত, হায়নার ক্রূর কালো চোখ
অন্ধকার ভেদ করে জ্বলে;

রাত বাড়ে ভেজা কম্বলের ঘন কুয়াশায়,
মাদকতাও বাড়ে: একবার দু'বার... সারারাত
বারবার,   ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় তারা
নামহীন গোত্রহীন এক ষোড়শীর শরীর :
খুলে পড়ে রক্ত ফিতা
কুমারী জঙ্ঘায় লাগে অমোচনীয় দাগ!

কাছের ধানকলের মাঠে তখনও তীব্র স্বরে
রোজ চলেছে মাইক :
বিন্দুবালা বঙ্গবালা স্বপ্নবালা... যত
নেচে চলে যাত্রাপালা গানের হুল্লোড়ে;

ভোর রাতে
ভেজা রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে পেটশুখা
কুকুর-এক আলপথে নেমে যায়
                দীর্ঘনাক টেনে,
যেখানে বারোয়ারি গ্লোসাইন পোস্টারের ওপর
রক্তে ভিজে পড়ে আছে

                কন্যাশ্রী কনকদুর্গা।

ছড়া

সৃজন সেন

১
আমরা বুদ্ধি-বৃত্তিজীবী
আমরা সুশীল বান্ধবও,
ঝড় ঝঞ্ঝা আসে আসুক
আমরা ঠিকই পার পাবো।

সুশীল যারা তাদের কোন
শ্রেণী-পক্ষ থাকবে না,
শ্রেণী-সংগ্রাম, ট্রেনী-সংগ্রাম
ধার তারা কেউ ধারবে না।

শাসক-শাসিতে চাই সংলাপ
নয়কো কোন সংঘর্ষ,
সংলাপ-ই ভেদ করতে পারে
নিগূঢ় সব রহস্য।

আমরা ছাড়া সেই সংলাপ
সমাজে আজ অসম্ভব,
"এ্যাই এ্যাই এ্যাই— কে আড়ালে?
কী বলছিস? আমরা ঢপ?"

২
সর্ব ঘটে অবাধ গতি,
সব ব্যাপারে গলান নাক,
সব কিছুতেই হাজির তিনি
নিজেই বাজান নিজের ঢাক।

আছেন তিনি মা-মাটিতে
আছেন তিনি বিপ্লবে,
লালগড়ে ঠিক হাজির তিনি,
হাজির শহিদ উৎসবে।

মিছিল-টিছিল হলেই তিনি
দাঁড়ান সমুখ গুচ্ছতে,
হলেও কাক সাজেন তিনি
জানবে ময়ূর পুচ্ছতে।

ঝোপ বুঝে কোপ মারায় তিনি
ওস্তাদ এক নম্বর-ই,
বলতে তাকে পারবে না কেউ
তিনি যে দু-নম্বরি।

'পরিবর্তন'

সব্যসাচী গোস্বামী

আধখানা তার মধুমাখা ছুরি, বাকি অর্ধেক বিষাক্ত
আধখানা তার লোভের লালসা, বাকি অর্ধেক আসক্ত।

আধখানা তার মিথ্যা ভাষণ, বাকি অর্ধেক অসত্য
আধখানা তার ঠুনকো পলকা, বাকি অর্ধেক অশক্ত।

আধখানা তার রঙিন মুখোশ, বাকি অর্ধেক দন্ত-নখ
আধখানা তার মেগালোম্যানিয়া, বার্কি অর্ধেক আজব শখ।

আধখানা তার পারিষদ ঘেরা, বাকি অর্ধেক স্তাবক দল
আধখানা তার শুধু তোষামোদ, বাকি অর্ধেক কথার ছল।

আধখানা তার তন্ত্রসাধনা, বাকি অর্ধেক চিতার কাঠ
আধখানা তার বলির বাজনা, বাকি অর্ধেক বধ্য মাঠ।

আধখানা তার পুঁজির পুজারি, বাকি অর্ধেক লাভের গুড়
আধখানা তার প্রতিশ্রুতিই, বাকি অর্ধেক উল্টো সুর।

আধখানা তার গাজর হালুয়া, বাকি অর্ধেক লাঠির জোর
আধখানা তার দিনে রাহাজানি, বাকি অর্ধেক সিঁধেল চোর

আধখানা তার ফেস্টুনে ঢাকা, বাকি অর্ধেক বিজ্ঞাপন
আধখানা তার জেলা-উৎসব, বাকি অর্ধেক উদ্‌যাপন।

আগুনখেলা
অচিন্ত্য সুরাল

১

এককাট্টা হতে হবে ডাক দিয়েছে কেউ
করাত মাকু হাপর ঘুণি অবোধ মালসাকেও
দুশমনেরা রাঘব বোয়াল
তীক্ষ্ম দাঁত শক্ত চোয়াল
ধূর্ত চোখে মুচকি হেসে লাগিয়ে দিল ফেউ
জমায়েতে ফিসফিসানি, খানিক পরে দোকাট্টা
উড়ল হাওয়ায় অট্টহাসি, ভোঁকাট্টা ভোঁকাট্টা ভোঁকাট্টা

২

লাঙল কোদাল ফিরল মাঠে
শিল আর নোড়া মশলা বাটে
একতারা আর খোল বাঁশিরা ভুলেই গেল হাসতে
এমন হবে জানাই ছিল
জোটবাঁধা তো মানাই ছিল
চালের থেকে মারল উঁকি ফোকলা দাঁতের কাস্তে
আগেই আমি বলেছিলাম— ঝনঝনাল খুন্তি
তখন যদি ঢেঁকির কথা একটু তোরা শুনতি
তোরা না সব বড্ড বোকা
দুশমন তো দেবেই ধোঁকা
ভয়ের আগেই ভয় খেয়ে যাস মনটা বলে পালাই
এককাট্টা হওয়াই চাই
সবাই আমার সঙ্গে আয়
দেখবি খেলা— আগুন রেগে বলল দিয়াশালাই।

অনুব্রতী
অমিত রায়

জানি না কী ক্ষতি হবে এরপর
বাতাসে কী কথা আসে
সংশয় ঘিরে ঢেকে দেয় মন
ব্যাকুল সর্বনাশে,
দুচোখে শ্রাবণ কেতকীর ফুল
বুকে রাখো ভিজে মাটি
দাগ দিয়ে রাখো আজকের এই
নারকীয় সন্ধ্যাটি,
কাল যারা ছিল দুপাশে আড়াল
আজ তারা পশ্চিমে
লুঠে নিয়ে আসে রক্ত আবির
কালো রাত্রির হিমে!

এখানে শোকের পিরামিড গড়ি
জমা বরফের দেশ
এখানে কান্না বিদ্যুৎ হয়ে
বিঁধেছে নির্নিমেষ,
এখানে সময় রুদ্ধ, স্থবির
প্রহরে ত্রিতাল জোড়া
এখানে স্বদেশ লাগামবিহীন
অশ্বমেধের ঘোড়া,
এখানে আগুন কে কাকে পোড়ায়
কে কার অনুব্রতী
এখানে তীব্র অন্ধ বিবেক
ভ্রূকুটিতে সম্মতি!

কবিতার জন্য

সোমা

কবিতার ভেতর বেঁচে থাকা মানে এক মুঠো গভীর
রাত
রাতের আকাশে সূর্য ওঠার মতো মনে হয়
মনে হয় আকাশ থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি—
বৃষ্টির ভেতর সৃষ্টি পাখিকে বিজয়ে তুলে আনি
সরোবর একটা জলপদ্ম

কী হবে জলপদ্ম? কবিতার জন্যই তুলে আনা জলপদ্ম
কবিতার ভেতর থেকে বেঁচে থাকা মানে এক মুঠো রোদ্দুর
দিনের আকাশে রাত্রি নামার মতো মনে হয়—
মনে হয় মানুষ পৃথিবী, পার্থিব সৌন্দর্য—
জীবনের ভেতর আলোর পাখিকে উড়িয়ে— তুলে আনি
জন সমুদ্র থেকে একটা জন তরঙ্গ—

কী হবে জন তরঙ্গ? কবিতার জন্যই তুলে আনা
জলতরঙ্গ—

ভরাট

অরূপ চন্দ

ঘরে ফেরা পাখিরা সান্ধ্য আড্ডায় মশগুল
ঠিক তখন থেকেই শুরু হয় ভরাট আন্দোলন
চাঁদের লুকোচুরি শেষ হয়
মাছেরা লাফায় পানকৌড়িও
বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে গা ঝাড়ে কুকুর
কংক্রিট উঁকি মারে
মরাডালে ঘুঘু
ক্ষেতে ক্ষেতে ঝুলে থাকে বাহারি বেগুন।

অরণ্যা

গৌতম সরকার

এখানে স্থির অরণ্যানি, এইটুকু পথ
শুধু হৃদয় অভিমুখী
পথের সকল সত্য যদিওবা খসে পড়ে
তুমি আসবার আগে, যদি
শর্ত জুড়ে থাকে শস্ত্রের সাথে
কী হয় বলো, আমার আকুল অরণ্যা
ভেসে যাবে তবে
সভ্য নগরের দিকে? কেন ভালোবাসো তবে

ভোটমুখী নিঃস্ব দ্বিপ্রহরে!

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন

বামপন্থা ও ক্ষমতার রাজনীতি

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

বাম রাজনীতির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণ ছিল এই যে সামাজিক মানুষের নানাবিধ ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ দেবার ক্ষমতা ছিল এই রাজনীতির। এই ক্ষমতা যে ছিল বাম রাজনীতির তার কারণ, মতাদর্শগত ভাবে এই রাজনীতি ছিল পুঁজি ও তার সহযোগী যাবতীয় প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক শক্তির বিরোধী রাজনীতি। বাম রাজনীতির মূল এজেন্ডা ছিল এই সামাজিক শক্তিগুলির উৎখাত ঘটিয়ে বিকল্প একটা সমাজ গড়া, যে সমাজের চালিকা শক্তি হবে শ্রমজীবী মানুষ। এই মূল এজেন্ডা থেকেই আসত সামাজিক মানুষের যাবতীয় ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেবার তাগিদ। এ কারণেই বামপন্থীরা থাকত ক্ষোভ-বিক্ষোভ নিয়ে আন্দোলন গড়ার পক্ষে। সাধারণ শ্রমজীবী একভাবে এটা বুঝতেনও। আর সে কারণেই কৌশলগত ভুলভ্রান্তির কারণে কোনো আন্দোলনে বিপর্যয় নেমে এলেও জনগণের কাছে বাম রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা থেকেই যেত একটি স্তর পর্যন্ত। আর সেখান থেকেই আবার এই সব আন্দোলন গড়ার রসদ পেতেন বামপন্থীরা।

পরিস্থিতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে ইদানীং কালে। বাম রাজনীতির পরিচিত সংগঠনগুলির গ্রহণযোগ্যতা কমছে ইদানীং। প্রচলিত ধারার বাম আন্দোলনগুলির জৌলুস কমেছে। এমন নয় যে পুঁজি ও তার সহযোগী প্রাক-পুঁজিবাদী শক্তিগুলি ইতিমধ্যে এমন এক সমাজ গড়ে ফেলেছে যে সামাজিক মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকার ভিত্তিটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে সর্বত্র। বরং উল্টোটাই হলো সামাজিক বাস্তবতা। পুঁজি ও তার সহযোগী শক্তিগুলি ইতিপূর্বে সম্ভবত এত হিংস্রভাবে সামাজিক মানুষের জীবন ও জীবিকা আক্রমণ করেনি কখনও। আন্দোলন গড়ার বস্তুগত ভিত্তি সবলতর হয়েছে এই বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির যুগে। অথচ একই সাথে প্রায় সমানুপাতিকভাবে ঘটেছে প্রচলিত ধারার বাম আন্দোলনের শক্তির অবক্ষয়। আন্দোলন গড়ার বস্তুগত ভিত্তি যেহেতু সবলতর হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রচলিত বাম শক্তির পিছু হটায় গণ-আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে, এমন নয়। বামপন্থীদের ফেলে পালিয়ে যাওয়া জমিতে গড়ে উঠেছে নতুন ধারার বাম আন্দোলন, যার কোনোটা বামপন্থার যে মতাদর্শগত ভিত্তি সেই মার্কসবাদকে একভাবে স্বীকৃতি দেয়, কোনোটা আবার সেসব থেকে দূরে থাকে, 'রাজনীতি'-বর্জিত আন্দোলন গড়ার কথা বলে।

প্রচলিত ধারার বাম রাজনীতির কি অবলুপ্তি ঘটবে? কমিউনিস্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ধারায় দেশে দেশে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলির কি মৃত্যু ঘটবে? বস্তুত ইউরোপের বহু দেশেই এই পার্টিগুলি হয় লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা অন্য বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়েছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি 'ডি লিঙ্কে'-তে রূপান্তরিত হয়েছে, যে ডি লিঙ্কে লেনিনবাদী পার্টি কাঠামোর অত্যাবশ্যক যে উপাদান সেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নিয়মটাকেই মানে না, দলটি 'বহু স্বর' স্বীকার করে নিয়েছে তার গঠনতন্ত্রেই। দক্ষিণ আমেরিকার 'মাওবাদী' থেকে শুরু করে সাবেক সোভিয়েতপন্থী যাবতীয় রাজনীতি এখন 'সাও পাওলো ফোরাম'-এর অংশীদার। নিজ নিজ দেশে এরা সরকার গড়ছেন এমন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যাদের মতাদর্শগত ভিত্তি মার্কসবাদ নয়। সাও পাওলো ফোরাম সমাজতন্ত্র নিয়ে বিকল্প সূত্রায়নের মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে। বলশেভিক ধাঁচের সমাজতন্ত্র যেখানে পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজকাঠামো সংক্রান্ত একমাত্র ভাবনা নয়।

প্রচলিত ধারার বাম সংগঠনগুলির সমস্যা কী, কেন তারা বর্তমান সময়ে আন্দোলনের যে চাহিদা সে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না, এই প্রবন্ধে প্রথমে আমরা সে নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। বাম রাজনীতির ফেলে যাওয়া জমিতে যে বিকল্প আন্দোলন গড়ে উঠছে তার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করব তার পরে। বিকল্প আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটিকে কীভাবে বিবেচনা করে, এই অংশে সেটিই হলো আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে বিকল্প সমাজ গড়ার আন্দোলনের আছে নিবিড় সম্পর্ক, একভাবে যার তাত্ত্বিক কাঠামোটি নির্মাণ করেছিল বলশেভিক মতাদর্শ উদ্বুদ্ধ লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। সে তত্ত্বের বিপুল সমালোচনা উঠেছে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে বিকল্প সমাজ গড়ার যোগসূত্রটি তাহলে কী? এ নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন তাত্ত্বিক বিতর্ক। বাম আন্দোলনের ফেলে যাওয়া জমিতে যারা এই বিকল্প আন্দোলন গড়ে তুলছেন তাদের সবাই এই বিতর্কের অংশীদার নন। একাংশ এ সব বিতর্ক এড়িয়ে চলেন; অনেকে আবার এই বিতর্কে প্রবলভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই বিতর্কের মূল বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধের শেষ অংশে।

সোভিয়েতের পতন, পুঁজির বিশ্বায়ন ও বাম মতাদর্শের সংকট

এটা একেবারেই কাকতালীয় নয় যে সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে

যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি তার বিশ্বায়নের রথের ঘোড়ায় চেপে দিগ্বিজয়ে নেমে পড়েছে। পুঁজির প্রতিপক্ষ হলো শ্রমজীবী মানুষ, পুঁজিকে তার জন্মলগ্ন থেকে লড়তে হয়ে শ্রমজীবীর সঙ্গে। পুঁজি হলো মৃত শ্রম। পুঁজিবাদ হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মৃত শ্রম কর্তৃত্ব করে জীবিত শ্রমের (শ্রমশক্তির) ওপর। এই কর্তৃত্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় সীমিত থাকে এমন নয়, কর্তৃত্বের লড়াই চলে সমাজব্যবস্থার সর্ব স্তরে। শ্রমিক চায় (সচেতন বা অবচেতন ভাবে) এই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে এমন বিকল্প ব্যবস্থা গড়তে যেখানে জীবন্ত শ্রম মৃত শ্রমকে পরাস্ত করে তাকে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে এমন এক ব্যবস্থা যার কর্তৃত্বে আছে শ্রমজীবী, যেখানে সামাজিক সম্পদ ব্যবহৃত হয় শ্রমজীবীর স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কাজে। কর্তৃত্বের এই লড়াইটিতে যুযুধান দুই পক্ষ তাদের সঙ্গী জোটাবার চেষ্টা করে। পুঁজি জোট বাঁধে প্রাক্-পুঁজিবাদের অবশেষ হিসেবে টিকে থাকা শক্তিগুলির সাথে। শ্রমিক জোট বাঁধে এদের বিরোধী শক্তিগুলির সাথে। এ যুদ্ধ চলে রাষ্ট্রক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে ক্ষমতা ধরে রাখা বা ক্ষমতা দখল করার জন্য যে মতাদর্শ প্রয়োজন হয় সে পর্যন্ত বিস্তৃত সমাজ জীবনের সর্বত্র। রক্তপাতহীন কিংবা রক্তপাতময় এই যে যুদ্ধ, তার ইতিহাসই হলো পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কিংবা সমাজতন্ত্র থেকে আবার পুঁজিবাদে ফেরার দীর্ঘ তিক্ত ইতিহাস। এ লড়াই শুরু হয় পুঁজির উদ্ভবের সময় থেকে, এবং চার্টিস্ট, লুডাইট সহ উইলিয়াম গডউইল থেকে বাকুনিন পর্যন্ত বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের চিন্তাধারায় গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিরোধী নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুষ্ট হতে হতে এটি দাঁড়ায় পাল্টা রাষ্ট্র গড়ার লড়াইয়ে। ১৮৭১ সালে প্যারিসে তা প্রাথমিকভাবে সফল হয় (ন্যাশনাল গার্ড সেখানে দু মাস ক্ষমতা ধরে রাখে)। পুঁজি অর্থাৎ মৃত শ্রমের বিরুদ্ধে জীবন্ত শ্রমের (শ্রমশক্তির) এই লড়াই শেষ পর্যন্ত একটা পাল্টা রাষ্ট্রের চেহারা নিয়ে হাজির হয় রাশিয়ায়, বলশেভিকরা যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। এ রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে গোড়াতেই গলদ হয়েছিল কিনা, 'পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা' ভেতর থেকে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখল করার মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রটি 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হয়ে উঠেছিল কিনা, এসব নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। কিন্তু সেসব যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, মৃত শ্রমের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে একটা পাল্টা রাষ্ট্র কী সামাজিক দিশায় গড়ে উঠতে পারে, নানা অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ছিল সেই ধরনের একটি রাষ্ট্র। সারা পৃথিবীর শ্রমজীবীর মধ্যে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, শ্রমজীবীভিত্তিক মতাদর্শের বনিয়াদ শক্ত হয় এবং অচেতনভাবে শ্রমজীবী যা চায়, সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তার মূর্ত রূপ দেবার চেষ্টা শুরু হয় সারা পৃথিবী জুড়ে। চীন সহ সারা পৃথিবীর এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে গড়ে ওঠে একটা পাল্টা সমাজ। পুঁজিকে পিছু হটতে হয়। এমনকি যে সব দেশে পুঁজির কর্তৃত্ব নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে সব দেশেও পুঁজিকে 'জনকল্যাণ'-এর এজেন্ডা আনতে হয়। কর্মসুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় পুঁজি শাসিত এই রাষ্ট্রগুলিতে। এ সবের কারণ হলো এই যে মৃত শ্রম এবং জীবন্ত শ্রমের (শ্রমশক্তির) লড়াইয়ে এ সব দেশে সব সময় উচ্চারিত বা নিরুচ্চারিত উপস্থিতি থাকত একটা অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষের, যার নাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

চীন রাশিয়ার মতাদর্শগত সংঘাত, সোভিয়েত ব্যবস্থার স্থবিরত্ব আর সেটা কাটানোর যাবতীয় প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটির নিঃশব্দ পতন, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং তারপর দেঙ-এর নেতৃত্বে সেখানে বাজারমুখী সংস্কার, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবলুপ্তি—এসবের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক শুরু হওয়ার তিন দশকের মধ্যেই পরিস্থিতির একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগের পুঁজিবাদ কর্তৃত্বে চলে এলো বিশ্ব জুড়ে। পিছু হটলো শ্রমিকশ্রেণী সহ ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ। যুদ্ধে হেরে পিছু হটা বাহিনীও আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, যদি তাগিদটা থেকে যায়। দুর্ভাগ্য এই যে, এত সব ভাঙচুর যা আমরা চোখের সামনে দেখলাম, সেটা আসলে সবচেয়ে বেশি করে ভেঙেছে সেই মতাদর্শের বনিয়াদটি, যার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী স্বপ্ন দেখে পুঁজির ওপর কর্তৃত্ব করার। পুঁজিবাদ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল মতাদর্শের জগতে। পুঁজির এজেন্ডায় থাকে পুঁজিমুখী আইনি সংস্কার, যা রাষ্ট্রকে আর কিছুতেই পুঁজি এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বাফার বা আগল হিসাবে দাঁড়াতে দেয় না। এই এজেন্ডা কার্যকর করার প্রথম শর্ত হলো পুঁজির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার বিশ্বায়ন, যাতে জাতিরাষ্ট্রের আলাদা করে আর কিছু করার থাকে না। বিশ্বায়িত বাজার ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে পুঁজি চালাবে তার দিগ্বিজয়ের রথের ঘোড়া, যেটার নাম পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন। জাতি-রাষ্ট্র হবে তার ফেসিলিটেটর, বা সাহায্যকারী। পুঁজি খুব সংকটে না পড়লে রাষ্ট্র বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না। শ্রম আইন, সম্পত্তি আইন, সামাজিক সুরক্ষা ও নিয়োগ নীতি, সবই হবে পুঁজির মুখ চেয়ে। রাষ্ট্র জনকল্যাণে খরচ কমাবে, বাজার থেকে টাকা ধার করা যথাসম্ভব কমিয়ে আনবে, সুদের হার কম রাখার ব্যবস্থা করবে যাতে ব্যাংকে জমা থাকা সামাজিক সঞ্চয় (যার বেশির ভাগটাই গার্হস্থ্য সঞ্চয়) সস্তা সুদে ধার নিয়ে পুঁজি তার মুনাফার পাহাড় গড়তে পারে। এ সবের যাবতীয় ধাক্কা সামলাবার দায় নেবে শ্রমজীবী, যার মজুরি, কাজের সময়, কাজের চরিত্র— সব ঠিক করবে পুঁজি। মৃত শ্রম আক্ষরিক অর্থেই কর্তৃত্ব করবে জীবন্ত শ্রমের ওপর।

বলা বাহুল্য, এর কোনোটাই এত নির্বিঘ্নে করার সুযোগ

থাকত না যদি সেই অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষটার উপস্থিতি থাকত এই মৃত শ্রম ও জীবিত শ্রমের দ্বৈরথে। সেটা আর নেই। কিন্তু সে যাই হোক, এতৎসত্ত্বেও এই সংস্কারে বিঘ্ন থাকার কথা। কারণটা বিষয়ীগত নয়, বস্তুগত। বস্তুগত (সামাজিক) কারণেই পুঁজির সঙ্গে শ্রমজীবীর সংঘাত লেগে থাকার কথা, কেননা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটির অভ্যন্তরীণ মৌলিক দ্বন্দ্ব হলো শ্রমের সঙ্গে পুঁজির দ্বন্দ্ব। এই উৎপাদন ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে থাকে শ্রমের সঙ্গে পুঁজির সংঘাতের মধ্যেই। সোভিয়েত যখন গড়ে ওঠে নি, তখনও এটা এরকমই ছিল; সোভিয়েত-উত্তর পৃথিবীতেও এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকার বাস্তব কারণ আছে। এত নির্বিঘ্নে এতসব সংস্কার সেরে ফেলে শ্রমিককে এই রথের চাকায় পিষ্ট করার হিম্মত তাই পুঁজির থাকার কথা নয়। পুঁজি সেটা ভালোমতোই জানে। এই যুদ্ধটা লড়বার প্রস্তুতি সে এই পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই নিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধটা কামান বন্দুকের যুদ্ধ নয়। যুদ্ধটা মতাদর্শগত।

সামাজিক বাস্তবতা যে চেতনার জন্ম দেয়, সেই চেতনা নিজে থেকেই একটা সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। চেতনা সামাজিক শক্তির চেহারা অর্জন করে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে। এই ধাপটি হলো চেতনা থেকে মতাদর্শ নির্মাণের ধাপটি। মতাদর্শের পর্যায়ে এসে চেতনা তার সামগ্রিকতার রূপটি অর্জন করে। ("Ideology covers totality of forms of consciousness"– Anti-Duhring) মৃত শ্রমের সঙ্গে জীবন্ত শ্রম যুদ্ধ করে এই মতাদর্শের জোরে। পুঁজিও তার সামাজিক প্রভাব রক্ষা করে পাল্টা একটা মতাদর্শ গড়েই। জীবন্ত শ্রমের মতাদর্শে চেতনার যে সামগ্রিকতা সেটা ধরা পড়ে সমাজতন্ত্রের চিন্তায়, যে চিন্তায় এটা থাকে যে পুঁজির কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব, আর সমাজতন্ত্রই এটা করতে পারে, কেননা সমাজতন্ত্র পুঁজির ওপর শ্রমের (শ্রমশক্তির) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রে পুঁজিকে সামাজিক সম্পদে ফিরিয়ে আনে (বা রূপান্তরিত করে) । বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র পুঁজি তার মতাদর্শগত আক্রমণ জোরদার করা শুরু করে। আর ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হবার সাথে সাথে এই মতাদর্শ জোর দিয়ে এ কথা প্রচার করতে শুরু করে যে 'পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প নেই', 'সমাজতন্ত্র কল্পস্বর্গের বিষয়'। সামগ্রিকভাবে মৃত শ্রমের বিরুদ্ধে জীবন্ত শ্রমের দ্বন্দ্বটিকে উপলব্ধি করার কাজ এর ফলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সামাজিক বাস্তবতার কারণেই দ্বন্দ্বটা অবশ্য থেকেই গেল, সংঘাতও কমল না। কিন্তু এই সংঘাতের পেছনে যে মতাদর্শের জোর থাকে, সেটা কমজোর হয়ে পড়ল। বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী মতাদর্শ এটা বিলক্ষণ বুঝল, এবং এই 'বিষাক্ত মতাদর্শ'টিকে একেবারে নির্মূল করার লক্ষ্যে নামালো আর একটা আক্রমণ।

পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের (শ্রমশক্তির) দ্বন্দ্ব থেকে সেই ভুল চেতনাটি আসে, যার ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে ওঠে ইডিওলজি বা মতাদর্শ। মানসিক জগতে এই দ্বন্দ্বটির নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক মানুষের একটি বিশেষ পরিচয়-সত্তা- শ্রমিক পরিচয়-সত্তা। পুঁজিবাদী মতাদর্শ একেবারে মূলে গিয়ে এবারে আক্রমণ নামালো এই পরিচয়-সত্তার ওপরই। ঐতিহাসিক সত্য হলো, সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের ওপর অন্যান্য আক্রমণের মতোই এই আক্রমণের ইতিহাসও পুরনো। কিন্তু নয়া পরিস্থিতিতে এটি কয়েকগুণ বেশি শক্তি নিয়ে নামল মতাদর্শের লড়াইয়ের রঙ্গমঞ্চে। মূল কথা এইরকম।

কালিঝুলি মাখা উনবিংশ শতকের শ্রমিক, যাকে নিয়ে এত তত্ত্ব, সেই শ্রমিক এখন এই একবিংশ শতকে কোথায় পাওয়া যাবে? শ্রম-বিক্রেতা অবশ্যই আছে। কিন্তু যারা আছে তারা সমসত্তা-সম্পন্ন নয়। একই কারখানার স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিক এক আসনে বসে না। অসংগঠিত শ্রমিক ও সংগঠিত শ্রমিকের মধ্যে আছে বিপুল তফাত। বেশির ভাগ মানুষ এখন কাজ করে সার্ভিস সেক্টরে। সেখানে আবার শ্রমিক কোথায়? ফিরিস্তি লম্বা করা যায়। মোটের ওপর কথাটা এই যে সেই শ্রমশক্তিবিক্রেতা, যাকে নিয়ে মার্কসের এত বিখ্যাত তত্ত্ব, তাকে এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন; পেলেও এই মানুষদের এক কাতারে ফেলা যাবে না।

মতাদর্শের দ্বিতীয় আক্রমণের ক্ষেত্রটি আরও কঠিন। সংক্ষেপে বললে কথা এই রকম। আমাদের চারপাশে যাদের দেখি তার সব 'ব্যক্তি'। সমাজের ব্যক্তির একটি একক পরিচয়-সত্তা নেই। ব্যক্তিটির পরিচয়ে আছে বহু মাত্রা— ব্যক্তি শ্রমজীবী, ব্যক্তিটি নারী, ব্যক্তিটি সমকামী, ব্যক্তিটি পরিবেশ কর্মী, ব্যক্তিটি নিরামিষাশী, ব্যক্তিটি বৈষ্ণব, ইত্যাদি। প্রতিটি পরিচয়-সত্তাকে ঘিরেই ব্যক্তিমানুষের একটি 'ডিসকোর্স' থাকে। এবং প্রতিটি ডিসকোর্সকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির থাকে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তিকে নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত করে। মার্কসবাদীরা এগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারে না। তাদের আছে একটি একমাত্রিক আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যেটি আবার সমাজতন্ত্র নামক একটি গ্রান্ড ন্যারেটিভের অংশ। যে পরিচয়-সত্তাকে ঘিরে এই সংগ্রাম তাঁরা গড়তে চান, সেটি হলো ব্যক্তির অর্থনৈতিক পরিচয়ভিত্তিক, অর্থাৎ উৎপাদন-সম্পর্ক ভিত্তিক পরিচয়। এ দিয়ে ব্যক্তি মানুষের সবটা ধরা যায় না। ব্যক্তি মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে তাই এই মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ বাম দলগুলো পুরোটা ধারণ করতে পারে না। শ্রেণীর বাইরে অন্য পরিচয়কে ঘিরে গড়ে ওঠা (এমনকি) রাজনৈতিক সংগ্রামেও বাম দলগুলি তাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষে জাতপাতভিত্তিক রাজনীতিকেন্দ্রিক সংগ্রাম জোরদার হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে উত্তর ও মধ্যভারতে বামপন্থীরা যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, এই সত্যের মধ্যে একথার প্রমাণ আছে।

এটা মেনে নিতেই হবে, শ্রমিকের যে ভিন্নতা আছে এটা বামপন্থীরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রচলিত ধারার ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাই আজ সব ধরনের শ্রমিকের আন্দোলনকে ধারণ করতে পারছে না। এদের বাদ দিয়েই বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। মানুষের পরিচয় যে একমাত্রিক নয়, এটাও বামপন্থীরা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। এসব নিয়ে তারা আন্দোলনও গড়ে না। ফলত, এদের পাশ কাটিয়েই গড়ে উঠছে নানা ধরনের পরিচয়-সত্তা ভিত্তিক সংগ্রাম, অভিযোগ এই যে, বাম আন্দোলন দিয়ে আর কাজ হবে না। চাই অন্য ধরনের সংগ্রাম। বাম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি এর ফলে সত্যই বিপন্ন বোধ করছে। এইসব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে মতাদর্শের জোর দরকার হয়, সে জোরটাই ফের হারিয়ে ফেলছে বামপন্থীরা। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই যে সমালোচনাগুলি উঠছে তার পেছনে তথ্যের জোরও আছে। বড় কারখানা, বড় খনি, বড় নির্মাণশিল্পে কর্মরত সংগঠিত শ্রমিক এখন সত্যিই আর শ্রমিকের প্রধান অংশ নয়; আছে অসংগঠিত শ্রমিকের এক বিশাল বাহিনী, আছে তথ্যপ্রযুক্তির মেধাশ্রমিক, এদের দু দলের সঙ্গে যার পার্থক্য আছে। এটাও ঠিক যে অন্য পরিচয়-সত্তার গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বাম মতাদর্শ তার গ্রান্ড ন্যারেটিভ-এর মধ্যে কীভাবে এগুলিকে যুক্ত করবে, এ নিয়েও ভাবনাচিন্তা এখনও দুর্বল— এতটাই দুর্বল যে বামপন্থীরা এসব আন্দোলনে সত্যিই যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে এবং অবিলম্বে মতাদর্শের স্তরে এগুলি ফয়সালা না করতে পারলে বামপন্থী আন্দোলনই যে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে, এই বোধটাই নেই এদের মধ্যে। আসলে সাবেক চিন্তার ছক থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু এই ব্যর্থতার নিট ফল কী? নিট ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে মৃত শ্রমের সঙ্গে সংঘাতে পিছু হটছে জীবন্ত শ্রম, কেননা যে মতাদর্শের জোরে জীবন্ত শ্রম টক্কর দেয় মৃত শ্রমের সঙ্গে, সেই মতাদর্শটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আখেরে লাভ হচ্ছে পুঁজিবাদী মতাদর্শের। ন্যায্যতা অর্জন করছে বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে সমসত্তার উপাদান কী আছে এবং কীভাবে সেই উপাদানগুলিতে জোর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়া যায়, এই সমস্যার সমাধান না হলে জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে সংঘাতে সুবিধাজনক জায়গায় থাকে পুঁজি— যে কারণে পুঁজিবাদী মতাদর্শ শ্রমিকদের ভিন্নতার দিকটিতে জোর দেয়; ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এই সবের মহিমা কীর্তন করে। পরিচয়-সত্তা ভিত্তিক আন্দোলন নিয়েও একই কথা। এই আন্দোলনগুলিকে শ্রম-পুঁজির সংঘাতের মৌলিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত না করতে পারলে আসলে লাভবান হয় পুঁজি। ভিন্ন পরিচয়-সত্তার ডিসকোর্স নিয়ে এত যে চিন্তাভাবনা যা কোনো ধরনের গ্রান্ড ন্যারেটিভ গড়ার বিরোধী, সারের বিচারে সে সবও পুঁজিবাদী মতাদর্শের যে মূল এজেন্ডা, সেটিকেই সাহায্য করে। জীবন্ত শ্রমভিত্তিক যে গ্রান্ড ন্যারেটিভ, সেটিকেও একই সঙ্গে বাতিল ঘোষণা করে।

কথা উঠতে পারে, প্রচলিত বামপন্থা যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে আর তার ফেলে যাওয়া জায়গাটায় যদি ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে ক্ষতিটা কোথায়? এসব থেকেই হয়ত কালক্রমে একটা নতুন ধরনের আধার গড়ে উঠবে, যা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদকে উৎখাত করবে এবং একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা সাবেক সমাজতন্ত্রও নয় আবার পুঁজিবাদও নয়। উত্তর হলো, এটা হবার নয়। ভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ক্ষমতার রাজনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিসর-ভিত্তিক আন্দোলনকে যুক্ত করতে হয়। তার জন্য আবার দরকার হয় রাজনীতির ক্ষমতা সংক্রান্ত একটা স্পষ্ট ধারণা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সে সব থাকে না, নির্দিষ্ট পরিসর-ভিত্তিক আন্দোলন গড়ার সচেতন প্রয়াস যাদের থাকে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কে থাকে অস্পষ্ট কিংবা বিপরীতমুখী নানা ধারণা, কেননা এদের অনেকেই গ্রান্ড ন্যারেটিভে বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতি যারা করেন, তাঁরা এগুলিকে নিজ নিজ রাজনৈতিক এজেন্ডার সঙ্গে যুক্ত করে নেবার চেষ্টা করেন। বাম মতাদর্শ দুর্বল থাকলে এগুলি সেই সব রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হয়ে পড়ে যা পুঁজিবাদী গ্রান্ড ন্যারেটিভে বিশ্বাসী, যা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে তার 'ভুলত্রুটি' দূর করে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চায়। পরবর্তী উপবিভাগে এ নিয়ে আমরা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

অন্য ধরনের আন্দোলন ও ক্ষমতার রাজনীতি

প্রচলিত বাম আন্দোলনের বাইরে ইদানীং যে বহু আন্দোলন গড়ে উঠছে, সেটা আর প্রমাণসাপেক্ষ বক্তব্য নয়। অনেক সময়ই এগুলি বাম আন্দোলনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই আন্দোলনগুলি কখনও একটি বিশেষ দাবি ভিত্তিক, কখনও তা বিশেষ পরিচয় ভিত্তিক। কখনও এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কখনও তা গড়ে তোলা হচ্ছে সচেতনভাবে; গড়ে তুলছেন অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল যা প্রচলিত বাম আন্দোলনের বৃত্তের বাইরে এসে নতুন কিছু করতে চান।

কেন এই আন্দোলনগুলি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে সে নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার নেই। আন্দোলনগুলি গড়ে ওঠার বস্তুগত (সামাজিক) কারণ আছে। প্রচলিত বাম আন্দোলন এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। কিন্তু বস্তুগত কারণ যেহেতু আছে, প্রচলিত বামপন্থীদের তোয়াক্কা না করেই গড়ে উঠছে এই আন্দোলনগুলি। আন্দোলনগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলি রাষ্ট্রক্ষমতা-সংক্রান্ত যে রাজনীতি, সে

রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না।

সেটা অবশ্য এমন কিছু নয়, যা অভূতপূর্ব। বস্তুত প্রচলিত বাম আন্দোলন যখন ট্রেড ইউনিয়ন মারফত মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন গড়ে, সেটিও এই ধরনের অরাজনৈতিক আন্দোলন। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা-সংক্রান্ত রাজনীতির কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু আরও কিছুটা গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে দু ধরনের আন্দোলনের মধ্যে তফাতটা স্পষ্ট হয়। বামপন্থীরা এই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে যুক্ত করতে চায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত রাজনীতির সঙ্গে ('অর্থনীতিবাদ' নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যেকার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এটিই)। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের এরকম কোনো দিশা থাকে না, কেননা আন্দোলনটাই স্বতঃস্ফূর্ত। সচেতনভাবে যাঁরা এই ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চান, তাঁদের কি এরকম কোনো রাজনৈতিক দিশা থাকে?

এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যাবে না। এই সব আন্দোলনে কিছু কিছু সংগঠন অবশ্যই আছে যাদের একটা রাজনৈতিক এজেন্ডাও আছে, ঘোষিত অথবা অঘোষিত। তাঁরা যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তারও তাই একটা রাজনৈতিক দিশা থাকে। আন্দোলনটি পুঁজি এবং শ্রমের দ্বৈরথে কার দিকে পাল্লা ভারী করবে সেটা ঠিক হয় তার রাজনৈতিক দিশা কী তা দিয়ে। এই আন্দোলনগুলি অনেক সময় বিদ্যমান শাসনব্যবস্থায় যে ফাঁকফোকর আছে সেগুলি মেরামত ক'রে পুঁজির কর্তৃত্বভিত্তিক এই বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার ন্যায্যতা রক্ষায় সাহায্য করে। বামপন্থী মতাদর্শে যাঁরা আস্থা রাখেন, এই সব আন্দোলন নিয়ে সচরাচর তাঁরা তাই উৎসাহ দেখান না।

আমাদের বক্তব্য, শ্রেণী রাজনীতির ধার কমানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পিতভাবে এই সব আন্দোলন গড়ে তোলাচ্ছে, এই সব আন্দোলন যারা গড়ছেন তাঁরা পুঁজির ন্যায্যতা নির্মাণ প্রকল্পের হিস্যাদার, একথা সর্বাংশে ঠিক নয়। শ্রেণী রাজনীতির ধার কমানোর জন্য অন্য ধরনের আন্দোলনের মতাদর্শের জয়গান সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই করে, কিন্তু অন্য ধরনের আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁরা সবাই 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' নন। তাঁরা যা করছেন তা থেকে বাম রাজনীতির কর্মীদের শিক্ষা নেবার মতো বহু কিছু আছে, এটাও মনে রাখা দরকার। এগুলির সবই যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের মদতে সংগঠিত হয় না, এই আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁরা সবাই যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের দালাল নয়, মূল ধারার বাম আন্দোলনগুলির সঙ্গে এগুলিকে যুক্ত করার চেষ্টা থাকা দরকার, যুক্ত করার প্রকরণ কী, সেটাও ভাবতে হবে। শ্রেণী রাজনীতির ধার কমাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে এজেন্ডা সেটা বানচাল করা যাবে এভাবেই।

যাঁরা এইসব আন্দোলনকে 'অরাজনৈতিক' আন্দোলন হিসেবেই গড়ে তুলতে চান, তাঁদের একাংশ আন্তরিকভাবেই মনে করেন যে রাজনীতির 'কচকচি'তে ঢুকলে আন্দোলনটা কমজোর হয়ে উঠবে— বহু মানুষ যাঁরা রাজনীতিকে এড়িয়ে চলেন, তাঁরা ক্রমশ সরে পড়বেন আন্দোলন থেকে। রাজনীতি একটা উপদ্রব। যতটা সম্ভব এই উপদ্রব এড়িয়ে চলা উচিত। আসলে যে কথাটা এঁরা বুঝতে চাননা তা হলো সামাজিক মানুষ একজোট হয়ে কোনো কিছু করতে গেলেই তাতে ক্ষমতার উপদ্রব এসে জোটে। নমঃশূদ্রদের নিয়ে খুব সৎ অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা 'মতুয়া'র ইতিহাস তার প্রমাণ। 'মতুয়া'র একজোট করার শক্তিটাই তার ক্ষমতা হয়ে উঠল এবং এই ক্ষমতা তার আধার পেল একটা বিশেষ পরিবারে। শক্তিটা ধরে রাখার নিজস্ব তাগিদেই এই ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ালো পরিবার-কেন্দ্রিক। বোঝা যায়, যে কোনো সামাজিক সংগঠন যখন শক্তি অর্জন করে তখন তাতে এসে হাজির হয় ক্ষমতার 'উপদ্রব'— রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি না থাকলেও এটা ঘটবে। অরাজনৈতিক নেতৃত্ব এসব ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে এই ক্ষমতার আধার। যথারীতি সেখানেও থাকবে ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েন। এটাও রাজনীতি। বড়জোর বলা যায় এটা হলো অরাজনৈতিক রাজনীতি। আরও মনে রাখা দরকার, এই রাজনীতি তার অরাজনৈতিক চরিত্র রক্ষা করতে পারবে কিনা, এটাও নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। 'অরাজনৈতিক' কথাটার যে বৈশিষ্ট্য ধরে নেওয়া হয় তা এই যে এটি থাকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির বাইরে অবস্থিত, আর রাজনীতি হলো স্রেফ রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি। যেটাকে অরাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে ভাবা হয়, সেটি যদি সামাজিক শক্তি হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না, অরাজনৈতিক শক্তিও প্রায় স্বাভাবিক নিয়মে তার অংশীদার হয়ে পড়ে। 'মতুয়া' থেকে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের রাজনৈতিক উত্থান এবং এখন তার 'বড়মা'-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে এই বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য পাওয়া যাবে।

যাঁরা আন্তরিকভাবেই এই সব আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্র রক্ষা করতে চান, রাজনীতি-অরাজনীতির মধ্যেকার এই সম্পর্কটি সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। যেহেতু আন্তরিক বিশ্বাসের কারণে এঁরা রাজনীতি এড়িয়ে চলেন, দূর থেকে এগুলির নিন্দা করার বদলে বামপন্থীদের দায়িত্ব হলো এগুলিতে অংশগ্রহণ মারফত ক্রমাগত এই বক্তব্যটি প্রচার করা যে চাইলেও রাজনীতি বর্জন করা যাবে না, বাস্তব কারণেই তা করা যাবে না। সুতরাং রাজনীতির সংশ্রব এড়িয়ে যাবার বদলে আন্দোলনের রাজনীতি যাতে সঠিক দিশায় চালিত হয়, তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যাঁরা সচেতনভাবে এই অরাজনীতির খেলাটা খেলে যেতে চান সংশ্লিষ্ট আন্দোলনটি যাতে বিদ্যমান ব্যবস্থা বিরোধী না হয়ে ওঠে সেটা দেখার জন্য, মতাদর্শগত

বিতর্ক জোরদার করতে হবে এদের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের যা 'গ্রান্ড ন্যারেটিভ' আন্দোলনটিকে সেদিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। বামপন্থীরা এসবের ধার ধারেন না। ফলত তাঁরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

যে আন্দোলনে ঘোষিত বা অঘোষিত রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকে, সেগুলিকেও 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত' হিসেবে চিহ্নিত করে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। চক্রান্ত থাকতেই পারে। কিন্তু সেই চক্রান্তকে সুযোগে রূপান্তরিত করাই হলো রাজনীতি। বামপন্থীরা তাদের সাবেক চিন্তাভাবনার জালে এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে এসব নিয়ে তাঁরা কোনো কিছুই উদ্ভাবন করার ক্ষমতাও তাঁরা যেন হারিয়ে ফেলেছেন। বিদ্যমান ব্যবস্থার ফাঁকফোঁকর মেরামত করার কাজে যে আন্দোলন গড়া হয়, সেই আন্দোলন থেকেই এমন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব, যা এই ব্যবস্থার ফাঁকফোকরকে আসলে বাড়িয়েই তোলে। অর্থনৈতিক দাবিতে গড়া আন্দোলন যেমন অর্থনীতিবাদে আবদ্ধ হয়ে পড়ার বদলে রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারে, বিষয়টা অনেকটা সেই রকম। যে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে একটা বাম রাজনীতি আছে, যে রাজনীতি প্রচলিত বাম রাজনীতির বিরোধী, তাদের কথা আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে। প্রচলিত বাম রাজনীতির সঙ্গে এঁদের একটা স্তর পর্যন্ত মতাদর্শের মিল আছে— এঁরাও একটা 'গ্রান্ড ন্যারেটিভ'-এ বিশ্বাসী, যা মৃত শ্রমের ওপর জীবন্ত শ্রমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এখন যখন পরিস্থিতি এই যে বামপন্থী গ্রান্ড ন্যারেটিভটাই আক্রান্ত, এঁদের সঙ্গে ঐক্যের ক্ষেত্রগুলি কী সেটা বিবেচনা করে ঐক্য বাস্তবে যাতে গড়ে তোলা যায় সে চেষ্টা করতে হবে। আরও যা যোগ করা দরকার তা হলো নতুন ধরনের সংগঠন কী করে গড়ে তোলা যায় সেটাও আগ্রহ নিয়ে শিখতে হবে এঁদের সাফল্য (এমনকি ব্যর্থতাও) থেকে।

রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক, স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা সংগঠিত, যে ধরনের আন্দোলনই হোক না কেন, ছকে বাঁধা বাম আন্দোলনকে আজকের সময়ের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হলে এঁদের কাছ থেকে সংগঠিত হওয়ার কৌশল, শ্লোগান নির্বাচন, আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করা— সব বিষয়েই বহু কিছু শিখতে হবে। ঢাকার শাহবাগে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দিশাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার বিষয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এই আন্দোলন শুরু করেছিল সে দেশের নবপ্রজন্মের তরুণতরুণীরা, যারা কেউই ১৯৭১-এর যুদ্ধ দেখেনি। আন্দোলনের শুরু হয়েছিল ফেসবুক, টুইটার, এসএমএস ইত্যাদি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবিত প্রচারমাধ্যমগুলি ব্যবহার ক'রে। শ্লোগান নির্বাচন করা হলো একেবার নির্দিষ্ট— কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই। অচিরেই এই জমায়েত বিপুল আকার ধারণ করে, জামাত কোণঠাসা হয়, বিচার নিয়ে আওয়ামি লিগের নোংরা রাজনীতি বন্ধ হয় এবং পুনর্বিচার মারফত এই মিরপুরের কসাইটির প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা হয়। আন্দোলনটি করা উচিত ছিল সেখানকার বামপন্থীদের— ধর্মীয় রাজনীতির ক্লেদ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। বামপন্থীরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি এই জমায়েতের গুরুত্ব। এই আন্দোলন যে স্তর পর্যন্ত সফল হয়েছে সেই সাফল্যে কারা সবচেয়ে উজ্জল ভূমিকা পালন করেছে? পালন করেছে কিছু তরুণ তরুণী যাদের কোনো ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না। শাহবাগ আন্দোলন বুঝিয়ে দিল, ভিন্ন ধারার আন্দোলনকে উপেক্ষা করার যে কালচার গড়ে উঠেছে বামপন্থীদের, অবিলম্বে তার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। নতুবা শেষ পর্যন্ত বামপন্থাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, আর তার ফলে জোর বাড়বে পুঁজিবাদী মতাদর্শের।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং আজকের বাম রাজনীতি

মৃত শ্রমের বিরুদ্ধে জীবন্ত শ্রমের যে লড়াই, সে লড়াইয়ে মৃত শ্রমকে শেষ পর্যন্ত জীবন্ত শ্রমের অধীনে আনার জন্য শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন হয় একটি সংগঠনের; শ্রমজীবীদের অগ্রণী অংশের সদস্যদের দিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনটি এই লড়াইয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়। সংগঠনটির নাম কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যই হলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। বলশেভিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল এই ধরনের একটি পার্টি, পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'। এই পার্টির অনুপ্রেরণায় অন্যান্য দেশে যে পার্টিগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলির নামই স্বীয় স্বীয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টিগুলির গঠনতন্ত্র একধরনের; এগুলি চলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নিয়মে। রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রকরণও এক ধরনের, যদিও এই রণনীতির (এবং কখনও কখনও রণকৌশলেরও) প্রশ্নে ভিন্ন মতের ভিত্তিতে এই দলগুলিতে বিভাজনও ঘটেছে (ও ঘটছে)। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমান সময়ে এই দলগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই। এটা বাস্তব যে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পরবর্তী পর্যায়ে এই দলগুলি মতাদর্শের প্রশ্নেই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। আর তার ফলে এরা বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের যুগে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ আশঙ্কাও করা হচ্ছে যে এই ধরনের রাজনৈতিক দলগুলি হয়ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মতোই শেষ পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

এটা আমরা আলোচনা করেছি যে নতুন ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দলগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, সে সম্ভাবনা কম। পুঁজির সঙ্গে লড়াই তীব্রতর হয়েছে শ্রমজীবীর। শ্রমজীবীর চেতনায় তাই পুঁজি বিরোধিতা বাস্তব সত্য হিসেবেই বিদ্যমান। এই চেতনা থেকে যে ইডিওলজি পুষ্ট হবে, সে ইডিওলজি সমাজতন্ত্রের ইডিওলজি, এই দলগুলি যা ধারণ

করে। পরিচয়-সত্তাভিত্তিক অন্য আন্দোলন এই ইডিওলজি ধারণ করতে পারে না, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এটার আধার হতে পারে না। আধার হতে পারে সমাজতান্ত্রিক ইডিওলজিতে আস্থাবান যে কোনো সংগঠন, আন্দোলনের মধ্যে থাকলে প্রচলিত কমিউনিস্ট পার্টিও যার দাবিদার হতে পারে।

এটা মেনে নেওয়া ভালো যে আন্দোলনের সাবেকি প্রকরণে আটকে থাকলে এই দলগুলি যেমন আজকের আন্দোলনকে ধারণ করার অধিকার পাবেন না, আন্দোলনে তাঁরা অবান্তর হয়ে পড়বেন, এটাও তেমনি মেনে নেওয়া ভালো যে সংগঠন গড়ার সাবেকি প্রকরণে আটকে থাকলে তাঁরা আদৌ নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারবেন না। কালের নিয়মেই এই দলগুলি অবলুপ্তির পথে চলে যাবে। বস্তুত, অনেক দেশেই এই ঘটনা ঘটছে। চিরাচরিত কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ছে সে দেশে, আর তার জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের রাজনৈতিক পার্টি। যথা গ্রিস। এই পার্টিগুলি যদি কমিউনিস্টদের যা এজেন্ডা সেটাই গ্রহণ করে, অর্থাৎ পুঁজির কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্রমের কর্তৃত্ব আনার চেষ্টা করে এবং তাতে সফল হয়, তাহলে লেনিনবাদী রাজনৈতিক দলগুলি অবান্তর হয়ে পড়লেও শ্রমজীবীর ক্ষতি নেই। সেটিকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। সমস্যা হলো, এমন কিছু ঘটার লক্ষণ নেই। সুতরাং বিদ্যমান কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে লিকুইডেশনে পাঠানোর কোনো প্রকল্পকে সমর্থন করার কোনো কারণ নেই। এই দলগুলি যাতে মতাদর্শের মৌলিক বিষয়গুলিকে কোনোরকম আপস না করেই সংগঠনগুলিকে যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে, সেটাই হবে সঠিক কাজ।

মতাদর্শের যে সব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কোনো আপস করা যাবে না তার অন্যতম হলো সামাজিক মানুষের যে অর্থনীতি (উৎপাদন সম্পর্ক)-ভিত্তিক পরিচয়সত্তা আছে সেটির ওপর জোর দেওয়া। এটা ঠিক যে অর্থনীতি-ভিত্তিক পরিচয়সত্তাই মানুষের একমাত্র পরিচয়-সত্তা নয়। এটাও ঠিক যে অনেক সময় মানুষের অন্য পরিচয়-সত্তা সামাজিক ভাবে প্রাধান্যে থাকে। কিন্তু বামপন্থী ইডিওলজির মূল জায়গাটা এই যে মানুষের যাবতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হলো অর্থনীতিতে তার যা অবস্থান সেটা। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে অর্থনীতি সবকিছু নির্ধারণ করে দেয়, অথবা অর্থনীতি দিয়েই সামাজিক মানুষের সব কিছু বোঝা যায়। একথার অর্থ শুধু এইটা যে অর্থনীতিতে মানুষের যা অবস্থান সেটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেয় অন্যান্য পরিচয়সত্তা ভিত্তিক আত্মপরিচয়ে তার স্থান কী হবে- অর্থবান দলিতের চেয়ে গরিব দলিতের জায়গা থাকবে পিছনে, যদিও দলিত পরিচয়-সত্তার নিরিখে তারা সমসত্তাসম্পন্ন। এই অমোঘ সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়াই হলো দলিত রাজনীতিতে বামপন্থী ইডিওলজির কাজ।

বামপন্থী পার্টি কি 'ফোরাম' চরিত্রের পার্টি হতে পারে, যেখানে বহুস্বরের উপস্থিতি সাংগঠনিকভাবে স্বীকৃতি পেতে পারে? যে পার্টি পুঁজির কর্তৃত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দখল চায়, সে পার্টিকে একস্বরেই কথা বলতে হয়। এতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে যেভাবে এই একস্বর তৈরি করা হয় ওপর থেকে সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে, সেটার অবসান অবশ্যই প্রয়োজন। একস্বর গঠনে বহুস্বরের সাংগঠনিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই এই যান্ত্রিকতার অবসান ঘটানো সম্ভব। এটা অর্জন করা যায় সদস্য নির্বাচন থেকে সব পর্যায়ের কমিটি গঠনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার ক'রে। স্বীকার করতেই হবে যে এ বিষয়ে যে মাত্রায় পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন, লেনিনবাদী পার্টি কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তা করতে সাহসী হচ্ছে না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তত্ত্বটিকে নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না করতে পারলে এ সাহস অর্জন করতে পারবে না বাম দলগুলি।

সমাজতন্ত্র নিয়ে সাবেক চিন্তার আমূল পরিবর্তন দরকার। সোভিয়েতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মতাদর্শে অটল থেকে এ কাজে হাত লাগাতে হবে সব বাম দলগুলিকেই। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে বিপুল পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছে লাতিন আমেরিকায়। লক্ষণীয় যে, মতান্ধতা বর্জন করে এই পরীক্ষানিরীক্ষার অংশীদার হয়েছে সেখানকার পুরোনো গেরিলা যোদ্ধাদের দল থেকে ক্রিশ্চান সোসালিস্ট মতে বিশ্বাসী দলগুলি পর্যন্ত সকলেই। মোট ১৮০-টি বামপন্থী, প্রগতিশীল ও নয়া-উদারবাদী বিরোধী দল ও সামাজিক সংগঠন এই প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। 'অন্য বিশ্ব নয়', সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়াই এদের এজেন্ডার মূল আলোচ্য বিষয়। যেভাবে এই ঐক্য গড়ে উঠেছে, সমাজতন্ত্রের বিষয়টি যেভাবে এরা আলোচনায় আনছে, সে সব থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত সারা পৃথিবীর বামপন্থীদের। মনে রাখতে হবে, একদিনে এটা গড়ে ওঠেনি। ব্রাজিলের সাও পাওলোয় এ নিয়ে প্রথম বৈঠক হয় ১৯৯০ সালে। আয়োজক ছিল লুলা-র ওয়ার্কার্স পার্টি। এই মঞ্চে একবিংশ শতকের সমাজতন্ত্র নিয়ে এদের যে ভাবনাচিন্তা সে নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা চলছে। সাবেক চিন্তার বেড়াজাল ছিঁড়ে সব দেশের বামপন্থীদেরই এদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আজকের বাম রাজনীতির কাছে এটাই হলো বর্তমান সময়ের দাবি।

ভ্রম সংশোধন

আগস্ট ২০১৪ সংখ্যায় 'বিপ্লবীর বাবু দর্শন ও প্রসঙ্গত' প্রবন্ধে ৩৮ পৃষ্ঠায় একটি ভুল রয়ে গেছে। আছে "সমর সেন প্রয়াত হন ২৩ আগস্ট, ১৯৭৮", হবে ২৩ আগস্ট, ১৯৮৭। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন

ছোট আন্দোলন : গণ রাজনৈতিক উদ্যোগ

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এখানে, আমাদের রাজনীতির, রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা চেহারা, চরিত্র, ঢঙ, ধরণ, রকম—এসব তৈরি হয়ে আছে এখন। এমন তৈরি হওয়ার শুরু স্বাধীনোত্তর কাল থেকে।

বড়ো রাজনীতিক দল। দলেদের নির্দিষ্ট বর্গভিত্তিক শাখা সংগঠন। শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকদের জন্য কৃষকসভা, কর্মচারীদের জন্য এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, যুবকদের জন্য যুব ফেডারেশন, ছাত্রদের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন, মহিলাদের জন্য মহিলা ফেডারেশন, শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের আবার বিভিন্ন ভাগ কারখানা ধরে, একটি শিল্প ধরে। কৃষকদের জন্য কৃষকসভা, খেতমজুরদের জন্য নয়। কর্মচারীদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, সরকারি কর্মচারি আলাদা, বেসরকারি কর্মচারি আলাদা। একই রাজনীতিক দলের আওতায় হলেও সবাই সব সংগঠন আলাদা আলাদা। এক একটি বর্গের সংগঠনের মাথার ওপর আঞ্চলিক কমিটি, রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি। এতো একধরনের মাথার ধাপ। আর এক ধরনের মাথার ধাপ আছে। এইসব সংগঠন পার্টির, পার্টিদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে পার্টির ধাপ।

কী বিষয়ে আন্দোলন হবে, কীভাবে হবে, কবে হবে, কতদূর হবে এটা দুবার ঠিক হবে। একবার সংগঠনের ধাপে, আর একবার পার্টির ধাপে ধাপে। সবকটি ধাপ রাজি হলে হবে, না হলে হবে না। একটি বর্গের, একটি স্তরে, একটি জায়গায়, একটি বিষয়ের আন্দোলন, আন্দোলনের বিষয়, হারিয়ে যায়, জায়গা পায় না, সম্মতি পায় না, এই এতো বড়ো এক সংগঠন কাঠামোয়। শুরু যদিও বা হয়ে যায়, থেমে যায়, থামিয়ে দেওয়া হয়।

কাদের কোন্ বিষয়ে আন্দোলন হবে, কীভাবে হবে, কতদূর হবে, কেন হবে— এসব ঠিকঠাক হয় পার্টির ঠিক করা, ঠিক করে রাখা নীতির ওপর, কর্মসূচির ওপর, ভাবনার ওপর, পরিকল্পনার ওপর। পার্টি কী চায়? সব প্রতিষ্ঠিত পার্টিই চায় সরকারে যেতে, সরকার বানাতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে, শাসন করতে। পার্টি, পার্টিরা কীভাবে যেতে পারে, থাকতে পারে শাসন ক্ষমতায়? 'ভোট' পেয়ে, ইলেকশনে ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে, ভোট নিয়ে, ভোট পেয়ে।

দেশের সবাই পার্টিদের কাছে এক একজন 'ভোটার'। পার্টির সব সংগঠনের আওতায় থাকা সবাই ভোটার। ভোট পাবার ভোটার। কোন্ বর্গের, কোন্ সংগঠন, কোন্ অঞ্চলের সংগঠন, কোন্ বিষয়ে, কীভাবে, কতটা ভোট পাওয়া যাবে, বা উল্টো দিক থেকে ভাবলে, কতটা ভোট হারাতে হবে, অথবা অন্য দিক থেকে ভাবলে এখন যারা ভোট পেয়ে সরকারে আছে তাদের কোন কোন ভোটারকে, কতটা ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে আসা যাবে। এ তো গেল একদিক থেকে পার্টিদের করা আন্দোলনকে দেখা।

এবার অন্য একদিক থেকে দেখা। রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখা। রাষ্ট্র মানে আইন-কানুন, নীতি-বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, প্রশাসন, পুলিশ, আদালত। এরা ঠিকঠাক করে দিয়েছে আন্দোলন সংগঠনের চেহারা ও চরিত্র, সদস্যদের মাপ, আন্দোলনের ধরন ও পরিসর। আন্দোলন নিয়ে রাষ্ট্রের সব উপাদানের কিছু না কিছু করার আছে, মাথা গলানোর আছে। প্রশাসন আন্দোলন নিষেধ করতে পারে, পুলিশ আন্দোলন ভেঙে দিতে পারে, আদালত আন্দোলনকে নিজের চত্বরে নিয়ে আসতে পারে, আন্দোলন নিয়ে বিচারসভা বসিয়ে দিতে পারে। এদের সবারই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক। আন্দোলনকে কতটা কমিয়ে দেওয়া যায়, দমিয়ে রাখা যায়, বেঁধে ফেলা যায়।

এখনকার আন্দোলনকে রাজনীতিক দলেদের দিক থেকে দেখা হল, রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখা হল। এবার অর্থনীতির দিক থেকে দেখা। রাজনৈতিক আন্দোলনের মোটাদাগে দুটি উদ্দেশ্য থাকে— আর্থনীতিক ও সামাজিক। বড়ো রাজনীতিক দলগুলো, বড়ো রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানত আর্থনীতিক দাবি পূরণের জন্য। এবং এই অর্থনীতির জন্য রাজনীতিক আন্দোলন রাষ্ট্রমুখী, রাষ্ট্রের কাছে দাবি, রাষ্ট্র নির্ভরতা, অর্থনীতির পরিসরে রাজনীতির আন্দোলন, রাষ্ট্রমুখী রাজনীতিক আন্দোলন একটা দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রকেই দিতে হবে। কারণ বহুদিন পর্যন্ত অর্থনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রনির্ভর। ফলে দাবি রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্র দাতা। দেশবাসী, দাবি চাওয়া, দাবি করা, আন্দোলন করা দেশবাসী গ্রহীতা। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রও স্বস্তিতে। আন্দোলনকারী রাজনীতিক দলও স্বস্তিতে। আন্দোলনকে একটি রাষ্ট্র নির্ধারিত পরিসরে রেখে দেওয়া গেল। এমনকি অরাষ্ট্রিক পক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দাবি করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়করণ, 'ন্যাশানাইজেশন', রাষ্ট্রীয় অধিকরণ। আন্দোলনের লক্ষ্য, আন্দোলনের পূর্ণতা। দাতা রাষ্ট্র ও গ্রহীতা আন্দোলনকারী সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দেশবাসী সম্পর্ক চলে এসেছে আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-আন্দোলনকারী সম্পর্কে। আবার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-আন্দোলনকারী সম্পর্ক চলে এসেছে রাজনীতিতে ভোটার-পার্টি সম্পর্ক। আন্দোলনকারী দেশবাসীর ভোটার হয়ে গেছে, ভোটার বানিয়ে রাখা হয়েছে।

আন্দোলনকারী সংগঠনের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চাওয়া, ভোট চাওয়া, পার্টি হতে চেয়েছে, হয়ে থেকে গেছে। এবার পুঁজির দিক থেকে দেখা। পুঁজি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল এবং ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে এবং নেই। দুটোই সত্যি। একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। একটা চলমান, পরবর্তনশীল প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৫০ দশক থেকে এখন এই ২০১০ দশক পর্যন্ত পুঁজির অবস্থান, ক্ষমতা, চাহিদা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য বদলে বদলে চলেছে। রাষ্ট্রের মধ্যে তার অবস্থান, তার আর্থনীতিক ক্ষমতা, তার রাজনীতিক পরিকল্পনা, তার আকাঙ্ক্ষা, সমাজের অন্য অন্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার আধিপত্য বদলে বদলে চলেছে। রাজনীতিকে রাজনীতিক আন্দোলনকে সে এখন মোকাবিলা করছে, করতে চাইছে রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে, রাষ্ট্রের মধ্যে তার আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে, আবার রাষ্ট্রের বাইরে থেকেও। আন্দোলন, আন্দোলনকারীদের কাছে এ এক নতুন পরিস্থিতি।

এবার সংজ্ঞার্থের দিক থেকে। আন্দোলনের সংজ্ঞা, আন্দোলনকারীদের বর্গ, আন্দোলনের ধরন সবই সরকার নির্ধারিত। সরকার নির্ধারিত, অতএব আন্দোলনকারী সংগঠন, সুতরাং রাজনৈতিক দল নির্ধারিত। কোথায় আন্দোলন, কাদের আন্দোলন, কী বিষয়ে আন্দোলন, কী ধরনের আন্দোলন, কাকে উদ্দেশ্য করে আন্দোলন— এ সবই সরকারি আইন, বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা, নীতি দ্বারা নির্ধারিত, সীমাবদ্ধ এবং স্বীকৃত। নির্ধারিত বর্গ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। কোথায় আন্দোলন, সেখানে আন্দোলন করা যায় কিনা, করা গেলে কী ধরনের আন্দোলন করা যায়, কারা আন্দোলন করছেন, তারা আন্দোলন করতে পারেন কিনা, পারলে কী ধরনের আন্দোলন করতে পারেন, কী বিষয়ে আন্দোলন করতে পারেন, কতটা করতে পারেন, আন্দোলন করতে নামার আগে আগে কী কী নিয়ম মানতে হবে, কাদের কাদের নিয়ম কিভাবে মানতে হবে। প্রশাসন, পুলিশ, আদালত আন্দোলনের কোন পর্যায়ে কাদের কাছে যেতে হবে, কী ভাবে যেতে হবে। আন্দোলনে যাবার সময়, থাকার সময় কাদের, কী, কখন, জানাতে হবে।

এছাড়াও আন্দোলনের নিজের নিয়ম, ব্যবস্থাপনা, পদ্ধতি, অভ্যাস, ইতিহাস, কাঠামো, স্থাপত্য আছে। মঞ্চ বাঁধা, বক্তার তালিকা, সভাপতি ইত্যাদির বসার জায়গা, বক্তৃতার বিষয়, ভাষা, শব্দ, বাক্যবন্ধ, ঢঙ, বক্তৃতার আগে পরে গান, শ্লোগান, মিছিলের পথ, মিছিলের স্লোগান, ফেস্টুন, মিছিলে কাদের কোথায় অবস্থান, পোস্টারের নকশা, ভাষা সব নির্ধারিত, পরিকল্পিত, সীমাবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত, গতানুগতিক, অভ্যস্ত, প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত, মান্য। আন্দোলনকারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বর্গ নির্ধারিত, স্থিরকৃত, আইনি, লিখিত, কোন ধরনের 'কারখানা'র শ্রমিক, কারখানায় 'কতজন' শ্রমিক। কোন ধরনের শ্রমিক। স্থায়ী না অস্থায়ী। পূর্ণ সময়ের না আংশিক সময়ের। পুরুষ না মহিলা, দক্ষ না অদক্ষ। ইউনিয়ন স্বীকৃত না অস্বীকৃত, নথিভুক্ত কি নথিভুক্ত নয়, কী সংস্থা, কোন ধরনের সংস্থা, সরকারি, আধাসরকারি, সরকার অধিগৃহীত, সরকার নিয়ন্ত্রিত, বেসরকারি। কী ধরনের কর্মচারী, স্থায়ী, অস্থায়ী, শিক্ষানবিশ, কাজভিত্তিক, সময়ভিত্তিক, নিয়োগ। কাজের জায়গায় ধরন, উৎপাদন নাকি ব্যবসা, পরিকাঠামো নাকি পরিষেবা। এমনভাবে ভাগ ভাগ করে, বর্গ বানানো, আলাদা আলাদা বর্গের জন্য আলাদা আলাদা আন্দোলন নিয়ম বানানো। নিয়ম মানানো। আন্দোলন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের দেশে আমাদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ, প্রচলিত, পরিকল্পিত, আন্দোলনকারী সংগঠন, রাজনীতিক দল, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, পুঁজির প্রকল্প এইসব দিয়ে আন্দোলনকে একটি পরিসরের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলন তার মধ্যে থেকে রয়েছে।

তবুও আন্দোলনকে এর মধ্যে থাকতে দেওয়া, রেখে দেওয়া হলো না। কারণটা হয়তো এইরকম। এইরকমভাবে ভাবা যেতে পারে।

আন্দোলনকারীরা, আন্দোলন সংগঠকরা আন্দোলন রাজনীতির এই সীমাবদ্ধ কাঠামোকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি, বরং টিকিয়ে রেখেছে, রেখে সন্তুষ্ট থেকেছে, নিজেদের ইচ্ছে পূরণ করিয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্র এবং পুঁজি থেমে থাকেনি, এমন কাঠামো বানিয়েও সন্তুষ্ট থাকেনি, আরও এগোতে চেয়েছে, এখন চাইছে। সেটা আমাদের এখন বুঝে নিতে হবে।

দুপক্ষের সম্বন্ধ, দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব সমাধান, সমঝোতা। এটাও একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। কোথাও এসে থেমে থাকতে পারে না। একপক্ষ থেমে থাকতে চাইলেও, অন্য পক্ষ চাইবে না, চাইতে পারে না। ক্ষমতাসীন পক্ষ রাষ্ট্র এবং পুঁজি চাইল, চাইছে এই কাঠামোটাকে আরও ছোট করে দিতে। সম্প্রতি উদাহরণ: কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা দলের রাজ্য সরকারের শ্রম আইন পরিবর্তন প্রকল্প। শ্রমিকদের সীমাবদ্ধ অধিকারের, অধিকার রক্ষা আন্দোলনের পক্ষে যতটুকু নীতি, আইন, নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি ছিল সেসব কমিয়ে দেওয়া, কেড়ে নেওয়া। স্বাধীনতা-উত্তর কালে শ্রমিক-রাষ্ট্র সম্পর্কের, দ্বন্দ্বের যে অবস্থান ছিল, যে অবস্থানের জোরে শ্রমিকদের পক্ষে যতটুকু পাওয়া গিয়েছিল, তা শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন, সংগঠন নেতৃত্বের রাজনীতিক দল, তা বাড়াবার উদ্যোগ নেয়নি। সন্তুষ্ট থেকেছে। ফলে এখন হারাবার পালা। অতএব শ্রমিক আন্দোলনকে ধাক্কা দিয়ে, স্বাধীনতা উত্তরকালের সময়ে পিছিয়ে দেওয়া, শ্রমিক আন্দোলনকে আবার সেখান থেকে শুরু করতে হবে। এবং এক নতুন এবং কঠিন পরিস্থিতিতে। যখন ক্ষমতায় যতটা না রাষ্ট্র তার থেকে বেশি পুঁজি, ব্যক্তি পুঁজি, সংস্থা

পুঁজি, দেশি এবং বিদেশি। রাষ্ট্র ও পুঁজির এমন সাম্প্রতিক অবস্থানটা আর একটা দিক থেকে বুঝতে হবে।

পুঁজির চেহারা আর চরিত্রের ধরন বদলে বদলে চলেছে, চলবেই। পুঁজি বলতেই শুধু শিল্প, কলকারখানা, উৎপাদন, শ্রমিক, শ্রমিকবসতি, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প অঞ্চল, চিমনির ধোঁয়া, বোনাস, স্ট্রাইক, এগ্রিমেন্ট, এখন আর শুধু এসবই নয়। আরও অনেক অনেক কিছু, অনেক জায়গায় অনেক বড়ো করে, অনেক কিছু ধরে নিয়ে, ছড়িয়ে এখন এখনকার পুঁজি।

কৃষি, চাষ, বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি, জল, নদী, সমুদ্র, সমুদ্রের উপকূল, জমি, জঙ্গল, পাহাড়, শহর, গ্রাম, বাতাস, বাঁধ, পরিবহন, পরিকাঠামো, রাস্তা, বাজার, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা, গান, সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, দোকান, ছবি, গ্যালারি, সিনেমা হল, খবরের কাগজ, টেলিভিশন চ্যানেল, গাছ, চারা, মাটি, বাসস্থান, ক্লাব, মানবিক সম্পর্ক, স্বাস্থ্য, সন্তান জন্ম, ভ্রমণ, পাহাড়ে চড়া, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, রাজনীতিক দল, পত্রিকা, শরীর, গবাদি পশু, প্রাণী, উদ্ভিদ, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বাণিজ্য, বিনোদন, ব্যবসা, মেলা, উৎসব, রিসার্চ প্রজেক্ট, এক্সপার্ট, কমিটি, এনভায়রনমেন্টাল গ্রান্ট, অ্যাসেসমেন্ট, পুজো, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মিনিস্টারিয়াল কমিটি, এক্সপার্ট সার্ভে, রিপোর্ট— সব জায়গায়, সব কিছুতে, সব রকমভাবে পুঁজি। পুঁজি মালিক, পুঁজি সংস্থা, পুঁজি প্রতিষ্ঠান।

পুঁজির এখন এই সব জায়গায়, সব কিছু চাওয়াতে সে ধরে ফেলতে চাইছে, ধরে ফেলছে সরকার আইন, নীতি, প্রকল্প, ভাবনা। পুঁজির দরকার মাটির নিচের সম্পদ। বানিয়ে দাও খনি ও খনিজ সম্পদ আইন। দিয়ে দাও যতটা চাই জমি, বদলে দাও আদিবাসীদের জমি অধিকার আইন। পুঁজির প্রয়োজন জঙ্গল, জঙ্গলের ভিতরের জীববৈচিত্র্য সম্পদ। জঙ্গলের নিচের সম্পদ। ভেঙে দাও বনবাসীদের অধিকার আইন। পুঁজির চাই জমি, অনেক অনেক জমি। পাল্টে দাও জমি আইন। পুঁজির লাগবে সমুদ্র, সমুদ্রতট। বদলে দাও উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন। পুঁজির ইচ্ছে এমন কারখানা বানানো যাতে দূষণ হবে। দেখো যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ব্যবস্থাপনা কাজে লাগানো না হয়। পুঁজির আকাঙ্ক্ষা তার বানানো বীজ দিয়ে চাষের মাঠে ভরিয়ে দেবে। চাষির নিজের বীজের ওপর বাধা বানিয়ে আইন তৈরি করে দাও। পুঁজির শখ তার বানানো সার, কীটনাশক দিয়ে সাজিয়ে দেবে চাষের জমি। বানিয়ে দাও তেমনভাবে কৃষিনীতি। পুঁজির চাহিদা অনেক অফুরন্ত বিদ্যুৎ। পাহাড় ভেঙে নদী আটকে বিদ্যুৎ তৈরি করে পৌঁছে দাও। পুঁজির আহ্লাদ একটু আরাম করে থাকা বানানো। দিয়ে দাও পাহাড়ের ঢাল, নদীর ধার, মোহনার তীর, উপত্যকার কোল, সমুদ্রের বেলাভূমি। পুঁজির যুক্তি তার বানানো উৎপাদনই শেষ কথা। অকেজো করে দাও পরিবেশ সুরক্ষা আইন। পুঁজির বাসনা পুরনো শহর সাজাবে, নতুন করে শহর বানাবে নিজের মতো করে। লিখে দাও শহর পুনর্নির্মাণ নীতি। এমনটা চলছে। এমনটাই চলতে থাকছে। এবং থাকছে না, আটকাছে, আটকানোরই, আটকে দেবারই কথা।

আটকে দিচ্ছেন আদিবাসীরা, বনবাসীরা, উপকূলবাসীরা, পাহাড়বাসীরা, দরিদ্র শহরবাসীরা, গ্রামবাসীরা, ছোটখাদান শ্রমিকরা, খাদানধারের গ্রামবাসীরা, নদীতীরবাসীরা, ভূমিবাসীরা, দ্বীপবাসীরা, বীজচাষিরা, জীববৈচিত্র্য রক্ষাকারীরা, নদীভাঙন বিরোধীরা, জলবিদ্যুৎ বাঁধ বিরোধীরা। কারখানা দূষণ বিরোধীরা, চলবাসীরা, মোহনা-বাসিন্দারা, পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধীরা, মাটির তলায় থাকা জল রক্ষাকারীরা, বনসম্পদ রক্ষাকারীরা, পথবিক্রেতারা, পাহাড় রক্ষাকারীরা, ছোটো নৌকার সমুদ্র জেলেরা, পাহাড় ফাটানোর বিরোধীরা, গাছকাটার বিরোধীরা, জলাশয় বোজানোর বিরোধীরা, বন্ধ কারখানার জমি দখল বিরোধীরা, ছোটবাজার রক্ষাকারীরা, শ্রমিক বসতি দখল প্রতিরোধীরা। এমন সবাই, এমনতর সবাই।

এই আন্দোলনগুলি চরিত্রে এবং চেহারায় এতদিনের পরিচিত, প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত, মান্য আন্দোলনগুলি থেকে ভিন্ন। এদের ভূগোল নির্দিষ্ট, অংশগ্রহণ সীমিত, বিষয় সংক্ষেপিত, প্রকাশ নিজস্ব, ধরন স্বকল্পিত ও স্বনির্ভর।

এইসব আন্দোলনের উপাদান যতটা না আর্থনীতিক, তার থেকে বেশি ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক। এই আন্দোলনের উপকরণ ঐতিহ্য পরম্পরা, উত্তরাধিকার, গোষ্ঠী চেতনা, প্রকৃতি নির্ভর জীবন, জীবনযাপন, মানুষ-প্রকৃতি, সম্বন্ধের ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, সহযোগিতা, সংরক্ষণ, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ইত্যাদি এই সকল।

এই আন্দোলন বড়ো আন্দোলনকারী প্রচলিত আন্দোলন সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক দল, পার্টি, গভর্নমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, জুডিসিয়ারি, অ্যাকাডেমিয়া, এক্সপার্ট কমিটি, কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, মিনিস্ট্রি, রিসার্চ ইনস্টিটিউশন, ক্যাপিটাল, কোম্পানি, মার্কেট, প্যারামিলিটারি ফোর্স, মিডিয়া, অফিসিয়াল কালচার, স্টেট এদের কাছে খানিকটা অপরিচিত, একটু নতুন, সবটা বোধগম্য নয়, পুরোপুরি আয়ত্তাধীন নয়।

ফলে পুঁজি এবং রাষ্ট্র এখন বুঝতে চাইছে, ধরতে চাইছে এই ধরনের আন্দোলনগুলিকে।

আর ক্ষমতাসীনদের এই সময় নেওয়ার সময়টাই এই আন্দোলনগুলির নিজেদের ক্ষমতা বুঝে নেওয়ার সময়। আমরা যারা এই আন্দোলনগুলির পাশে দাঁড়াতে চাই তাদেরও বুঝে নেওয়ার সময়।

এই লেখাটিতে কয়েকটি বুঝে নেওয়ার বিষয় রাখা হল। সংক্ষেপে, অসম্পূর্ণতায়, প্রস্তাবনায়, অবিন্যস্ততায়।

১। এই আন্দোলনগুলি রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজনীতির, রাষ্ট্র-স্বীকৃত রাজনীতিক দলের নির্মাণ ও পরিচালনার বাইরে।

২। এই আন্দোলনগুলি গণ-উদ্যোগ, গণ-রাজনীতি, অন্য-রাজনীতি। স্বাধীনতা পূর্বকালের বিভিন্ন অংশগ্রহণের, বিভিন্ন প্রকাশের, বিভিন্ন সংগঠনের আন্দোলনগুলিকে ফিরিয়ে আনা।

৩। এই গণ-উদ্যোগ, গণ-রাজনীতিতে আধিপত্যকারী রাজনীতিক দলের বাইরে, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির আত্মবিকাশের প্রকাশ এবং এই দলের স্বীকৃতি যে, স্বাধীন মানুষই সবচেয়ে বড়ো স্রষ্টা।

৪। এই গণ-উদ্যোগ, গণ-রাজনীতি, গণ-উদ্যোগ রাজনীতি, গণ-রাজনীতি উদ্যোগ মূল রাজনীতির বিকল্প, বিপরীত, অন্য-অপর বিরুদ্ধতা। এখানে অংশগ্রহণকারী একজন ভাবুক, সমালোচক, গবেষক, নির্মাতা, সাহসী।

৫। এই গণ-উদ্যোগ-রাজনীতির উপাদান নিজেদের (রাষ্ট্রের, সরকারের, দলের নয়) ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতি।

৬। এই গণ-রাজনীতির ধরন নিজস্ব, চলমান, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, ক্রিয়াশীল, গণতান্ত্রিক।

৭। এই গণ-রাজনীতি-উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বাইরে স্ব-স্বীকৃত, স্ব-রাজনীতিক।

৮। এই গণ-উদ্যোগ, রাষ্ট্র যেভাবে রাজনীতিকে সাজায়, সাজাতে বলে, থাকতে বলে তার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আর একটা রাজনীতির সন্ধান। যেখানে অন্য উন্নয়ন ধারণা, অন্য অধিকার ধারণা।

৯। এই গণ-রাজনীতির উপকরণ, লোকভাষা, লোক রাজনীতিক ভাষা, লোকস্বর, লোকভাবনা, লোকজ্ঞান, লোকনির্মাণ।

১০। এই গণ-রাজনীতিক ভাবনায় ক্ষমতাসীনদের 'এক', 'সামগ্রিক', 'সাধারণ' নির্মাণের বিপরীতে 'বহু' 'স্থানিক' বিশেষ-এর ধারণা নির্মাণ। অসংখ্য জীবনযাপনের অস্তিত্বের পাশাপাশি অসংখ্য রাজনীতি ধারণা ও ধরনের অস্তিত্ব নির্মাণ।

১১। এই গণ-রাজনীতির কয়েকটি ধারণাগত সমর্থক—

ক) ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব-পরবর্তী 'মানব ও নাগরিক ঘোষণা'য় উল্লেখ আছে : মানুষের কিছু অধিকার আছে যা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

খ) ১৯৮৪-এর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় রয়েছে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করা চলবে না।

গ) ১৯৮৬-এর উন্নয়নের অধিকারে বলা আছে : প্রাকৃতিক সম্পদ ও রসদের ওপর রয়েছে জনগণের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকার।

ঘ) অস্ট্রেলিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে ভূমি সম্পদের বেলায় ব্যক্তিস্বত্ব ও রাষ্ট্রস্বত্বের বাইরে একটি তৃতীয় স্বত্ব মানতে হবে— জনগোষ্ঠীর যৌথস্বত্ব।

প্রচলিত রাজনীতি, রাজনীতিক দলের বড়ো রাজনীতি রাষ্ট্রের মতো, পুঁজির মতো প্রত্যেককে 'একজন ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য করে, সংগঠনের 'একজন সদস্য' হিসাবে চিহ্নিত করে, ব্যবহার করে। রাষ্ট্রের ও পুঁজির দেখা এবং রাজনীতির দলের দেখার বাইরে একটি তৃতীয় দেখা, একটি তৃতীয় সত্তা, রাজনীতির সত্তা, গোষ্ঠীর সদস্য। যৌথ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একজন সদস্য। গণ-রাজনীতিতে এই গোষ্ঠী ধারণা গোষ্ঠী সদস্য ধারণায় পরিবর্তিত হবে প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক আন্দোলনে সংগঠক ও কর্মী, নেতা ও কর্মী, কর্মী ও অংশগ্রহণকারী, নেতৃত্বের বিভিন্ন ধাপ, উপর-নীচ এই পার্থক্য, প্রভেদ, ক্ষমতা বিন্যাস। আন্দোলনের সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা বিন্যাস।

দুটি উদাহরণ দেওয়া যাবে ছোট আন্দোলন থেকে। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি-র আন্দোলন। সাধারণ চলতি প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের কাঠামোটা পিরামিডের মতো, নীচে থেকে উপরে কেন্দ্রীভূত। প্রথমে নীচ থেকে নির্বাচিত হতে হতে ওপরে যাওয়া। এই একবারই নীচে নামে সিদ্ধান্ত, নির্দেশ, সার্কুলার, অর্ডার, নোট। সে বিষয়ে কোনো কিছু আর ওপরে যায় না, যাওয়ার কথা নয়। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি, জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের গোষ্ঠী সংগঠন ছিল। ছিল বলছি, আমি যখনকার কথা বলছি তখন যেমন ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি আর গ্রাম কমিটি। আগে গ্রাম কমিটিতে আলোচনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিয়ে যাওয়া গ্রাম কমিটির পাঠানো সদস্যদের মধ্যে দিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তার ভিত্তিতে আলোচনা। সেই আলোচনা আবার নিয়ে আসা গ্রাম কমিটিতে। গ্রাম কমিটির সদস্য গ্রামের সবাই। সেই আলোচনা আবার নিয়ে যাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে। অনন্ত যাওয়া আসা, আসা যাওয়া, গোষ্ঠী আলোচনা, গোষ্ঠী মত, গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত, গোষ্ঠী আন্দোলন, গোষ্ঠী রাজনীতি।

কোদাল বস্তি একটি বনবস্তি। ডুয়ার্সে। আমার কোদাল বস্তি যাওয়া বন-অধিকার আইন নিয়ে কাজ করতে উত্তরবাংলার বন্ধুদের সঙ্গে। বন-অধিকার আইনে বনের ওপর বনবাসীদের গোষ্ঠীগত অধিকার মান্যতা। আইনটি কাজে লাগানোর জন্য। বনবাসীদের আন্দোলন উদ্যোগ। বস্তিতে যাওয়ার মুখেই একটা মাঠ। যদিও বস্তিবাসী সংগঠনের একটা ঘর আছে তবুও মাঠেই বসা। গোল হয়ে বসা। সবাই কথা বলবেন, সবার কথা সবাই শুনবেন। শুনে সবাই বলবেন। কথা শুরু হলো। বস্তিবাসীরা আসতে থাকলেন। প্রথম গোলের পিছনে আর একটা গোল, তারপর আর একটা গোল, যে যখন পারছেন, আসছেন, চেয়ার পেতে নিচ্ছেন, যে যখন মনে করছেন চলে যাচ্ছেন, গোল

গড়ছে, ভাঙছে, গড়ছে, চলছেই। অনন্তর আসা যাওয়া। সভাপতি নেই, নির্দিষ্ট বক্তা নেই, মিনিটস্ নেই, রেজলিউশন নেই। ব্যক্তি ব্যক্তি বিষয়ে কথা বলছেন না গোষ্ঠী বিষয়ে, সমষ্টি বিষয়ে কথা বলছেন। অন্য ধরনের সংগঠন, রাজনীতিক সংগঠন কাঠামো।

অনেকটা ছড়িয়ে ফেলছি, ফেলেছি, এবার গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

একটি গণ-রাজনীতি, গণ-রাজনীতিক উদ্যোগ, গণ-উদ্যোগের কথা বলা হলো। ছোট ছোট আন্দোলনের কথা বোঝার চেষ্টা হল। এই আন্দোলন, এই রাজনীতি বড়ো দল, বড়ো রাজনীতিক দল, বড়ো রাজনীতিক দলের উদ্যোগের বাইরে, এবং বিপরীতে। এ এক নতুন রাজনীতি। এই ছোট আন্দোলন, গণ-রাজনীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং পুঁজি। বিরুদ্ধতার দুটি চেহারা। একটি হিংস্র। সামরিক বিরুদ্ধতা। অন্যটি প্রশাসনিক। আর্থিক উন্নয়ন, প্রকল্প, ভরতুকি, ত্রাণ, ভিক্ষা, অনুদান, এমন সব দিয়ে বিরুদ্ধতা।

বড়ো রাজনীতিক দল ও ছোট আন্দোলন, গণ-রাজনীতির বিপরীতে। না বুঝতে পারায়, না ধরতে পারায়, এখনও পর্যন্ত না আত্মসাৎ করতে পারায়। আর আমরা যারা রাষ্ট্র এবং পুঁজির সঙ্গে নেই, বড়ো রাজনীতিক দলের সঙ্গে নেই, আমাদের কাছে এমন গণ-রাজনীতিক উদ্যোগ অচেনা, অবোঝা এখন।

আপাতত এখানেই থামি। যদি প্রশ্ন আসে, তক্কো হয়, আলোচনা জমে, তখন আবার আর একবার।

ভারতবর্ষের মোদীকরণ ও পশ্চিমবঙ্গের মমতায়ন

১৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামির আলোকে পাঠক্রম পরিবর্তনের কী ভয়াবহ ফলশ্রুতি হয়, তা আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি। জিয়াউল হকের আমলে 'ইসলামিকরণের' নামে ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের ভ্রান্ত ইতিহাস শোনানো হয়েছে, এবং ধর্মোন্মত্ততায় দীক্ষিত করা হয়েছে। ফলে দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের ব্যাপক বিস্তৃতি, অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে ব্লাসফেমি বা ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগে হামলা, এবং নানা ধরনের অন্ধ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব। আমাদের দেশেও আমরা আগামী দিনে দেখতে পাব এক নতুন শিক্ষিত প্রজন্ম যারা হিন্দু ধর্মোন্মাদনাতে মেতে উঠবে, কুসংস্কারের অন্ধ বলি হবে, ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত চিন্তা ধারার বশবর্তী হবে। বিজেপি-র এই শিক্ষানীতি যদি সারা ভারতবর্ষে চালু হয় তাহলে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যতের ভারতীয় নগরিকেরা এক পাল মোটা-মাথা আহাম্মক রূপে আবির্ভূত হবে।

জাতীয় স্তরে 'মোদীকরণ' ও পশ্চিমবঙ্গে 'মমতায়ণ' (উভয়ে অনেকাংশে অনুরূপ) শুধুমাত্র বামপন্থীদের সামনে এক বিপজ্জনক 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে আসেনি, সারা দেশে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে এক অমঙ্গলের ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বস্তরে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন।

ধিক্কার

আলো নিভিয়ে, মাঝ রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্মম নিপীড়ন সভ্যতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মীদের ওপর নিয়মিত ও পাইকারি এই সমস্ত হামলার বিরুদ্ধে *অনীক*-এর পক্ষ থেকে তীব্র ধিক্কার জানাই।

আন্দোলন, সংগঠন ও রাজনীতি

সুচরিতা সেন

আন্দোলনই কি সব, না আন্দোলনের লক্ষ্যপূরণই মূল উদ্দেশ্য? সংগ্রাম কি স্বতঃস্ফূর্ত হবে, না তাকে নেতৃত্ব দেবে কোনো নির্দিষ্ট সংগঠন? আন্দোলন থেকে দল, না দল থেকে আন্দোলন? বীজ আগে না গাছ আগে? আন্দোলনের চরিত্র আর সেই আন্দোলন থেকে যে দলের জন্ম বা উত্থান, তার মধ্যে কি সর্বদা সঙ্গতি থাকে? এমনি অনেক প্রশ্ন আমাদের চিরকাল ভাবিয়ে তুলেছে।

ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। আধুনিক পৃথিবীর রাজনৈতিক পার্টি ব্যবস্থা সম্ভবত প্রথম শুরু হয়েছিল ইংলন্ডে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তার উৎস ছিল শতাব্দীর মধ্যভাগের গৃহযুদ্ধ। আর তার আগে-পরে নানা সামাজিক আন্দোলন। ফরাসি বিপ্লবও নানা বিভিন্ন আন্দোলনের ফল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বহু শ্রমিক আন্দোলন— ইউরোপে চার্টিজম, ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে ১৮৪৮-এর বিপ্লব— বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির জন্ম দিয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও সংগ্রাম রাজনীতির উৎস ছিল, এ কথা বললে ভুল হবে না। অবশ্য সর্বত্র গতিপ্রকৃতি ঠিক একরকম হয় নি। ইংলন্ডে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আগে হয়েছিল, তারপর রাজনৈতিক দল। অন্য দিকে জার্মানিতে বাম দলই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণ ইউরোপে, ক্ষুদ্রশিল্পের প্রাধান্যের জন্যই হয়ত, বেশি গুরুত্ব ছিল অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট ধারার।

আরো সাম্প্রতিক কালেও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে শক্তিশালী দলের বা সংগঠনের জন্ম হয়েছে। সত্তরের দশকে ইউরোপ আমেরিকার পরিবেশ যেমন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছিল, তেমনি বাড়ছিল পরিবেশ সচেতনতা। মানুষ আর প্রকৃতি যে এক সঙ্গে বাঁচে, তা অন্তত কিছু লোক বুঝতে পেরেছিল। পশ্চিম জার্মানি, পরে সংযুক্ত জার্মানিতে, এর দরুন গড়ে উঠেছিল 'সবুজ' বা 'গ্রিন' দল, যার মোটামুটি জনসমর্থন ছিল এবং যা কয়েকবার সরকারের অংশগ্রহণ করেছে। সবুজদের মধ্যে ছিল দুই ধারা। 'রিয়ালি' আর 'ফুন্ডি'— Realist আর Fundamentalist— বাস্তববাদী আর মৌলবাদী।

বাস্তববাদীরা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করতে রাজি ছিল। পুঁজিবাদের মধ্যেই কিছু পরিবেশবাদী কাজকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। অন্যদিকে মৌলবাদীরা মনে করত, পুঁজিবাদের অপসারণ ভিন্ন সুস্থ পরিবেশ গড়া সম্ভব নয়।

সবুজ দলের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবে বলা যেতে পারে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক, দুই দিকই আছে। সবুজরা (অবশ্য একা নয়, অন্যদের সহায়তায়) জার্মানিতে পারমাণবিক শক্তির রাশ টেনে ধরেছিল। জোর দিয়েছিল সৌরশক্তির ওপর। অন্যদিকে আবার এই দল, অন্তত তার বড় অংশ, ছিল অত্যন্ত কমিউনিস্ট বিরোধী ও সমরবাদী, এ কথাও অনস্বীকার্য। ১৯৯৯ সালে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো (NATO) সংখ্যালঘু আলবেনিয়ানদের রক্ষার নামে ইউগোস্লাভিয়া আক্রমণ করেছিল। নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছিল। ন্যাটোর সদস্য হিসাবে জার্মানি সমর অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে দেশের এই প্রথম অস্ত্র ধারণ। সবুজ দল সে সময় সরকারের অংশ ছিল। আর যুদ্ধকে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা মদত দিয়েছিল। পরিবেশের জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে, তারা দানিয়ুব নদীর পাশে এক রাসায়নিক কারখানায় বোমা ফেলে ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির একটিকে দূষিত করেছিল। দেখা যাচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে যে সংগঠন বা রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়, তারা আন্দোলনের মূল আদর্শ কিছুটা অনুসরণ করে, আবার কিছুটা যায় বিপরীত দিকে।

অনেক সময় রাজনৈতিক সাইনবোর্ড টাঙানো যখন নিষিদ্ধ বা বিপজ্জনক, তখন বিরোধী রাজনীতি অ-রাজনৈতিক, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ নেয়। কখনো বা ধর্মীয় রূপ। ধরা যাক কমিউনিস্ট আন্দোলনে পূর্ব ইউরোপের কথা। সেখানে অনেকে ছিল যাকে বলা হয় 'রাজনৈতিক খ্রিস্টান'। বিরোধীরা (dissidents) ধর্মবিশ্বাস-বর্জিত ছিল, কিন্তু বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে তারা গির্জাকে সেভাবে ব্যবহার করত। কারণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সাধারণত ধর্মের ক্ষেত্রে মাথা গলাতে চাইত না। আশির দশকের গোড়ায় পোল্যান্ডে সলিডারিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, অ-রাজনৈতিক, শ্রমিক ও জন-আন্দোলন রূপে। এমনকি আন্দোলনকারীরা মাঝে মাঝে বাম শ্লোগান ও গণসঙ্গীতও ব্যবহার করত। সবকিছুর প্রকৃত তাৎপর্য ও তার অন্তরালে কারা ছিল বোঝা গেল অনেক পরে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

লাতিন আমেরিকা এমন উদাহরণের আর এক কেন্দ্র। এই মহাদেশে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক বড় সময় জুড়ে সামরিক শাসন কায়েম হয়েছিল। তখন সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া অ-রাজনৈতিক (অন্তত দৃশ্যত) আন্দোলন ছিল একমাত্র বিকল্প। ধরা যাক ব্রাজিলের কথা। ১৯৬৪ সালে সে দেশে এক মডারেট বাম সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। তারপরই সেনাবাহিনী তাকে সরিয়ে নিজেরা রাষ্ট্রের চালকের আসনে বসে। আইনসিদ্ধ বিরোধিতার পথ রুদ্ধ হলো। বামপন্থীদের একাংশ অবশ্য সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ ধরলেন। তাদের তাত্ত্বিক

গুরু মারিগেলা। এমন কি ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী দিলমা রুসফ একদা গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন। পাশাপাশি অন্য আন্দোলনও চলল, যার গায়ে রাজনৈতিক লেবেল ছিল না। পরিবেশ, ধর্ম, এ সবও মিশেছিল তার সঙ্গে। ভাবাতাও নদীতে দুষণের ফলে মাছ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। বিপন্ন হয়েছিল মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা, ও সাধারণভাবে পার্শ্ববর্তী মানুষজনের স্বাস্থ্য। প্রথমে এক মিছিল করা হলো। পুরোভাগে ছিলেন স্থানীয় ধর্মযাজক। তিনি প্রথম জর্ডন নদীর ধারে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাঁর চিহ্ন অর্থাৎ ক্রস নিয়ে জমায়েত হলো নদীর ধারে। আজ মাছ, কাল মানুষ মারা যাবে। এই ছিল বক্তব্য। সরকার ব্যাপারটাকে হয় তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, নয়ত চুপ করে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিল।

সামরিক শাসনের যুগে ব্রাজিলে এক বিশেষ ধরনের শিল্পায়ন গুরুত্ব পেয়েছিল। তার কেন্দ্রে ছিল মোটর শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত ধাতু ও রঙ শিল্প ইত্যাদি। এসব ঘিরে একটি সক্রিয় ও লড়াকু শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। শিল্পায়ন বলতে প্রধানত ছিল সাও আঁদ্রে, সাও বারনার্ডো, বা সাও পাওলোর প্রান্তে সাও কেতানো। সামরিক আইনে শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাজিলে চল্লিশের দশকে চালু হয়েছিল মুসোলিনির ইতালির ধাঁচে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের কর্পোরেটিস্ট মডেল। তা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী ও জঙ্গি শ্রমিক সংগঠন জন্ম নিয়েছিল। সাও পাওলোর সাথে যোগের সূত্রে সম্ভবত তাকে বলা হতো "পাওলিস্তা"। সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন লুসিও ইনাসিও লুলা দা সিলভা। সংক্ষেপে লুলা নামে প্রচলিত ও জনপ্রিয়। ইনি পরবর্তী কালে হয়েছিলেন শ্রমিক পার্টির নেতা ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। আন্দোলন নিছক ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা ধারা তার সাথে মিশেছিল। নারীবাদ, পরিবেশবাদ, নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম— অ্যামেরিন্ডিয়ান, ব্রাজিলিয়ান আফ্রিকান। ব্রাজিলে বহু দিন পর্যন্ত দাস প্রথা চালু ছিল বলে কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের বংশধরেরা সেখানে লক্ষণীয় ছিল। ষাটের দশকের গেরিলা যোদ্ধাদের একাংশও যোগ দিয়েছিল। বাম শিবিরে ব্রাজিলিয়ান কমিউনিস্টদের যে একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল, তা বেশ খানিকটা খর্ব হয়েছিল। অনেকেই তাদের দোষ দিয়েছিল সামরিক শাসন ঠেকাবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য। এই মিশ্র আন্দোলন থেকেই শ্রমিক দলের উদ্ভব, যে শ্রমিক দল আজ ব্রাজিল শাসন করে। অবশ্য আন্দোলনের সব অংশীদার যে এ দলকে সমর্থন করত, এমন নয়।

মেক্সিকো বা মেহিকোতে নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় জাপাতিস্তা আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এর আদর্শ ছিলেন ১৯১০-এর মেহিকান বিপ্লবের নেতা জাপাতিস্তা। কিন্তু জাপাতিস্তারা পুরোপুরি সশস্ত্র সংগ্রামী ছিল না। তাদের আন্দোলন ছিল সক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ ও প্রচারের এক মিশেল। ঠিক সেই ভাবে কোনো নির্দিষ্ট কোনো দলও তৈরি হয় নি। কম্যান্ডান্ট মার্কোস বাদে খুব নির্দিষ্ট নেতাও ছিল না। তবে আক্রমণের লক্ষ্য স্বচ্ছ ছিল। নয়া উদারবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া নাফটা (নর্থ আটলান্টিক ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট), যা মেহিকো-র অর্থনীতি ও জনজীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রবাদ আছে, "মেহিকো স্বর্গ থেকে বেশি দূরে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশি কাছে।"

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। চিলি। এক মার্কিন মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থান নির্বাচিত বাম সরকারের রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিল। নিহত হলেন প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে। মার্কিন সরকার ও মিডিয়া 'টুইন টাওয়ার'-এর ওপর হামলার কথা সর্বদা বলে। কিন্তু এই ৯/১১ সম্বন্ধে নীরব থাকে। সে সময় রাজনৈতিক প্রতিবাদ সম্ভব ছিল না, তবে কাকতালীয় ঘটনা হলো, একই সময়ে বামপন্থী কবি পাবলো নেরুদার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ শোক মিছিলে সামিল হলো। দৃশ্যত, নেরুদার জন্য। প্রকৃতপক্ষে শুধু নেরুদা নয়, আইয়েন্দে ও বাম সরকারের জন্য। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্যও। এক বিশ্ববিখ্যাত কবির শোকসভা নিষিদ্ধ করার সাহস সামরিক সরকারেরও হয় নি। এটাও এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন।

তবে সব আন্দোলন বামপন্থীদের পক্ষে ছিল না। বিপরীত ধারাও ছিল। ফ্যাসিবাদ জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের বিকৃত গণ-চেতনা, গণ-ভিত্তি থেকে। চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানের আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ বাম সরকার ও আইয়েন্দের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ সরকার ও আইয়েন্দের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। গৃহবধূরা হাঁড়িকুড়ি বাজিয়ে রাজপথে মিছিল করেছিল। লাতিন আমেরিকায় এটা প্রতিবাদের প্রচলিত পথ। এর অর্থ, বাম সরকারের আমলে রুটি বাড়ন্ত। সামরিক ফ্যাসিবাদ কায়েম হওয়ার পেছনে এই 'সুশীল সমাজ'-এর অবদানও কম নয়। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার বাম সরকারের বিরুদ্ধে একই ধরনের আন্দোলন হয়েছে। এখানেও অভিযোগ, পণ্যদ্রব্যের, বিশেষ করে খাদ্যের, অপ্রতুলতা ও উচ্চ মূল্য। যদিও দুই ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সংকটের প্রকৃত কারণ ধনপতিদের অসহযোগ।

পেরুতে আশির দশকে ও নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় 'সেন্দেরো লুমিনোসো' বা উজ্জ্বল পথ (শাইনিং পাথ) নামক মাওবাদী বিপ্লবী দল সক্রিয় ছিল। ফ্যাসিবাদী সরকার ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল 'সুশীল সমাজ'-এর একাংশ ও কিছু সমাজসেবী সংস্থা, যাদের সাথে শাসক শ্রেণীর যোগ নিবিড়। এমনি এক সংস্থার নেত্রী বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়ার দায়ে তাদের হাতে প্রাণ হারালেন। কাজটি হয়ত ঠিক হয়নি। তবে অ-রাজনৈতিক সমাজসেবী বা জন-সংগঠনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মেলবন্ধন অনস্বীকার্য। অন্যদিকে বিশেষ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দাবি রাষ্ট্র কাঠামো পাল্টাতে পারে। বলিভিয়ার জল বে-

সরকারিকরণ বিরোধী আন্দোলন ক্ষমতায় এনেছে বাম সরকার ও এখন সেখানকার অ্যামেরিন্ডিয়ান রাষ্ট্রপ্রধান এভো মরালেসকে।

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সরকার যদি নাও পাল্টায়, নতুন দলের জন্ম দিতে পারে। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন প্রমাণ করল, প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী ফরাসি কমিউনিস্ট দল অন্তঃসারহীন। তার বামে সৃষ্টি হলো বেশ কয়েকটি অধিকতর চরমপন্থী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ''বাম প্রলেতারিয়ান' দল। স্বয়ং দার্শনিক সার্ত্র এর সদস্য ছিলেন। দলটি ঠিক মাওবাদী না হলেও চীন বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব স্বীকার করত। ছোট হলেও ছিল সক্রিয় ও প্রভাবশালী। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়া এক টুকরো লাভা।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রসঙ্গে আসি। এখানেও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যাকে বলে, মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক, ঘটে থাকে, যা ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের প্রায় সব দল ও সাধারণ মানুষ একযোগে আন্দোলনে নামল প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর বিরুদ্ধে। তিনি নির্বাচনে জালিয়াতি করেছিলেন, এই ছিল অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ভুট্টোকে মসনদ থেকে সরিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। কিন্তু দেশে কায়েম হলো সামরিক শাসন। এই শেষটা খুব সম্ভব আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল না। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন কেবল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করে নি। জামাতের দাঁত নখ ভেঙেছিল, অন্তত সাময়িকভাবে। বেগম জিয়াকে দুর্বল করেছিল। এটা আন্দোলনকারীদের ও 'সুশীল সমাজের' মনঃপুত হয়ে থাকতে পারে। শেখ হাসিনার বিজয় সবাই হয়ত চাইত না। কিন্তু বিকল্পই বা কী ছিল?

ভারতে জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন তথাকথিত 'দলহীন গণতন্ত্র'-র প্রবক্তা। যদিও এই সংজ্ঞার অর্থ কখনো খুব স্পষ্ট ছিল না। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জয়প্রকাশের নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন (অবশ্য বিভিন্ন দল তাতে অংশ নিয়েছিল) জরুরি অবস্থা ডেকে আনল। জরুরি অবস্থার অবসানের পর অ-কংগ্রেস সব দল, চরম বামপন্থী থেকে চরম দক্ষিণপন্থী, হাত মিলিয়ে গঠন করল নয়া দল, জনতা দল। এই দলই নির্বাচনে জিতে ইন্দিরাকে হটিয়ে সরকার গঠন করল। জয়প্রকাশের 'দলহীন গণতন্ত্র' ভিত্তিক আন্দোলন একটি নতুন দল ও সরকার সৃষ্টি করল। জনতার দ্রুত ভাঙন ও ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন ভিন্ন কাহিনী।

আজকের দিনে আন্না হাজারের কংগ্রেস বিরোধী ও দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন হয়ত জয়প্রকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুই গান্ধীবাদী নেতার মধ্যে আরও মিল লক্ষণীয়। দুজনই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু সংঘ পরিবারের প্রতি স্নেহশীল। হাজারের এক শিষ্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল গুরুর নির্দেশ অমান্য করে আম আদমি পার্টি (আপ) গড়লেন। অপ্রত্যাশিতভাবে জিতলেন দিল্লীতে। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি নাটকীয় কিছু চমক ছাড়া খুব একটা কিছু দিতে পারলেন না আর ৪৯ দিনের মাথায় পদত্যাগ করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই লোকের ধারণা হলো, ব্র্যান্ড কেজরিওয়াল আন্দোলনের পক্ষে ভালো, সংসদীয় রাজনীতি বা সরকার চালাবার জন্য নয়। লোকসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি প্রায় সর্বত্র লড়লেও জয়লাভ করে মাত্র পাঞ্জাবের চারটি আসনে। মহারাষ্ট্রে আপ-এর এক প্রার্থী ছিলেন মেধা পাটকর। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী রূপে ও অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মের জন্য তিনি বিখ্যাত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তা সত্ত্বেও মেধা হারলেন শোচনীয়ভাবে। এও সেই ব্র্যান্ডের ব্যাপার মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বাম অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েক-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রভাত মেধাকে তুলনা করেছেন ব্রিটেনের একটা ক্ষুদ্র কিন্তু সক্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। অনেক শ্রমিক কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে কমিউনিস্টদের ভোট দিতেন, সাধারণ নির্বাচনে লেবারকে। প্রচলিত ধারণা ছিল, কমিউনিস্টরা রুটিরুজির জন্য লড়াই ভালোই করতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর রাজনীতি ও প্রশাসনের জন্য অচল। এ দেশে বেশ কিছু সংগঠন 'আন্দোলনের দল' থেকে 'সরকার চালানোর দল'-এ গ্রাজুয়েট করতে পারে নি। আবার সরকার গড়ার পর আন্দোলন পুরোপুরি ভুলে গেলেও বিপদ। যেমন কিছুটা ঘটেছিল বামফ্রন্টের ক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭-১১ সালের মধ্যে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানুর ইত্যাদি নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। জয়প্রকাশের আন্দোলনের মতো এখানেও ডান বাম সব দল বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল। এমনকি রাজনীতি বহির্ভূত অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনও ফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। যেমন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে (তিনি ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন) মোমবাতি মিছিল করেছিল। প্রথমে 'সুশীল সমাজ' আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখার বিষয়ে সতর্ক ছিল। এমনকি এক মিছিলে মমতাকে স্থান পর্যন্ত দেয় নি। পাছে রাজনৈতিক লেবেল লেগে যায়। কিন্তু অনেকেই পরে মমতাকে সরাসরি সমর্থন জানান। তাঁর পক্ষে কলম ধরেন, গান করেন। এমনকি মাওবাদী নেতা, সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবক্তা কিষণজী ঘোষণা করেন, তিনি মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান। প্রাণ দিয়ে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

শেষ বিচারে, ফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র যতই পাঁচমিশেলি হোক, সব ফসল উঠেছিল মমতার গোলায়।

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও সংগঠিত বৃহত্তর রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক জটিল ও পরিবর্তনশীল। শিকড় থেকে শুরু করে যারা মগ ডাল পর্যন্ত যেতে পারে, বিন্দু থেকে সিন্ধু দর্শন করতে পারে, সাফল্য তাদেরই।

বিগত দু দশকে ভারতে গণ আন্দোলনের নতুন প্রবাহ ও কমিউনিস্টদের কর্তব্য

সুকান্ত রায়

এক

গত শতাব্দীর ৯০-এর দশক থেকে ভারতে গণ-আন্দোলনের এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। একবিংশ শতকের শুরু থেকে এটি অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও গভীর হতে থাকে। আজও এটি অব্যাহত এবং ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে তা আরও ব্যাপক হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে যারা সমাজ পরিবর্তন নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে ভাবনাচিন্তা করেন তাদের কাছে এই বিশাল গণ-জাগরণ এক বিশেষ গুরুত্ব ও গভীর তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। কয়েক দশক পরে জেগে ওঠা এই বিপুল জন-জাগরণ তাদের কাছে ভবিষ্যতের জন্য এক বিশেষ বার্তা বহন না করে পারে না। তাই যাঁরা সমাজবিপ্লব ঘটাতে চান তাদের কাছে এই চমকপ্রদ ঘটনাবলীর উৎস সন্ধান করা, এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা, গত দু দশক ধরে ঘটে চলা এই আন্দোলনগুলিকে তাদের নিজস্ব ভূমিকায় বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা এক গুরুতর কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

পাঠকেরা এটা ভালভাবেই জানেন যে, যে কালপর্বটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং ভারতে তার নিবিড় প্রয়োগের কাল। এই সময়টি জুড়ে ভারতে যে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা সকলেই অতি নিষ্ঠাভরে এই নতুন সাম্রাজ্যবাদী বন্দোবস্তের শরিক হয়েছে। অথচ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন হচ্ছে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এবং তার সঙ্গে আমাদের দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য এক মরণ কামড়। এ কামড়ের মূল লক্ষ্য তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষত তার সস্তা শ্রমশক্তি এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। যেহেতু তাদের পক্ষে এটি মরণবাঁচন এক প্রচেষ্টা তাই এ প্রশ্নে তারা হিংস্র, আপসহীন এবং আগ্রাসী। এ আক্রমণের শিকার দেশের সব পিছিয়ে পড়া ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতম অংশগুলি অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক। এই পর্বে তাঁদের ওপর শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির নির্মমতম বন্ধনহীন শোষণ আর লুণ্ঠন। সাম্রাজ্যবাদের যেমন এই লুণ্ঠন যজ্ঞ থেকে পিছু হটার উপায় নেই, তেমনই এই নিপীড়িত শ্রেণীগুলিরও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এক মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। লড়াই যখন আক্ষরিক অর্থেই বেঁচে থাকার সমার্থক হয়ে ওঠে তখন মানুষ কোনও দিকে তাকায় না। সে দল খুঁজে বেড়ায় না, নেতার জন্যও অপেক্ষা করে না। কোনও দোদুল্যমানতা তখন মৃত্যুরই সমান। তাই শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। গত দু দশকের গণ-আন্দোলনগুলি এই বর্গভুক্ত। দেয়ালে পিঠ-ঠেকে যাওয়া মানুষের এই লড়াই মর্মবস্তুতে বিশ্বায়ন বিরোধী, দেশি ও বিদেশি কর্পোরেট পুঁজি বিরোধী। দ্বন্দ্ব-রত দুটি পক্ষের কেউই যেহেতু পিছোতে পারবে না, তাই আগামী দিনগুলিতে এ লড়াই চলতেই থাকবে। হয়ত জোয়ার-ভাটা থাকবে, কিন্তু শেষ প্রবণতা হিসেবে লড়াই-ই জারি থাকবে।

বিশ্বায়নকে কেন সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির মরণ কামড় বলছি সে প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পুঁজিবাদ যখন থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ হয়ে উঠল, তখন থেকেই সে অনপনেয় এক সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ল। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজির দীর্ঘ যাত্রাপথে মুনাফার হারের নিম্নমুখী প্রবণতা, তার সঙ্গে শিল্পবৃদ্ধির নিম্নমুখিনতার হাত থেকে কখনই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। উপনিবেশে পুঁজি রপ্তানি করে এবং দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দুনিয়াকে ভাগবাঁটোয়ারা করেও এ সমস্যা থেকে সে বেরোতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশ্বপুঁজির অবস্থা হলো এই যে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রথমে পুঁজির ঘনীভবন এবং তার পরে পুঁজির কেন্দ্রীভবন এবং পরিশেষে পুঁজি অন্য দেশে রপ্তানি করেও শেষ পর্যন্ত মুনাফার হারের উর্ধ্বগতি বজায় রাখতে পারে নি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ শুরুই হলো পুঁজিবাদের এই সংকট সঙ্গে নিয়ে। পুঁজিবাদ তার পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য খণ্ড পুঁজির মিলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়া নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদকে এ রকম অবস্থায় টিকে থাকতে গেলে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা আগে ভাবাও যেত না। ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজির মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে কেন্দ্রীভবন শুরু হলো। এইভাবে শুরু হলো বহুজাতিক সংস্থা। এতে সাময়িকভাবে পুঁজি তার সঞ্চয়নের সমস্যা থেকে অনেকটা মুক্তি পেল। উৎপাদনের মাত্রা অনেক উপরে উঠে গেল, বিশ্ব বাণিজ্যের চলাচলের পরিসর বৃদ্ধি পেল, বিশ্ব জুড়ে পণ্যের বাজার বিস্তৃত হবার ক্ষেত্র তৈরি হলো, পুঁজি রপ্তানির চরিত্রেও এলো নির্ধারক পরিবর্তন। কারণ এ রকম পরিস্থিতিতে এক জাতিরাষ্ট্র থেকে অন্য জাতিরাষ্ট্রে পুঁজি চলে যাওয়াকে আর পুঁজি রপ্তানি না বলে বলা হলো আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির অভ্যন্তরীণ চলাচল। প্রচলন হলো বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে 'মুক্ত বাণিজ্য'।

ফলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর সময় পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রে, বাণিজ্যে এবং মুনাফায় খানিকটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

১৯৮০-র দশকে আবার এই প্রবণতা ঘাড় ভেঙ্গে পড়ল। শিল্প-বাণিজ্য-পুঁজির সঞ্চয়ন নিম্নগামী হলো। প্রয়োজন হয়ে পড়ল আরও বৃহত্তর মাত্রায় উৎপাদন এবং পুঁজির কেন্দ্রীভবন। সেখানে শেষ বাধা হিসাবে রয়ে গেছে বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখনো পর্যন্ত টিকে থাকা বেশ কিছু নিয়মকানুন আর বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিকে যদি টিকে থাকতে হয়, এ অসুবিধাগুলি তাকে অপসারণ করতেই হবে। এই অপসারণের কাজটিই সম্পন্ন করল "বিশ্বায়ন"। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডারা। একদিকে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির আরও সংগঠিত, সুসংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ কেন্দ্রীভবন, অন্য দিকে তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া আনুষ্ঠানিকতা ও 'আইনি' পদ্ধতির মারফত তৃতীয় বিশ্বের ওপর সীমাহীন লুণ্ঠন। আমাদের দেশও এই প্রক্রিয়ায় হয়ে উঠল বিশ্ব কর্পোরেট সাম্রাজ্যের এক ছোট শরিক, ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি বৃহৎ পুঁজির যৌথ লুণ্ঠনের এক সরস মৃগয়াক্ষেত্র।

গালভরা নাম 'সংস্কার' বা 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস'-এর আড়ালে শুরু হলো পুঁজির লাগাম-ছাড়া বেসরকারিকরণ আর অর্থনীতির উদারীকরণ। ভারতের নিজস্ব শিল্প এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পকে সুরক্ষা দেবার বদলে পুরনো সব নীতিপদ্ধতি বাতিল করা হলো। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অঢেল করা হলো, দেশের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারের গুরুত্ব বাড়ানো হলো, দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে রপ্তানি-নির্ভর করা হলো এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্থান করে নেবার জন্য নির্মম উপায়ে পণ্যের দাম কমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো। এই নির্মম উপায়গুলি হলো পুঁজিপতিদের জন্য দেদার কর ছাড়, আর শ্রমিকদের জন্য মজুরি হ্রাস, সংখ্যা কমিয়ে কাজের চাপ বাড়ানো, ক্রমবর্ধমান হারে স্থায়ী শ্রমিক কমিয়ে ক্যাজুয়াল শ্রমিক বাড়ানো, ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া। উল্টো দিকে ঐ একই উদ্দেশ্যে (পণ্যের দামকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক রাখা) জলের দামে সরকারি শিল্পগুলিকে দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বেচে দেওয়া। এইভাবে সৃষ্টি হলো জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ, আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোটি কোটি শ্রমিক ও খেতমজুর। এদের জীবন, জীবিকা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের জন্য দেশি-বিদেশি এই হাঙরগুলির কোনও মাথাব্যথা নেই। মুনাফার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বৃহৎপুঁজির এই দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য অভিযানের যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতের কোটি কোটি মানুষ তাই প্রাণরক্ষার তাগিদে আজ রুখে দাঁড়াচ্ছে। গত দু দশকে বিশ্বায়নের কালপর্বে স্বতঃস্ফূর্ত যে গণ-আন্দোলন ফুঁসে উঠছে এই হলো তার প্রেক্ষাপট।

দুই

বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলনের পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি এমনই সর্বগ্রাসী যে তা শুধু আমাদের দেশের উৎপাদনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকেই আক্রান্ত করে নি, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলিকে, পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্র অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনোদন ইত্যাদি সব কিছুকেই সাম্রাজ্যবাদী ও বৃহৎ পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা লুঠ করার উপযোগী করে ঢেলে সাজিয়েছে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সে কুক্ষিগত করেছে, দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পকে লোপাট করে দিচ্ছে। এই নিদারুণ ধ্বংসলীলাকে যাতে মানুষের কাছে সহনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করা যায়, যাতে প্রয়োজনীয় সহমত আদায় করা যায় তার জন্য আমাদের সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও জীবনশৈলীকে তার ছাঁচে গড়ে নিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে আজকের সময়ে বড় মালিক, বড় ব্যবসায়ী ও সরকার বিরোধী প্রতিটি সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিটি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই হচ্ছে মূলগতভাবে বিশ্বায়ন বিরোধী। বিশ্বায়ন তার ক্যাচ-ওয়ার্ড হিসেবে যে 'উন্নয়ন'-এর শ্লোগান উপস্থিত করছে অবধারিতভাবে তার অর্থ দেশি বিদেশি বৃহৎ পুঁজির চমকপ্রদ বৃদ্ধির আড়ালে নিষ্ঠুর শোষণ আর নির্যাতন। তাই তথাকথিত উন্নয়ন বিরোধী যে কোনও আন্দোলন আজ বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু বিশ্বায়ন বিরোধী সেই আন্দোলনগুলিই আমাদের কাছে তীব্রভাবে উপস্থিত হয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া মানুষকে শারীরিকভাবে আশু ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে, যেমন উচ্ছেদ বিরোধী বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বিরোধী আন্দোলন। এই ধরনের আন্দোলনগুলিই সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও নিদারুণ। তাই এগুলিই আজ হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক। তাই আমাদের আলোচনা এ ধরনের আন্দোলনগুলিতেই সীমাবদ্ধ রাখব।

আন্দোলনগুলির বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনের রূপ ও প্রকরণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম, আবার একই রাজ্যেই ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলনেও তার রূপভেদ দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি আন্দোলনেরই কতগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই এই আন্দোলনগুলির স্বতঃস্ফূর্ততা। এগুলির কোনোটিই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে বা তত্ত্বাবধানে শুরু হয় নি, (একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হতে পারে ছত্তিশগড়, যেটি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে)। আন্দোলন শুরু হবার পর নির্বাচনী সুফল প্রাপ্তির আশায় সকল বিরোধী দলই আন্দোলনের কোনও না কোন পর্যায়ে কোনও কোন মাত্রায় এই আন্দোলনে

যোগ দিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সে দলগুলি সবই ব্যতিক্রমহীনভাবে বিশ্বায়নের পক্ষের দল। যেখানে তারা ক্ষমতায় আছে যেখানে তারা যত্নের সঙ্গে নয়া উদারনৈতিক পলিসির প্রয়োগ ঘটিয়েছে, যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই সেখানে তারাই আবার বিশ্বায়ন বিরোধী। ভোটের স্বার্থে অবস্থান পাল্টে ফেলা ভারতে আজ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। স্বতঃস্ফূর্ততারই সহগামী অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দলমতনির্বিশেষে মেহনতি মানুষের দৃঢ় ঐক্য।

যে কোনও আন্দোলনে, যে কোনও ইস্যুতে মেহনতি মানুষের মধ্যে একটি বিভাজন ঘটাতে আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। যার ফলে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম একটা বড় পর্যায় জুড়েই আমাদের স্বপ্ন হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। সেই স্বপ্নের বাস্তবে রূপান্তর আমরা দেখলাম গত দু দশক জুড়ে একের পর এক বিশ্বায়ন বিরোধী লড়াইগুলিতে। একেবারে তৃণমূল স্তরে সংগ্রামী মানুষের অটুট ঐক্য শাসক শ্রেণীর পার্টিগুলিকে মহা বিপদে ফেলে দিয়েছে। লড়াইয়ের এলাকাগুলিতে জনসমর্থন টিকিয়ে রাখার বিষম তাগিদে এক দিকে তাকে লড়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে, অন্য দিকে তা করতে গিয়ে পার্টির ঘোষিত পলিসির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হচ্ছে। এই দুটি বিপরীত বিষয়কে মেলাতে গিয়ে প্রায়ই তাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। অসংখ্য মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংগ্রাম যখন নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই শুরু হয় এদের খেলা। ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নিজের নিজের দলের দিকে লোককে টেনে নিয়ে আসন্ন নির্বাচনের (যে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনও না কোনও নির্বাচন আসন্ন হয়ে ওঠে) বৈতরণী পার হবার চেষ্টায় মেতে ওঠে।

তৃতীয় যে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই আন্দোলনগুলি বহন করে চলেছে তা পুরোপুরি আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। আর তা হলো এগুলিতে প্রায় কোথাওই শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায় না, যেমন বিশেষ দেখা যায় না কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির নিবিড় আত্মনিয়োগ। এ কথা ঠিক যে উচ্ছেদবিরোধী লড়াইয়ের বেশিরভাগটাই গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত হওয়ার ফলে সেগুলিতে কৃষকদের অংশগ্রহণ প্রধান জায়গায় রয়েছে এবং সেখানে শ্রমিকদের স্বাভাবিক উপস্থিতি না থাকারই কথা। কিন্তু শহরের শ্রমিকরা ব্যাচে ব্যাচে এ আন্দোলনগুলির প্রতি সংহতি জানাতে দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেছেন এমন খবরও বিশেষ নেই। অথচ আমাদের দেশে যে কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ ক্রমশই বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারতে পুঁজিবাদের এক বিশেষ ধরনের বিকাশ এবং শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি এ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। ঠিক যে সময়টায় এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলি ঘটে চলেছে, সেই সময়টাতেই ভারতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে চলছে নিরবচ্ছিন্ন ভাটা (গুরগাঁওয়ের অটোমোবাইল শিল্পে লাগাতার সংগ্রাম ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবেই থেকে গেছে)। প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির, বিশেষত 'বামপন্থী' ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের দীর্ঘকালীন একটানা বিশ্বাসঘাতকতা সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। ভারতের কোণে কোণে এই শক্তিশালী গণ আন্দোলনগুলিতে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি এই আন্দোলনগুলির দুর্বলতা হিসাবেই দেখতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশই পারত দেশের মধ্যে ঘটে চলা তুমুল গণসংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, ক্ষেত্র বিশেষে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে। দেশের মধ্যে প্রকৃত কমিউনিস্ট শক্তির উপস্থিতি ও ক্রমবৃদ্ধিই এই কাজটি ঠিকভাবে করতে পারত। কিন্তু ঠিক এইখানেই বিগত কয়েক দশক ধরে ঘটে চলেছে চরম দুর্দশা। সংশোধনবাদী পার্টিগুলি এই বিশ্বায়নেরই অভিঘাতে পরিণত হয়েছে বুর্জোয়া পার্টিতে। বিশ্বায়ন বিরোধী লড়াই তো দূরের কথা, এই পার্টিগুলি যেখানেই ক্ষমতায় বসেছে সেখানেই তারা নয়া উদারনৈতিক পলিসি কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এ কথাটি উপলব্ধি করা আজ আর খুব কষ্টসাধ্য নয় যে, যে পার্টিগুলির এই পরিণতি ঘটতে পারে, তাদের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির শ্রমিক আন্দোলনে কী ভূমিকা থাকতে পারে। তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতা আর মালিক শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়ন চেতনাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই এদের হাত ধরে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটা সম্ভবপর নয়।

এর পরই আসে গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তিগুলির কথা। হয় তো আগামী দিনে এদের হাত ধরেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনীতিকরণ ঘটবে। কিন্তু যে সময়পর্ব ধরে আমরা কথা বলছি তার সবটা জুড়ে আজ পর্যন্ত এই শক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল, বিভক্ত, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে কিছুটা দিশাহীন, কিছুটা অসংহত। এদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশই আজও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজের গুরুত্ব যে আমাদের দেশে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছেন না। ফলে একদিকে যেমন অবহেলিত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার কাজ, অন্যদিকে কমিউনিস্ট শক্তিগুলির নিজেদেরকে সর্বহারাকরণের কাজ। ফলে আজ যে আমরা বিশ্বায়ন-বিরোধী বিরাট বিরাট গণ-জাগরণের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীকে দেখছি না তার দায়িত্ব কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেরই

নিতে হবে। অন্যদিকে এই আন্দোলনগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েও কিছু বিচার বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

সাধারণভাবে অভিজ্ঞতার দিকগুলি আলোচনার পর এই আন্দোলনগুলিতে বৈচিত্র্যের দিক নিয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আন্দোলনগুলির স্বতঃস্ফূর্ততা যদি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় তবে তার থেকে অনুসৃত হয় যে স্বতঃস্ফূর্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে বিচিত্রতায়। এই বিশাল দেশ ভারতের দিকে দিকে এই আন্দোলনগুলি ঘটে চলেছে। প্রতিটি আন্দোলনের ইস্যু আলাদা আলাদা, আক্রান্ত মানুষদের জাতিসত্তা, জাত (caste) ও জীবিকা পৃথক পৃথক, আঞ্চলিক ইতিহাস, ভাষা ও রীতিনীতিও ভিন্ন। সেই সঙ্গে আন্দোলনগুলির রূপও একে অপরের চেয়ে আলাদা। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সব থেকে চিত্তাকর্ষক দিক হচ্ছে মেহনতি মানুষের সৃজনশীলতা। বিশ্বায়ন হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্মসূচি। তাই এটি রূপায়ণের পক্ষের শক্তি অতিকায় ও ভয়ংকর— সাম্রাজ্যবাদ, দেশের বৃহৎ পুঁজি, দুর্দ্ধর্ষ রাষ্ট্রযন্ত্র, নির্দয় সরকার ও সরকারি পার্টি, তার পোষা গুন্ডা। তার বিপরীতে আক্রান্ত মানুষেরা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, নিরস্ত্র ও দুর্বল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই অসহায় মানুষগুলোই ঐ বিশাল প্রতিপক্ষকে দিনের পর দিন ঘোল খাইয়ে গেছে তাদের লৌহদৃঢ় ঐক্য এবং অসাধারণ সৃজনীশক্তির জোরে। মেহনতি মানুষের এই অনমনীয় মনোবল আর দৃঢ়সংকল্প সংগ্রামের মুখে বহু ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও সরকারকে পিছু হটতে হয়েছে। একটি কেন্দ্রীভূত শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ছাড়া, একটি নেতৃত্বদায়ী শ্রেণী ছাড়া, কোনও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া এই সব মানুষেরা যে পরাক্রম দেখিয়েছেন তা আগামী দিনে ভারতীয় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে ভরসা জাগায় এবং এই প্রতীতি গভীর হয় যে জনগণ, একমাত্র জনগণই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এই আন্দোলনগুলি কতটা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তা অবশ্যই একটি ভাবার বিষয়।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাওয়া এবং সস্তার শ্রমশক্তিকে নিঙড়ে নেওয়া বিশ্বায়নের কর্মসূচির দুটি মূল স্তম্ভ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আবার খনিজ সম্পদের ওপর সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি বৃহৎ পুঁজির লোভ সব চেয়ে বেশি। যেহেতু পাহাড়-জঙ্গলময় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায় তাই এই কর্মসূচিতে আমাদের দেশের আদিবাসীরাই বেশি আক্রান্ত। শ্রমশক্তির চূড়ান্ত শোষণের জন্য *সেজ* হচ্ছে বড় হাতিয়ার। তাই সমতলভূমিতে প্রচুর *সেজ* তৈরি করার প্রচেষ্টা হয়েছে। আবার পারমাণবিক চুল্লির জন্য সমুদ্রোপকূল অঞ্চলগুলিই সুবিধাজনক। এই সব অঞ্চলে তাই কৃষকদের সাথে সাথে জেলেরাও আক্রান্ত হয়েছেন।

আবার রাজনৈতিক পার্টিগুলির অংশগ্রহণের নিরিখেও এই আন্দোলনগুলিকে ভাগ করা যায়। আগেই উল্লেখ করেছি ছত্তিশগড়ের মাওবাদী কার্যকলাপের অঞ্চলটি বাদে সর্বত্রই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন আক্রান্ত মানুষেরাই। তাই শুরুটা সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত। তার পরের পর্যায়ে দেখা গেছে রাজনৈতিক পার্টিগুলির যোগদান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই যোগদান ঘটেছে কেবলমাত্র সংসদীয় শাসকশ্রেণীর পার্টিগুলির দ্বারাই। তাদের এই বিস্ময়কর আচরণের কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এরাই আবার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের ক্ষতিরও কারণ হয়েছে। আর একটি বর্গ হচ্ছে সেই সব আন্দোলনগুলি যেগুলিতে সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তিগুলিও তাদের সাধ্য অনুযায়ী অংশ গ্রহণের চেষ্টা করেছে। তৃতীয় বর্গটি হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে এককভাবে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তি এবং যেখানে অন্য কোন পার্টির আন্দোলনের পক্ষে কোনও ভূমিকা নেই। একটি বিষয় এখনই উল্লেখ করা ভালো যে সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এনজিও-দের ভূমিকা দেখতে পাওয়া গেছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা একধরনের আন্তরিকতা দেখিয়ে প্রায় সর্বত্রই আক্রান্তদের বিশ্বাসভাজন হয়ে নানারকম bargain-এর মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করে। আন্দোলন গড়ে তোলার পর্যায়ে এদের অবদান যেমন থাকে তেমনি আন্দোলনকে বদ্ধ জলায় ফেলে নষ্ট করে দেওয়ার ব্যাপারেও এরা যথেষ্ট দড়।

যেহেতু আন্দোলনের বিষয়ীগত ভূমিকার বিচার (বিশেষত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের) বর্তমান নিবন্ধে আমাদের লক্ষ্য তাই সেই নিরিখেই আমরা আন্দোলনের বর্গ বিভাগ করে এই ভূমিকাগুলি পর্যালোচনা করব। যেহেতু এই আন্দোলনগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ভূমিকা নেই, তাই প্রথমেই সেই আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়েই শুরু করব। যদিও এ কথা বলে নেওয়া উচিত যে এগুলিতে কোনও গোষ্ঠীর সংগঠিত উদ্যোগ না থাকলেও অনেক বিপ্লবী কমিউনিস্টই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগুলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর সেটাই স্বাভাবিক, কারণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি সেই গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করেছিল, আর তাই দীর্ঘকাল ধরে চলা বিশাল বিস্তৃত এই গণ-আন্দোলনগুলিতে একাধিক কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ একেবারেই প্রত্যাশিত, তা আমরা জানি বা না জানি।

তিন

উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন বিশ্বায়ন পর্বের বহু আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৮০-র দশক থেকে শুরু হওয়া নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সেই অর্থে বর্তমানের বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের

সব চেয়ে বড় এবং সংগঠিত পূর্বসূরী। কয়েক দশক ধরে চলমান এই আন্দোলন প্রচুর জয়-পরাজয় এবং উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও জারি রয়েছে। এর বিস্তার মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট থেকে একেবারে রাজস্থান পর্যন্ত। ৪৩,০০০ পরিবারকে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যার অধিকাংশ আদিবাসী। মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা আরও বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। ফলে আরও কয়েক হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হবেন।

২০১২ সালে মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া জেলার ওঙ্কারেশ্বর বাঁধের উচ্চতা কমাতে সরকারকে বাধ্য করে আন্দোলনকারীরা। তাঁরা 'জল সত্যাগ্রহ' নামে এক অভিনব পদ্ধতিতে জয় অর্জন করেন। একনাগাড়ে ১৭ দিন ৫১ জন আন্দোলনকারী প্লাবিত জমিতে গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকেন। জলের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে যখন তাদের নাকের কাছে পৌঁছায়, একমাত্র তখনই সরকার তাঁদের দাবি মেনে নেয়। একই রাজ্যের হরদা জেলার অধিবাসীরা এতটা ভাগ্যবান নন। তাঁরা ১৩ দিন 'জল সত্যাগ্রহ' করার পর তাঁদের মধ্যে ২৪৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ইন্দিরা সাগর বাঁধের উচ্চতা কমাবার জন্য আন্দোলনকারীরা কোনও জয় পাবার আগেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃত্ব আন্দোলন তুলে নেয় এবং আদালতে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যপ্রদেশের বাইলাডিলায় অতি উচ্চমানের লৌহ আকরিকের সন্ধান পায় জাতীয় খনিজ উন্নয়ন নিগম। মাত্র ১৬ কোটি টাকার বিনিময়ে সরকার মিত্তাল গোষ্ঠীকে ৮৯ শতাংশ শেয়ার বেচে দেয়। শুরু হয় শত সহস্র আদিবাসী উচ্ছেদ, হত্যা ও লুণ্ঠন— যা এর পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকে ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই সময়েই সরকার খনি বিষয়ক আইন সংশোধন করে নতুন আইন চালু করে, যার মূল কথা হলো মাটির নিচে যদি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় তবে আদিবাসীরা সেই জমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হবে। কিন্তু সর্বস্বান্ত মানুষ ব্যাপক প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরকার এবং মালিকের গুন্ডারা ১০০০ জন আদিবাসী আন্দোলনকারীর গৃহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়, ৭০০ নারী ধর্ষিতা হন। পুলিশ এ আন্দোলন দমনে ৮ বার গুলি চালিয়েছে, যাতে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের 'জল সত্যাগ্রহের' মতোই তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সংগঠিত 'সাগর সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের আর একটি নতুন রূপ উদ্ভাবন করে ভারতবাসীকে চমকে দিয়েছে। ফুকুশিমা বিপর্যয়ের খবর যখন হু হু করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন ইতিমধ্যে ১৫০০০ কোটি টাকায় রুশ প্রযুক্তিতে নির্মিত দুটি রিঅ্যাক্টরের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ডিএমকে তখন দিল্লীতে ইউপিএ সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও যথারীতি এই প্রোজেক্টের বিরোধিতায় নামে। সিপিএম এই প্ল্যান্ট তুলে দেবার বদলে সুরক্ষা বন্দোবস্তের ওপর জোর দেয়। তুলে দেবার বিরুদ্ধে তার যুক্তি হলো প্রথমত এটি ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি হবার আগেই কেনা হয়ে গিয়েছিল, আর দ্বিতীয়ত সরকারের কোষাগার থেকে ১৫০০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচা হয়ে গেছে। বিজেপি আবার এ আন্দোলনের পেছনে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত দেখতে পেয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সরকারি ও সংসদীয় দলগুলির মধ্যে যখন এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে নানা টানাপোড়েন চলছে তখন 'সাগর সত্যাগ্রহীরা' অপরিসীম সাহস ও সংকল্পে ভর করে সাগরের বেলাভূমিকেই যাত্রাপথ বানিয়ে হাজারে হাজারে প্লান্টের দিকে রওনা হন। তারা প্লান্টকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখেন যাতে জ্বালানি সরবরাহ না করা যায়। ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশবাহিনী স্থলভাগের দিককে ঘিরে ফেলে। একদিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, অন্য দিকে সমুদ্র। এমন সময় শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস। পালাবার জন্য সমুদ্র ছাড়া কোনও জায়গা নেই। এরকম অবস্থায় পড়ে শুরু হয় 'সাগর সত্যাগ্রহ'। প্রথমে সমুদ্রের জলে, পরে বেলাভূমির বালিরাশির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে অবস্থান চালানো। আন্দোলনের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে, নৌকা সংগ্রহ করে সাগর পথে তাদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়। আন্দোলনের এই অভিনব পন্থা শুধু ভারতবাসী নয়, বিশ্বকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কাঁথি মহকুমার হরিপুরে ভারতের সর্ববৃহৎ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন মনমোহন-বুদ্ধ জোট প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল। কিন্তু হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রবল প্রতিরোধে তা আটকে দেয়। ১০০০ হেক্টর জমিতে বসবাসকারী কৃষক ও মৎস্যজীবীর উচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপদ সম্পর্কে গ্রামবাসী দ্রুত ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন এবং পরমাণু শক্তি দপ্তরের তদন্তকারী টিমকে এলাকায় ঢুকতেই দেন না। এমনকি প্রশাসনের কোনও লোকই যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য হরিপুরে পৌঁছাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'পরমাণু চুল্লি বিরোধী ও ভিটেমাটি জীবনজীবিকা বাঁচাও কমিটি'-র নেতৃত্বে এলাকার সমস্ত কৃষক, মৎস্যজীবী, নানা ধরনের সংগঠন এবং সরকারি দল ছাড়া সব বিরোধী দল একজোট হয়ে এমন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে যে সরকার আর এগোবার সাহস পায় না।

মহারাষ্ট্রের জয়িতাপুর এবং হরিয়ানার গোরখপুরেও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে যে বিপুল গণ-আন্দোলন ফেটে পড়েছিল সেগুলিতেও আন্দোলনের রূপ নিয়ে

বহু বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। জয়িতাপুরে প্লান্টটি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে সবুজে ঘেরা এবং জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ কোঙ্কন অঞ্চলে। মৎস্য উৎপাদনেও এলাকাটি সমৃদ্ধ। এমন চমৎকার পরিবেশবান্ধব অঞ্চলটিকে নিউক্লিয়ার চুল্লির সাহায্যে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানুষ এককাট্টা হয়েছেন এবং সরকারের দমন যখন যেমন হিংস্রতা অবলম্বন করেছে তখন সেই মতো আন্দোলনের রূপ পাল্টাতে পাল্টাতে গেছে। আন্দোলনের শুরুতে যখন বলপূর্বক জমি দখলে নামে সরকার তখনকার স্বতঃস্ফূর্ত গণ প্রতিরোধে পুলিশের আক্রমণে দুজন আন্দোলনকারী নিহত হন। এর পরই আন্দোলনের জনভিত্তি প্রসারিত হতে থাকে। তখন আন্দোলনের রূপ হয়ে ওঠে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষ আন্দোলনের পাশে সমাবেশিত হতে থাকেন। এই আন্দোলনের এক নতুন রূপ হচ্ছে তারাপুর পারমাণবিক কেন্দ্র দ্বারা আক্রান্ত মানুষদের জয়িতাপুরে নিয়ে এসে তাদের দিয়ে এ ধরনের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র জীবন-জীবিকার কী ক্ষতি করে তা সভা করে এবং জনে জনে বোঝানোর কর্মসূচি গ্রহণ। যে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, তারাই আবার জয়িতাপুরে এর বিরোধিতায় যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছে। জয়িতাপুর প্রকল্পটি যেমনই বিশাল তেমনি তার প্রতিরোধেও নেমেছে বিপুল শক্তি— সরকার বিরোধী প্রায় সব দল, তাদের সমস্ত গণ-সংগঠন, অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ থেকে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পর্যন্ত।

আর গোরখপুরে 'দেশীয়' পারমাণবিক চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় ২০১০ সালে। রাজধানী দিল্লী থেকে মাত্র ১৪০ কিমি দূরত্বে হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ১৫০০ একর তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণ চলছে। কৃষকেরা প্রথমে ভেবেছিলেন এই প্রকল্পের সুবাদের তাঁরা জমির এক বিশাল দাম পাবেন। কিন্তু পরে যখন বোঝা গেল সরকার অতটা দাম দিতে রাজি নয় তখন কৃষকরা 'কিষাণ সংঘর্ষ সমিতি' গড়ে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এখানে আন্দোলনের রূপ আবার অন্য। ২০১০ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ফতেহাবাদের সরকারি অফিসের সামনে বছরের পর বছর একটানা চলেছে অবস্থান এবং একটি দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরমাণু চুল্লির বিপদ সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে থাকে। মহিলাদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। ফুকুশিমা ঘটে যাবার পর প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়। ইতিমধ্যে খোলা জায়গায় ধরনা দিতে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপাকে পড়ে তখনকার কংগ্রেস সরকার ক্ষতিপূরণের টাকা ভালরকম বাড়িয়ে দেয়। তাতে কিছু কৃষক বড় পরিমাণ টাকার লোভ সংবরণ করতে পারে না, কিন্তু একটি অংশ টাকা নিতে অস্বীকার করে। এ ক্ষেত্রেও সিপিএম, ভারতীয় জাতীয় লোকদল সহ সব সরকার বিরোধী দল আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের মূল অংশ 'কিষাণ সংঘর্ষ সমিতির' পতাকার নিচে আন্দোলনকে আরো সম্প্রসারিত করে এলাকা বাঁচাও আন্দোলনের রূপ দিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের সোমপেটায় আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে কৃষিজমি ও জঙ্গল দখল করতে পুলিশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রতিরোধ আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। এখানে আন্দোলনকারীদের উপর দু দফায় গুলি চলে এবং ৫ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হন। পুলিশ বৎসারাধিক কাল এলাকাটিকে কর্ডন করে রাখে এবং এমনকি মানবাধিকার কমিশনকেও ঢুকতে দেয় না।

চার

এবার আমরা আসবো ভারতের বৃহত্তম *সেজ*-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথায়। এটি মুকেশ আম্বানির রিলায়ান্স কোম্পানির ১৪০০০ হেক্টরের রায়গড় *সেজ*। শিল্প ছাড়া আর সব রকমের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এখানে চলার কথা। দ্রুত মুনাফা লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে আম্বানি গোষ্ঠী এ অঞ্চল বেছে নিয়েছিল। কোঙ্কন অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চাল উৎপাদন কেন্দ্রটিকে পতিত জমি দেখিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথের সঙ্গে যোগসাজসে মুকেশ আম্বানি সমুদ্র উপকূলবর্তী এই সজল সবুজ এলাকাটিকে ছারখার করার জন্য জমি দখলের কাজে নামে। এ কাজে বর্বর পুলিশি অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয় আম্বানিদের পাটোয়ারি বুদ্ধি। গ্রামের বেকার লুম্পেনদের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মাসে মাসে টাকা দেওয়া, গ্রামবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেওয়া, বাইরে থেকে আসা সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষকদের ভয় দেখানো থেকে শুরু করে গণেশের মূর্তি বিনা পয়সায় বিলোনো পর্যন্ত। গ্রামের মানুষ এসব প্রত্যাখ্যান করে জোটবদ্ধ থেকেছেন। ২০০৭-এর ২১ সেপ্টেম্বর কোঙ্কন ভবন অভিযানে ৫০ হাজার কৃষক অংশগ্রহণ করেন। দেশের সর্ববৃহৎ *সেজ*-এর বিরুদ্ধে, সর্ববৃহৎ কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে রায়গড়ের লড়াই দীর্ঘদিন অবধি *সেজ* বিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে থাকবে। এ লড়াই-এর একটি দুর্বলতার দিক ছিল এই যে, এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, একদিকে সিপিএম অন্যদিকে এনএপিএম যারা আন্দোলনটিকে মোলায়েম করার চেষ্টা চালিয়েছে একে সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষির রাস্তায় ঢুকিয়ে দিয়ে। কিন্তু এই অপচেষ্টা সফল হয় নি। জল-জমি-জঙ্গল রক্ষায় দৃঢ়পণ হাজার হাজার কৃষকের অনমনীয় প্রতিরোধের মুখে এ প্রকল্প তুলে নিতে সরকার বাধ্য হয়।

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের আর এক মরণজয়ী ইতিহাস গড়েছে উড়িষ্যার কলিঙ্গনগর। ১৯৯০-এর দশকেই এই অঞ্চলে

একটি বড় শিল্পতালুক গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও ঐ দশকটি ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ। ছিল ক্ষতিপূরণের আশ্বাস, চাকরির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অবস্থাটা ঘোরালো হতে শুরু করলো ২০০০ সালের শুরু থেকে, যখন ইস্পাতশিল্প-কেন্দ্রিক ১২ টি সংস্থা একযোগে কাজ শুরু করার জন্য এগিয়ে এলো এবং জমি দখল শুরু হলো। এবার কৃষকদের কাছে স্পষ্ট হলো, ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ যৎসামান্য। বেশিরভাগ মানুষ চাকরি পেলো না। পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ১০ ডেসিমাল জমিও দেওয়া হলো না। উল্টে যেহেতু কৃষকেরা চাকরির দাবিতে অনড় ছিল তাদের বর্তমান বাসস্থানকেও ধ্বংস করে দেওয়া হলো। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। তৈরি হলো "বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ"। ২০০৫ সাল নাগাদ জনমঞ্চের সক্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো এবং টাটা সহ অবশ্য যে কোম্পানিগুলি জমি সংক্রান্ত নির্মাণ কাজ শুরু করতে এলো তাদের সকলকে ফিরিয়ে দিল 'জনমঞ্চ'। এবার তার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। ২০০৫ সালে কলিঙ্গনগর শিল্পতালুকে মহারাষ্ট্র সীমলেস কোম্পানির ভূমিপুজোয় বাধা দিতে গেলে দু'জন শিশু সহ চার জন প্রায় হারায়। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে ২০০৬-এর জানুয়ারিতে, যখন টাটা কোম্পানির ভূমিপুজোয় বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৬ জন প্রতিবাদী। শুধু কলিঙ্গনগর কেন! গোটা উড়িষ্যা জুড়ে ২০০০-এর দশকে চলে জমি দখলের অভিযান আর তার বিরুদ্ধে অসমসাহসী মানুষের অসম প্রতিরোধ। নিয়মগিরির বেদান্ত-র এ্যালুমিনিয়াম খনি ও কারখানার জন্য ভূমি গ্রাসের বিরুদ্ধে "নিয়মগিরি সুরক্ষা অধিকার" সম্বলপুরে মিত্তালদের কারখানা স্থাপনার বিরুদ্ধে, কোরাপুটে হিন্দালকো-র খনির বিরুদ্ধে— সর্বত্রই গড়ে ওঠে অসহায় মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধ। কখনো তা হয়ে ওঠে হিংসাত্মক, যেমন ঢেংকানলে ভূষণ স্টিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কোম্পানির পোষা গুন্ডারা গুলি চালিয়ে দেয়। উড়িষ্যার খনিজ-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ লড়াকু আদিবাসী। তাই আক্রমণ ও প্রতিরোধ— দুই-ই এখানে তীব্র। উল্লেখ্য কলিঙ্গনগরের লড়াইতে অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও কিছু কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

এবার আমাদের রাজ্যের দিকে তাকানো যাক। এখানে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত সিঙ্গুরে হলেও ঘটনার তীব্রতা, সরকারী আক্রমণ ও জনগণের প্রতিরোধ— এ দুটিরই উচ্চতায় সিঙ্গুরকে ছাপিয়ে নন্দীগ্রাম চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পর আন্দোলনের পক্ষে শহুরে মধ্যবিত্তদের প্রায় সকল অংশের মধ্যে এত আলোড়নও আগে কখনো চোখে পড়ে নি। প্রকৃতপক্ষে নন্দীগ্রামেই সিপিএম-এর সমাধি রচিত হয়ে গিয়েছিল। সালেম গোষ্ঠীর জন্য কেমিক্যাল হাব বানানোর উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের সরকার নন্দীগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষকদের জমি দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় জমি দেবে না। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সমগ্র এলাকাটি রাজনৈতিকভাবে সিপিএম-এর দখলে ছিলো। অথচ অতি দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং সরকারি পার্টির রক্তচক্ষুকে নস্যাৎ করে গড়ে উঠলো "ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি"। বিপন্ন মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন কী অসম্ভব শক্তির স্ফূরণ হয় আমরা নন্দীগ্রামের লড়াই-এ তা প্রত্যক্ষ করলাম। আমরা এও দেখলাম কীভাবে ইস্যুটা যখন মরণবাঁচনের, তখন সিপিএম-এর মতো শক্তপোক্ত পার্টির নীচের তলার অসংখ্য কর্মী মুহূর্তের মধ্যে পার্টির নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্দোলনের প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর মানুষের দুর্জয় মনোবল আর সহনশীলতা ঐ সামান্য ক'দিনের সংগ্রামের মধ্যেই কীভাবে এক মহাকাব্য রচনা করলো তাও আমরা সাক্ষাৎ দেখলাম। মানুষের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য, তাদের ভয় দেখিয়ে কাবু করার জন্য যত রকম হাতিয়ার আছে তার সব ক'টিই সিপিএম প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মানুষ তার সবকিছুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজ বিরোধী '৪২-এর লড়াই-এর ঐতিহ্যবাহী রাস্তা কাটা আর তেভাগার ঐতিহ্যবাহী শাঁখ বাজিয়ে সতর্ক করা এ আন্দোলনে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। শেখ মালিক এবং বিশ্বজিৎ-এর শহিদের মৃত্যুতে উদ্বুদ্ধ মানুষকে ১৪ই মার্চ ভয় দেখাতে পারে নি। বরং আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। সিপিএম-এর নানা কূটকৌশল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। নন্দীগ্রামের আন্দোলন প্রায় একটি চিরায়ত আন্দোলনের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলো, যাতে জামাত বা তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের কিছু ভূমিকা থাকলেও জেগে ওঠা মানুষের ভয়ংকর শক্তিই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছিল।

পাঁচ

কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তিগুলির সংগঠিত উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে এমন কয়েকটি বিশ্বায়ন বিরোধী গণসংগ্রাম নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন। কোনও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব বা কোনও রাজনৈতিক দলের পরামর্শ ছাড়াই সিঙ্গুরের কৃষক সিদ্ধান্ত নেয় যে মোটর গাড়ির কারখানার জন্য তারা টাটাদের হাতে অত্যন্ত উর্বর তিন ফসলি জমি তুলে দেবে না। মাঝারি, ছোট, প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে ভূমিহীন খেতমজুর ও বর্গাদার— বহু মানুষের রুটি রুজি এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে এটা এলাকার মানুষ মেনে নিতে পারছিলেন না। চাকরির কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, যে সামান্য ক্ষতিপূরণ সরকার দেবে তা দিয়ে অন্য কোথাও চাষের জমিও কেনা যাবে না। তাই জমি তাদের রক্ষা করতেই হবে। আর

সিপিএম পরিচালিত সরকারকে জমি নিতেই হবে। কারণ রাজ্যে শিল্প গড়ার প্রতিযোগিতায় সে ইতিমধ্যেই নেমে গেছে। বিশ্বায়ন "উন্নয়ন"-এক ছক এঁকে দিয়েছে। তাকে সে পথে হাঁটতেই হবে। ১৯৯৪ সালে জ্যোতি বসুর নয়া আর্থিক নীতিই এ ছকের উৎস, মোটেই বুদ্ধদেবের অবিমৃষ্যকারী কোন পরিকল্পনা নয়। দু পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। এক পক্ষ রাষ্ট্রশক্তি ও আধা-লুম্পেন ক্যাডার বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত, অন্য পক্ষের পুঁজি কেবল অপরিসীম সাহস এবং কৃষকের ঐক্যবদ্ধতা। প্রথমে পুলিশি নিপীড়নে রাজকুমার ভুলের মৃত্যুবরণ, তার পরই সেই ভয়ঙ্কর ১ ডিসেম্বর যখন অভূতপূর্ব সন্ত্রাস নামিয়ে, বহু মানুষকে আহত ও গ্রেপ্তার করে সরকার জমি অধিগ্রহণ করলো। এরপর একাদিক্রমে চললো মমতার অনশন, এপিডিআর-এর তদন্ত, সই সংগ্রহ, গণশুনানি, আদালতে অনিচ্ছুক কৃষকদের হলফনামা পেশ, তাপসী মালিকের হত্যা। কোনও অবস্থাতেই আন্দোলনে ভাটা পড়েনি।

তিনটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল সিদ্ধান্ত নিয়ে এ আন্দোলনে অংশ নেয়। তৃণমূলের সঙ্গে একসাথে গণ-আন্দোলন করা নিয়ে শিবিরে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। সিপিএম-এর দিকে ঝোঁকা বিপ্লবীরা অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে থাকে। অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ আবার তৃণমূলের সঙ্গে একেবারে মিশে যায় নিজেদের মূল রাজনৈতিক পরিচয়কে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে। এই অংশের নেতৃবর্গ পরে তৃণমূল দলটিরই নেতা হয়ে যায় এবং মমতার মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়ে জীবন সার্থক করে। অপর একটি গোষ্ঠী খুবই হাল্কা ভাবে ধারাবাহিকভাবে এ আন্দোলনে থাকে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে মমতার সঙ্গে অনশনে অংশ নেয়। তারা প্রায় একক প্রচেষ্টায় হলফনামা তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে এলাকায় পুনঃপ্রবেশ করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা কৃষকদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে। যেটা সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কৃষি জমি রক্ষা কমিটি-কে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেখানে আন্দোলন নেই বা এমনকি আন্দোলনের কোনো সম্ভাবনাও নেই সেই সব জায়গাতেও (প্রতি জেলাতে) ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখনই এই গোষ্ঠীটি মমতার এই উদ্যোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, কারণ এটি তখন একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে তৃণমূল আন্দোলনের সুফলটিকে নির্বাচনী সাফল্যের জন্য কাজে লাগাবে। শেষোক্ত গোষ্ঠীটির অবস্থানটিকে সঠিক বলে মনে হয় কারণ তারা আন্দোলন থেকে দূরে যাবার নিষ্ক্রিয়তার লাইনটি বর্জন করতে পেরেছিল, যেমন পেরেছিল তৃণমূলের কাছে আত্মসমর্পণের লাইনটিও প্রতিহত করতে।

উড়িষ্যার পসকো এবং কলকাতার উপকণ্ঠে নোনাডাঙ্গার আন্দোলনেও এই গোষ্ঠীটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ২০০৫ সালে উড়িষ্যা সরকার দক্ষিণ করিয়ার বহুজাতিক দৈত্যাকার সংস্থা পসকো-র সঙ্গে ৫১০০০ কোটি টাকার মউ সই করে। তখন থেকেই শুরু হয় এলাকায় বসবাসকারী কৃষক ও পানচাষিদের মধ্যে প্রতিরোধের প্রস্তুতি। পরিবেশ ও অন্যান্য ছাড়পত্র পেতে প্রচুর টালবাহানা চলতে থাকায় জমি দখলের কাজটা ব্যাহত হতে থাকে। পরিশেষে ২০১১-র মে মাসে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ পসকো-কে ১২৫৩ হেক্টর কৃষিজমি ও বনভূমি দখল করার অনুমতি দেয়। ঢিনকিয়া ও গোবিন্দপুরের "বনাধিকার কমিটি" দ্রুত সাধারণ সভা আহ্বান করে প্রতিরোধের আহ্বান করে। অন্য দিকে "পসকো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি"ও তার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো যে সমিতির সভাপতি অভয় সাহু সিপিআই-এর সদস্য। শ্রী সাহু একটা স্তর পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের আস্থাভাজন হলেও আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান নড়বড়ে। তার ছাপ আন্দোলনের উপরও পড়তে থাকে। ফলে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এলাকা দখল রাখার জন্য ২৪ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে যেভাবে পুরুষ নারীর সমান অংশগ্রহণ একটা চমৎকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছিল তা ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে। পূর্বে উল্লেখিত কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীটিকে অভয় সাহু তাঁর নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের নিঃশব্দে সরিয়ে দেবার চেষ্টা তখনই শুরু করলেন যখন দেখা গেল এলাকার মানুষের সঙ্গে তাদের একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সম্পর্ক গড়ে উঠছে। অথচ এই কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হয়েছে, রাত পাহারায় অংশ গ্রহণ করেছে, সংঘর্ষে আহতও হয়েছে। একটা সময় তাঁরা আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। আবার এটাও একই সঙ্গে সত্য যে এই গোষ্ঠীটির শক্তি এবং সাধ্য এতই সীমিত ছিল যে এলাকার নেতৃত্বকে ছাপিয়ে গিয়ে মানুষের আস্থাভাবন হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। পসকো-র আন্দোলন এখন দুর্বলভাবে টিকে আছে। শত সহস্র মানুষের ত্যাগ স্বীকার আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিণতি কী হবে তা বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে।

উপরোক্ত গোষ্ঠীটি আরও কয়েকটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠে নোনাডাঙ্গায় একটি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। গুনতির হিসেবে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম, আন্দোলনের এলাকা সংকীর্ণ, কিন্তু সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে তীব্রতায় এ আন্দোলন ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে এবং

আন্দোলনকারীরা অটল সংকল্প নিয়ে নানা আঁকবাঁক পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে বস্তি উচ্ছেদ ঠেকাতে পেরেছে তা সমাজের নজর কেড়েছে। এ আন্দোলন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছিল আরও এই কারণে যে এখানে আন্দোলনের প্রতিপক্ষ এমন একজন যিনি উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন করেই সদ্য ক্ষমতায় এসেছেন অথচ ক্ষমতায় আসীন হয়েই চরম হিংস্রতায় দুঃস্থতম, দরিদ্রতম প্রান্তিক মানুষদের বাসস্থান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে ধনীতমদের জন্য বিলাসবহুল 'মল' এবং বিনোদন কেন্দ্র গড়ার জন্য সেই জায়গাটি উপঢৌকন দিচ্ছিলেন। যাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ৩০ মার্চ ২০১২-র মধ্যে জমি তাদের কাছে হস্তান্তরিত করবে। ঠিক সেই ৩০শে মার্চের কালো দিনটিতেই মজদুর পল্লী আর শ্রমিক কলোনির ২০০টি পরিবারের ঘরে আগুন ধরিয়ে মাঠ ফাঁকা করে দেওয়া হয়। নোনাডাঙ্গার বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির তৎপরতা আগে থেকেই ছিল। তাই ৩০শে মার্চের পরে যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয় তাতে ঘরহারা মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া থাকলেও সচেতন প্রচেষ্টার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই "উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি" গড়ে তোলা, ১২ দিন ধরে লাগাতার অনশন, ভেঙ্গে ফেলা ঘরগুলির পুনর্গঠন, প্রতিবাদ মিছিল, ধর্না এবং পুনর্বাসনের দাবিকে সজোরে উপস্থিত করা— সব বিষয়েই স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এক চমৎকার রসায়ন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। এ আন্দোলন মমতার সরকারকে এমন অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল যে তাঁকে ঘোষণা করতে হলো তিনি কোথাও কোনো বস্তি উচ্ছেদ করবেন না এবং রাতারাতি সরকারি বিজ্ঞাপন টাঙানো হলো যে ওখানে গরিবদের জন্য আবাসন হবে। সরকার পক্ষের এটাই শেষ কথা তা ভাবার কোনও কারণ নেই। ভবিষ্যতে আরও কী কী ঘটবে তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু এক অতি বৃহৎ শক্তির বাহুবল এবং কূটকৌশলকে মোকাবেলা করে কী করে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তার এক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির সাথে সাথে এলাকাবাসীরও অর্জিত হলো।

ছয়

পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের আন্দোলনেও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর (সিপিআই-মাওবাদী) বিশেষ ভূমিকা বেশ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে (ভারতেও) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এখন আর তা নেই, নতুনভাবে গড়ে ওঠার কোন আশু সম্ভাবনাও নেই। কেন এমন হলো তা বুঝতে গেলে, এবং এরই সাথে এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের পরিচালক গোষ্ঠীর রাজনীতিটি বুঝতে গেলেও এ নিয়ে আলোচনা জরুরি। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই আন্দোলনটি প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বায়নবিরোধী কোনও আন্দোলন নয়; কিন্তু এটির জন্ম ও বিকাশ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অভিঘাতেই এ আন্দোলনের সৃষ্টি। এ আন্দোলনকে দেশের মানুষ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধারাবাহিকতা হিসাবেই দেখেছে। তাই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের যে জনজাগরণ তার অন্তিম অংশটি কেন এত করুণভাবে শেষ হলো, তা আমাদের বিচারে থাকা উচিত।

২০০৮-এর নভেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে বিস্ফোরণ হয় মেদিনীপুরের লালগড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে। ৫ নভেম্বর ভোররাত্রি থেকে শুরু হয় এমন এক পুলিশি অভিযান যা ১৯৭০-এর দশকের পরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেনি। ৮৫ ঘর আদিবাসী অধ্যুসিত ছোট পেলিয়া গ্রাম পুলিশ ঘিরে ফেলে নির্বিচার গ্রেপ্তার শুরু করে। ঘর ছেড়ে গ্রামের প্রায় সকল নারী বেরিয়ে এসে পুলিশকে ঘিরে ধরে। পুলিশ নিরস্ত্র নারীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং ছিতামনি মুর্মুর একটি চোখ বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে নষ্ট হয়। নারী নির্যাতনের এই ঘটনায় আদিবাসী সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দলিশপুর চকের সভায় সিদ্ধান্ত হয় রাস্তায় গাছ ফেলে পুলিশের গ্রামে আসা বন্ধ করতে হবে। তার ঠিক পরের দিন ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়ে লালগড় থানায় বিক্ষোভ দেখায়। শুরু হলো পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠা লালগড় আন্দোলন। একটি গ্রামের মানুষের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে গোটা আদিবাসী সমাজ, সমগ্র জঙ্গল মহল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, নিপীড়ন আর অবদমনের বিরুদ্ধে এক তুমুল জনজাগরণ শুরু হলো। ৮ই নভেম্বর তৈরি হলো "পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি", কোনও রাজনৈতিক পার্টির হস্তক্ষেপ ছাড়া, একেবারেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে জঙ্গলমহলের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও, বিশেষত, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানে। আদিবাসী ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও (বিশেষত কুর্মীরা) এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের মূল রূপ হিসেবে স্থিরীকৃত হয় জন-জমায়েত, গণ-অবরোধ ও গণ-বয়কট। আন্দোলনের দাবিগুলিও আমাদের চেনা ছকের সঙ্গে মেলে না। প্রধান দাবি : ছোট পেলিয়ায় এসে অত্যাচারিত মহিলাদের কাছে এসপি-কে ক্ষমা চাইতে হবে। যার অর্থই হচ্ছে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বাহিনী একযোগে আক্রমণ নামিয়ে আনে। কিন্তু প্রবল গণ-প্রতিরোধের মুখে রাষ্ট্রীয় বাহিনী একের পর এক এলাকা থেকে সরে যেতে থাকে। একটা সময়ের জন্য জঙ্গলমহলে কার্যত মুক্তাঞ্চলে পরিণত হলো।

ঠিক এরকম একটা সময়ে মাওবাদী পার্টি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এ কথা ঠিক যে মাওবাদী নামক

পার্টিটির জন্মের অনেক আগে থেকেই সেই পার্টিরই অন্যতম অংশীদার "পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ" এখানে কাজ শুরু করেছিল। লালগড়ের বিশাল জন-জাগরণ তাদের হাতে তুলে দিল চমৎকার এক অনুকুল পরিস্থিতি। শুরু হলো সিপিআই(মাওবাদী) পার্টির লাইনের সুচারু প্রয়োগ। "গণআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠা এবং একটা সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছানোর পর.... একে গেরিলা অঞ্চলে পরিণত করতে হবে, নতুবা তা টিকবে না। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণের রূপে প্রতিরোধ বেড়ে উঠবে... যা গোটা পরিস্থিতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসবে।" রাজনীতি ও রণকৌশল (সিপিআই মাওবাদী)। পার্টি-লাইনের প্রতি ১০০ ভাগ অনুগত কিষাণজি ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন কী এসেছিল সেটাই দেখার! "পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি" তৈরি হলে মাওবাদী দল প্রথম থেকেই তাকে সমর্থন দেয়। এরপর কমিটিকে পার্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চলে পরিকল্পিত কাজ। মাওবাদীদের উপস্থিতি "কমিটির" কার্যকলাপে যত বেশি প্রকট হতে থাকে, অন্যান্য সমর্থনকারী শক্তিগুলি তত পিছু হটতে থাকে। একটা সময় মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। আর তখন থেকেই আন্দোলনের অভিমুখ পাল্টাতে থাকে। রণনীতি রণকৌশলে বিধৃত নির্দেশ অনুসারে গণ-জমায়েত পিছন সারিতে চলে যায়, সামনের সারিতে আবির্ভূত হয় সশস্ত্র কার্যকলাপ, অর্থাৎ গেরিলা অ্যাকশন, যার প্রধান রূপ খতম এবং পুলিশ পোস্টগুলি অক্রমণ। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যাঘাত হানার "যুক্তিপূর্ণ" ভিত্তি তৈরি হলো, যা এর আগের পর্যায়ে ছিল না বলেই সে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। এবার রাষ্ট্র একের পর এক এলাকায় নতুন করে ঢুকতে শুরু করলো বাধাহীনভাবে। আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল, পরিশেষে স্তব্ধ হলো। এক বিরাট সম্ভাবনাময়, ক্রমবিকাশমান গণ-আন্দোলন মাওবাদী পার্টির রাজনৈতিক লাইনের কপিবুক প্রয়োগের দ্বারা বলিপ্রদত্ত হলো। মাওবাদীদের একটি ভ্রান্ত উপাত্ত— ভারতে চলছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব, তাই যে কোন গণ-সংগ্রামকে স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবেই সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত করতে হবে— হচ্ছে সকল সর্বনাশের উৎস।

ছত্রিশগড়ের বিশ্বায়ন-বিরোধী লড়াই মাওবাদী পার্টিরই সৌজন্যে সম্ভবত সবচেয়ে জোরদার— গণ-জমায়েতের নিরিখে না হলেও সশস্ত্র প্রতিরোধের নিরিখে তো বটেই। এ অঞ্চলে (উড়িষ্যা বা ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা সহ) বিশ্বায়ন বিরোধী লড়াই আমরা পাচ্ছি বা পেয়ে যাচ্ছি মাওবাদী পার্টিটির ঘাঁটি এলাকা গড়ার সংগ্রামের পার্শ্বফল হিসেবে। কিন্তু সারের বিচারে একেও আমরা বিশ্বায়ন বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসেবেই দেখবো। ভারতের আকরিক লোহার ২৩ শতাংশ এবং প্রচুর কয়লার উৎস হচ্ছে ছত্রিশগড়। টাটা স্টিল এবং আর্সেলর মিত্তল সহ দেশি-বিদেশি কয়েক ডজন বৃহৎ পুঁজির মালিক ছত্রিশগড় সরকারেরর সঙ্গে কোটি কোটি টাকার মউ সই করে রেখেছে। কিন্তু মাওবাদী পার্টির দাপটে বেশিরভাগ প্রজেক্টই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বিবৃতি দিয়ে বলেন, "যে সব স্থানে খনিজ পদার্থের প্রাকৃতিক উৎস আছে, সেইসব স্থানে যদি উগ্র বামপন্থার বিকাশ ঘটে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হবে।" প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা অমূলক নয়, কারণ মাওবাদীদের উপস্থিতির কারণে অনেক জায়গায় মানুষকে উচ্ছেদ করে বৃহৎ পুঁজি তার প্রস্তাবিত কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারছে না। এটিকে আমরা নিশ্চিতভাবেই জনগণের সংগ্রামের জয় হিসেবেই চিহ্নিত করবো এবং তার জন্য কৃতিত্ব অবশ্যই মাওবাদীদের প্রাপ্য। কিন্তু একই সাথে এ উদ্বেগ প্রকাশ না করেও পারছি না যে মাওবাদীরা যদি ভারতের অর্থনীতি-রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন করে তাঁদের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন না করেন তবে আজ হোক বা কাল হোক এক বড় ধাক্কা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। ভারতে পুঁজিবাদের (বিকৃত) বিকাশ তাঁদের বুঝতেই হবে, একটা সময় পর্যন্ত যে-গণসংগ্রাম আন্দোলনের প্রধান রূপ হিসেবে থাকবে তা তাদের স্বীকার করতেই হবে, আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজের গুরুত্ব এবং ভারতীয় বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর কার্যকর নেতৃত্বের (কাগজে কলমে নয়) প্রশ্নটিকে অনুধাবন করতেই হবে।

সাত

পরিশেষে ভারতে গত দু দশক জুড়ে চলতে থাকা এই বিশাল বিশাল গণ-আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা নিয়ে দু-একটি কথা বলা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে সংসদীয় বামেদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ তারা যখন যেখানে ক্ষমতা হাতে পেয়েছে সেখানেই নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক প্রয়োগ ঘটিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে বুদ্ধদেবের ভূমিকার মধ্যে আছে তাদের পার্টির অনুমোদিত লাইনের প্রয়োগ। যাঁরা এটিকে পার্টির লাইন থেকে বিচ্যুতি হিসাবে দেখাতে চান বা জ্যোতিবাবুর জমানার বিপরীতে বুদ্ধদেবকে স্থাপিত করতে চান তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। ১৯৯৪ সালে জ্যোতি বসুর নয়া অর্থনীতি গ্রহণের পর থেকেই যাঁরা বিদেশি ও দেশি বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করবেন, তাদের কাছেই সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর যেখানে এই সংসদীয় দলগুলি ক্ষমতায় নেই সেখানে খানিক অস্বস্তির সঙ্গে (কারণ তারা জানে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম কী ঘটিয়েছে) দুর্বলভাবে যে বিশ্বায়ন বিরোধিতা তারা

করেছে তার সাথে মমতা বা করুণানিধির বিরোধিতার তফাৎটা কী?

আমাদের কাছে সমস্যার মূল জায়গাটা হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবির। কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরটিকে এই অত্যধিক গুরুত্ব দেবার কারণ, আগামী দিনে ভারতকে বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য উপাদান জড়িয়ে আছে এই শিবিরটির মধ্যেই। আমরা শুধু উপাদানের কথাই বলছি শেষ পর্যন্ত তাঁরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে তাঁদের মধ্যেকার মন্থন-প্রক্রিয়ায় তারা অগ্রণী মতাদর্শ ও রাজনীতির জন্ম দিতে পারেন কিনা তার উপর। এ কাজটি অবশ্যই বাকি আছে। বর্তমান মুহূর্তে মনোবলের (স্পিরিট) দিক থেকে তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। যদি ধরে নিই এই আন্দোলনের মূল ধারাটি ১৯৭১ সাল থেকে বিভক্ত হতে শুরু করেছে তবে তাদের খণ্ডিত অস্তিত্বের সূত্রপাত ঘটেছে ৪৫ বছর আগে থেকে। এ এক অতি দীর্ঘ সময়। কেন সময় এত বেশি লাগছে তা এক অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই অস্বাভাবিক গ্রুপ অবস্থান এবং এখনই কোনও উজ্জ্বল সম্ভাবনা না দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দিয়েছে। যা তরতাজা ভাব নষ্ট করছে, নতুন করে ভাবার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, নতুন কিছুকে দেখা বা বোঝার আকাঙ্ক্ষাকেও দুর্বল করে দিচ্ছে। এই সেই কারণ যার জন্য বিগত দু দশকের চলমান অতি চিত্তাকর্ষক সংগ্রামগুলিতে এঁদের উপস্থিতি অস্বাভাবিক রকমের কম। ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এঁদের অস্তিত্ব কিন্তু এতটা কম নয়। আসলে তাঁরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি গণ-আন্দোলনের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের গুরুত্ব কতটুকু, এই ধরনের আন্দোলনগুলির ভবিষ্যৎ কী এবং একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্যই বা এ ধরনের আন্দোলনগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়া কতটুকু প্রয়োজন।

আট

আসলে আজকের সময়ে, ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনগুলি এক অর্থে আগামীর বার্তাবহ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কেন শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জারি রাখা সাম্রাজ্যবাদের টিকে থাকার প্রধান শর্ত। আজ সাম্রাজ্যবাদ এক দিকে আক্রমণ করেছে ভারতের সস্তা শ্রমশক্তিকে, অন্য দিকে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে। তিনটি ফ্রন্টে লড়াই-ই জরুরি। তবে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের লড়াই-এর কোনও তুঙ্গ অবস্থা নেই। লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠছে এবং ক্রমশই তার তীব্রতা বেড়ে উঠছে যেখানে মানুষের শারীরিক অস্তিত্বই মুহূর্তের মধ্যে বিপন্ন হয়ে উঠছে। উচ্ছেদ বিরোধী লড়াইগুলি (এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী লড়াইগুলিকেও ধরা হচ্ছে) হচ্ছে এই বর্গভুক্ত। ভারতের শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতম রূপটি পাওয়া যাচ্ছে এই ধরনের লড়াই-এর ভিতরই। তাই যেখানেই শ্রেণী সংগ্রাম সেখানেই কমিউনিস্টরা, এই আদর্শে বিশ্বাস করলে এই সংগ্রামগুলিকে অবহেলা করা যায় না। এই লড়াইগুলির জন্য যতটা, ততটাই কমিউনিস্টদের শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়ার জন্য এই গণ-সংগ্রামগুলিতে আত্মনিয়োগ করা জরুরি। কমিউনিস্টদের কাছে আরও যেটা জরুরি কর্তব্য তা হলো শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এই লড়াইগুলির যোগসূত্র তৈরি করা। এই লড়াইগুলিতে যোগদানের ফলে শ্রমিকরাও উদ্দীপ্ত হবেন, আবার উল্টো দিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শে এসে এই সব লড়াই-এর নেতৃবর্গও আন্দোলনের সঠিক দিশা অর্জন করতে পারবেন। এই রসায়নের মধ্য দিয়েই শ্রেণী সংগ্রাম এগোতে থাকবে। আর কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজের মারফত নিজেদের সর্বহারাকরণ ঘটাবার সাথে সাথে চলমান এই সব বৃহৎ গণজাগরণের থেকে বিপ্লবী উন্মাদনার রসদ সংগ্রহ করবেন। এই আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সঠিক দিশায় পরিচালিত করাও কমিউনিস্টদের কর্তব্য। কিন্তু তার জন্য হয়ত আরো অনেক অপেক্ষা করতে হবে। সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যদি একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও বিকাশের অন্যতম শর্ত হয়, তবে আংশিকভাবে হলেও তার একটি স্পর্শ কিন্তু এখান থেকেই আহরণ করা সম্ভব। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত জাগরণের জন্যই। কিন্তু সেই চূড়ান্ত সময়ে সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য কি এই আন্দোলনগুলি আমাদের প্রশিক্ষিত করবে না?

ঋণস্বীকার : এই নিবন্ধ লেখার জন্য তথ্য প্রধানত *অনীক* ও লিবারেশন-এর পুরনো সংখ্যাগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন

শ্রমজীবী আন্দোলন ও কিছু প্রশ্ন

নব দত্ত

২০১১, ৯ এপ্রিল। কলকাতার বুকে হাজার হাজার মানুষের মিছিল। ভোর থেকেই স্টেশন থেকে ছোট ছোট মিছিল আসছে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। শ্রমজীবী-পেশাজীবী-প্রান্তিক মানুষের প্রায় পঞ্চাশটি সংগঠন যুক্তভাবে সমাবেশ আহ্বান করেছেন। সেদিনের কলকাতা সাক্ষী হয়ে থাকল গরিব মানুষের এমন এক সমাবেশের যা কোনো রাজনৈতিক দলের নির্দেশিত নয়। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রান্তিক মানুষের দাবিপত্র প্রকাশ করা হল। এই দাবিপত্র আসলে দীর্ঘদিনের বঞ্চিত অধিকারের কথা বলল। তুলে ধরল অনেক অনেক প্রত্যাশা, যা নিয়ে এই রাজ্যের গরিব প্রান্তিক মানুষ জীবিন-জীবিকা, অধিকার রক্ষার দাবিতে বারবার সরব হয়েছে। মিলেছে অপ্রাপ্তি, আদিবাসী, বনবাসী, সুন্দরবনবাসী, মৎস্যজীবী, পাথরশিল্পী, খালপাড়বাসী, উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসী, পথবাসী, মিড মে মিল রাঁধুনি, বন্ধ চা-বাগান শ্রমিক, মহিলা, জাতীয় গ্রামীণ সংস্থান নিশ্চয়তা আইনে ভুক্ত শ্রমিক/বেকার, হকার, অসংগঠিত অসুরক্ষিত শ্রমিক, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, জরিশিল্পী, স্পঞ্জ আয়রন অঞ্চলবাসী, জনসংস্কৃতি কর্মী, শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/শিক্ষক/সেবক। গরিব মানুষদের দাবি নিয়েই শ্রমজীবী অধিকার যাত্রা এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

দাবিপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হলো—

> ভারতের অর্থনীতিতে, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিতে ছোট শ্রমিকদের বড় ভূমিকা। ছোট শ্রমিক বলতে ছোট শিল্পী, ছোট সংস্থায় কাজ করা শ্রমিকরা। আমাদের ডাকা হয় নানা নামে— কারিগর, হস্তশিল্পী এবং সরকারের ভাষায় অসংগঠিত শ্রমিক। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বনিযুক্ত কর্মীরা। আমাদের অবস্থান ছোট শ্রমজীবীদের মতো, যদিও শ্রমের জগতে আমরাই সংখ্যায় বেশি, রাষ্ট্রের কাছে আমরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, অসংগঠিত শ্রমিক এই নামটা লাগিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র আমাদের সমস্ত রকমের পাওনা থেকে সরিয়ে রেখেছে। আর এইখানেই আমাদের বিরোধ।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হলো—

> আমাদের বেঁচে থাকা, নিছক শ্রম দেওয়া আর মজুরি পাওয়া নয়। আমাদের বেঁচে থাকা ঠিকঠাক শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে। আমাদের বেঁচে থাকা এখন যখন শ্রম দিচ্ছি। আমাদের বেঁচে থাকা তখনও যখন শ্রম দিতে পারব না। আমাদের বেঁচে থাকা আমার, আমার পরিবারের। এই সামগ্রিক বেঁচে থাকার দাবিতে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থার দাবি। বড় শিল্পের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন জোরদার লড়াই করে এই দাবি আদায় করে নিয়েছিলেন, আমরা পাইনি।

এ এক সঠিক বোধ, বিশ্বাস থেকে বলা বক্তব্য। শ্রমজীবী মানুষের এমন জোরে বড়ই প্রয়োজন। তবু আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুই না কেন? তাহাদের কথা লিখতে বসে আমাদের ঘরের কথা বলব, যা আমার একান্তই ব্যক্তিগত। দয়া করে কোনো সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে কথাগুলো ধরবেন না।

আমাদের রাজ্যে কাজ করেন এমন মানুষ কতজন? চায়ের কাজ, চা-বাগানের কাজ বাদ দিয়ে মোট কাজ করে এক কোটি বত্রিশ লাখ। এঁরা কাজ করেন ৪২ লাখ প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে ২৭.৭৩ লাখ সংস্থা হলো গ্রামে যেখানে কাজ করে ৫৫.৪৩ লাখ। বাকি ১২.৩২ লাখ সংস্থা সহরে, যেখানে কাজ করেন ৪৪.৮৯ লাখ কর্মচারী। ইকনমিক সেনসাস যে তথ্য দিচ্ছে, তাতে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে ৯৫.৫০ লাখ অ-কৃষিতে যুক্ত।

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে হাজার জন মানুষের মধ্যে স্বনিযুক্ত ২১৪ জন। নিয়মিত বেতন/মাইনে পান ৩৪ জন। ক্যাজুয়াল শ্রমিক ১৪৯ জন। সব মিলিয়ে ৩৯৭ জন। এঁরা কাজ করেন আর যাঁরা কাজ করেন না— বেকার ১২ জন, ছাত্র ২২৮ জন। পারিবারিক কাজে যুক্ত ২১৩ জন, অন্যান্য ১৫১। সবমিলিয়ে ৫৯১।

এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে কোনটা কাজ, কোনটা জীবিকা। এই নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েনের যে কথাবার্তা শোনা যায় তার মূলে রয়েছে এইসব তথ্য। জীবিকায় অস্থিরতা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, সরু সুতোর ওপর পা রেখে চলেছে এরা। হারতে চায় না বলে যেখানে যতটুকু জায়গা পায় সেখান থেকেই দুহাত খাটিয়ে তুলে আনে জীবিকার রসদ। বাঁচতে হলে খাটতে হবে, এটা এরা জানে। কিন্তু সমস্ত কর্মক্ষম মানুষ কি থিতু হয়ে খেটে যাওয়ার সুযোগ পায়?

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১-২০০১ প্রধান শ্রমিক (main labour)-এর সংখ্যাবৃদ্ধির হার (১২.০৬ শতাংশ)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১৭.৪৮ শতাংশ) চেয়ে কম। প্রান্তিক শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার (৩৮২.৬৮ শতাংশ) বেশ উদ্বেগজনক। প্রান্তিক শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের ভাগ করলে চিত্রটা আরও ভয়াবহ দেখায়। এক দশকের মধ্যে বৃদ্ধির হার দেখলে একটু চমক লাগে। ১৯৯১ সালের গণনায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মাত্র ২ লক্ষ পুরুষ প্রান্তিক শ্রমিক পাওয়া গেছে আর ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৫ লক্ষ। অর্থাৎ পুরুষ প্রান্তিক শ্রমিক ১০০০ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে। এরা সম্পূর্ণ শ্রমশক্তি ব্যবহারের সুযোগ

পায়না। খুব স্বাভাবিক যে, এরা কৃষি এবং অন্যান্য কাজে অসংগঠিত ক্ষেত্রেই পড়ে আছে। মহিলারা সাধারণত ঘরের কাজ সামলে বছরে ১৮০ দিনের বেশি অর্থকরী কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে না। তাই তাদের সংখ্যা সবসময় পুরুষের চেয়ে বেশি থাকে। এক্ষেত্রেও ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে প্রান্তিক মহিলা শ্রমিক বেড়েছে ২০০ শতাংশ। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা কমেছে এবং খেত মজুরের সংখ্যা বেড়েছে। কুটির শিল্পে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়। এই ছবিটাতে একদিকে যেমন গ্রামীণ শিল্পের ওপর শ্রমিকের নির্ভরতা বোঝায়, অন্যদিকে রাজ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সংকোচনের দৃষ্টান্ত হিসাবেও ধরা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ৯ শতাংশের কম স্থায়ী শ্রমিক। শহরে সংখ্যাটা ৩৫ শতাংশ। রাজ্যে ৭৫ শতাংশ (হিসাবটা ২০০৯-১০ সালের) শ্রমিক কোন সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পায় না। ৭৩ শতাংশ শ্রমিকের চাকরি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে নয়।

অসংগঠিক শ্রমজীবীর এই তথ্যকে সামনে রেখে আলোচনা করা যাক এদের সংগঠিত হওয়ার নানান প্রচেষ্টা নিয়ে। এখানে আলোচনা করব দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণহীন কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়ে। যেসব সংগঠন, মঞ্চ, সমিতির কথা এখানে বলছি তা কোনো প্রতিনিধি স্থানীয় নয়। বেছে নেওয়ার দায় একান্তই নিজস্ব।

শ্রমজীবী অধিকার সংগঠনের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র

এক : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, মালদা, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নকশালবাড়ি, নদিয়া, ২৪ পরগনা উত্তর, দক্ষিণ— এইসব জেলার অনেকগুলি আদিবাসী, বনবাসী সংগঠন মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী বনবাসী অধিকার মঞ্চ।

আদিবাসী অঞ্চলে জল, জমি, জঙ্গল সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার এমন কোনো নীতি, আইন, প্রকল্প গ্রহণ বা নির্মাণ করতে পারবে না যাতে আদিবাসীরা তাঁদের অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হন বা বিচ্যুত হন। যে সকল আদিবাসী সরকারের আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ গেছেন তাঁদের আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন— কোল, ধামাল, বিগা এদের তালিকায় আনতে হবে। শবর, খেড়িয়া, টোটো, বিরহোরদের আদিম জনজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। বনজ সম্পদের ওপর বনবাসী আদিবাসীদের পূর্ণ সামাজিক অধিকার সহ ৩৫টি দাবি এঁদের। তা নিয়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গে, কলকাতায় বড় বড় সমাবেশ, মিছিল, ডেপুটেশন, কনভেনশন সংগঠিত করেছেন।

দুই : সারা দেশ জুড়ে বিরাট বিরাট সমাবেশ, বন-শ্রমজীবীদের আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ভারতে বনাধিকার আইন চালু হলো ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি। আইনে বলা হলো, ভারতের অরণ্যবাসী মানুষরা জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার পাবেন। এছাড়াও বলা হলো যে জঙ্গলের সুরক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে অরণ্যবাসীর হাতে। উত্তরবঙ্গের বনবাসীরা ও বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষরা অরণ্যের অধিকার আইন প্রতিষ্ঠা করতে এক উল্লেখযোগ্য, দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী আন্দোলন গড়ে তুললেন যা আজও বর্তমান। উত্তরবঙ্গ 'বনজনশ্রমজীবী মঞ্চ' গত এক দশকের বেশি সময় ধরে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন বনবস্তিতে বসবাস-রত আদিবাসী-বনবাসী মানুষ বাস্তুজমি-কৃষিজমির মালিকানা সহ অরণ্যের অধিকারের বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

সরকারিভাবে জানা যায় (২০১৪), অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রামসভা পর্যায়ে আদিবাসীদের পক্ষে দাবি জমা পড়েছে ৯৭,৭০০ এবং পরম্পরাগত দাবি ৩৭,৭৪২টি। কম্যুনিটির পক্ষে ৭৩২টি দাবি জমা পড়েছে। এর মধ্যে মাত্র ব্যক্তিগত ৩১,৪৯৭টি (আদিবাসী) জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছে। গোষ্ঠীর দাবি মেনে পাট্টা বিলি হয়েছে ৩১২টি।

তিন : বনবাসী অধিকার আইন অনুযায়ী বনবাসী এবং বনের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনধারণের সুনিশ্চয়তা পাওয়ার কথা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বনাঞ্চলে কিছু কিছু বনবাসীকে এই অধিকার সীমিতভাবে দেবার ব্যবস্থা হলেও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী, মধুসংগ্রাহক ও অন্যান্যদের এই অধিকার একেবারেই স্বীকৃত হয়নি। বনদপ্তরের অফিসারদের যুক্তি— এরা তো কেউ বনে বাস করে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ যে যাঁরা বনে বাস করেন না, কিন্তু বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরম্পরাগতভাবে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদেরও এই অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। সুন্দরবনের সর্বত্র মৎস্যজীবীদের ক্ষোভ, তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় বনদপ্তরের কর্মীরা। যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায় কোর এরিয়ায় অনুপ্রবেশের নামে তাঁদের জাল, নৌকা কেড়ে নেওয়া হয়। মাছ কেড়ে নেওয়া হয়। অবাস্তব জরিমানা করা হয়। এমনকি মারধোরও করা হয়। সুন্দরবনের অগম্য অঞ্চলে বনদপ্তরের এক অফিস থেকে আর এক অফিসে ঘুরে বেড়াতে হয় গরিব মৎস্যজীবীদের। এভাবে তাঁদের বেঁচে থাকা এবং জীবন-জীবিকা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর বিরুদ্ধে সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি ও সুন্দরবন বনজনশ্রমজীবী মঞ্চ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সংগঠিত করছে।

চার : ১৯৫০-এর দশকের প্রায় শুরু থেকে মৎস্যজীবীরা জম্বুদ্বীপে প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাছ শুকোতেন। ২০০৩ সালে পরিবেশ রক্ষার নামে তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়। এক ধাক্কায় দশ হাজার মৎস্যজীবী যাঁরা ডাঙায় মাছ বাছতেন ও শুকোতেন এবং আরও ১০ হাজার মৎস্যজীবী যাঁরা

সমুদ্রে মাছ ধরতেন, এমন হাজার হাজার মহিলা ও পুরুষ মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটির এই আদেশের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম ও স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠন উচ্চতম আদালতে আবেদন করে। পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের বনদপ্তর সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে বলে যে, তারা জম্মুদ্বীপে ১০০ হেক্টর জমি মৎস্যজীবীদের মরশুমি মাছ শুকানোর জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এরপর কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এক প্রতিবেদনে স্বীকার করে নেয় যে, জম্বুদ্বীপের থেকে মৎস্যজীবীদের অন্যায়ভাবে উৎখাত করা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা সেখানে পরিবেশের কোনো ক্ষতি করছিলেন না। অথচ এখনও মৎস্যজীবীদের জম্বুদ্বীপে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

পাঁচ : ২০০৪ সালের ৯ জুন আমলাশোলের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা নজরে আসার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি প্রাচীন জনজাতিকে অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। জলপাইগুড়ির মাদারিহাট ব্লকে টোটোপাড়ায় ৩০০ পরিবার, পুরুলিয়ার তিনটি ব্লকে বীরহোড়দের ১১৭ পরিবার, পশ্চিম মেদিনীপুরের ২০টি ব্লকের লোধা শবরদের ১৫২৬২ পরিবার। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমাতে অনেক লোধা-শবর বাস করেন। এদের সংগঠিত করে লাগাতার আন্দোলন করে চলেছে মেদিনীপুর লোধা-শবর কল্যাণ সমিতি। এঁদের উদ্যোগে সংগঠিত অনশন ধর্নায় অনেক দাবির সাথে উল্লেখযোগ্য একটি দাবি, অন্ত্যোদয় প্রকল্পের সুবিধা সবাই পাচ্ছেন না। ২০০৪ সালের পর যাদের জন্ম হয়েছে তাঁদের এই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। সমস্ত লোধা-শবর পরিবারকে বিপিএল তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ছয় : ফ্যাশন জগতে জরির কাজের চাহিদা ভালো থাকলেও এই কাজে যুক্ত জরিশিল্পীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। শ্রমিক, কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশার মানুষের দাবি, তাদের অধিকার নিয়ে কিছু উদ্যোগ, আলোচনা দেখা গেলেও জরিশিল্পীদের সমস্যা, বঞ্চনা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই প্রায় কিছুই জানেন না। জরিশিল্পীদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন এবং অধিকার অর্জনের পক্ষে গড়ে উঠেছে *সারা ভারত জরিশিল্পী কল্যাণ সমিতি*। রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ জরিশিল্পী অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। সরকারের কাছে, জরিশিল্পীরা 'আর্টিজেন কার্ড' দেওয়ার দাবি করেছেন। 'জরিশিল্প কল্যাণ বোর্ড' গঠনের দাবি সহ ১৮ দফা দাবিপত্র পেশ করেছেন।

সাত : ভারতের ৭৫০০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূলের পরিবেশ আজ আক্রান্ত, পুঁজি বিনিয়োগের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে এই উপকূল। বিভিন্ন ধরনের কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বন্দর, পর্যটন শিল্প, বর্জ্য নিক্ষেপ আজ সমুদ্র উপকূলের পরিবেশ ধ্বংস করছে। অন্যদিকে বড় বড় ট্রলার বিপুল পরিমাণ মাছ ধরে এবং মৎস্যক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করে সমুদ্রে জীববৈচিত্র্যের বিপদ ডেকে আনছে। অথচ লক্ষ লক্ষ ছোট মৎস্যজীবী উপকূলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে ছোট জাল, নৌকা ব্যবহার করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং সস্তায় দেশের মানুষকে পুষ্টি যোগান। চিরাচরিত মৎস্যজীবীরাই সমুদ্র উপকূলের সবচেয়ে বড় দায়ভাগ এবং স্বাভাবিক জিম্মাদার, ভাল জল না হলে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। তাই জীবিকার স্বার্থে উপকূলের পরিবেশ দূষণের বিরোধিতা। বনবাসী অধিকার রক্ষা আইনের মতো মৎস্যজীবীদের অধিকার নিয়ে কোন আইন তৈরি হয়নি। উপকূলের স্থল ও জলের পরিবেশ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অধিকারের স্বীকৃতি ও আইন প্রণয়নের দাবি করছে ন্যাশনাল ফিস ওয়াকার্স ফোরাম।

আট : মৎস্য ভেন্ডারদের শ্রমিকের স্বীকৃতি, কাজের উপযোগী পরিবেশ, স্বল্প সুদে ঋণ, বিমা, পেনশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার দাবি। সমুদ্র মৎস্যজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরাসরি সমুদ্রে মাছ ধরতে নাগেলেও ঝাড়াই, বাছাই এবং বিশেষত বিক্রি করায় যুক্ত। এরা খুবই গরিব। মহাজনের ঋণের জালে প্রায় সবসময় জড়িয়ে থাকে।

নয় : পশ্চিমবঙ্গের করণদীঘি ব্লকের মিড ডে মিল রাঁধুনিরা সমিতি বানিয়ে মিড ডে মিলের দুর্নীতি বন্ধ করার এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

দশ : ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি অঞ্চলের পাথরশিল্পীরা সংগঠিত হয়ে দাবি করছেন। পাথরশিল্পীদের কারিগর পরিচয়পত্র দেওয়া, সরকারি উদ্যোগে পাথরশিল্পীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, পাথরদ্রব্য বিক্রয়ের হাটটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি দাবি করছেন পাথরশিল্প ও শিল্পী উন্নয়ন সমিতি।

এগার : বর্তমান বিশ্বের প্রতি তিনজন শহরবাসীর ১জন বস্তিতে বাস করেন। কলকাতার পরিসংখ্যান প্রায় একইরকম। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৪৬ লক্ষ কলকাতাবাসীর ১৫ লক্ষ বস্তিতে বাস করেন। যা মোট জনসংখ্যার ৩২.৫ শতাংশ। সাধারণ অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদির কারণে গত দেড়শ বছর ধরে এই শহরে মানুষ এসেছে এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তার ধারে, খালপাড়ে, রেললাইনের ধারে, সরকারি ফাঁকা জমিতে বস্তি গড়ে তুলেছে। সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আলো, বাতাস, পানীয় জলের যে প্রয়োজন সেগুলির চরম অভাব সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে গৃহহীন মানুষ কোনোভাবে বাঁচার উপায় খুঁজে নিয়েছে। ২০০৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতা শহরের পুরসভা এলাকায় স্বীকৃত বস্তির সংখ্যা ২০১১, অস্বীকৃত (বেআইনি) বস্তির সংখ্যা ৩৫০০। উদ্বাস্তু সমস্যার রেশ এখনও চলতে থাকায় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন

প্রকল্পের কারণে উচ্ছেদ হওয়ায় বহু মানুষ এরপরেও কলকাতায় আসছেন এবং কোনো না কোনো বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছেন।

বিশ্বব্যাঙ্ক, ডিএফআইডি, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সাহায্যে (বা চাপে) নব্বইয়ের দশক থেকে বিগত রাজ্য সরকার সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেয়। এবং তার বলি হয় এইসব বস্তিবাসী গরিব মানুষরা। কোনোরকম সষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করা হতে থাকে। এরই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে বৃহত্তর কলকাতা খালপাড় বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। অপউন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এঁরা উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি জানান, ইতিমধ্যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং মানুষের মতো বাঁচার দাবিকে তুলে ধরেন। ২০১১ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তদনীন্তন বামফ্রন্ট সরকার শহরে বড় বড় হোর্ডিং দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, তারা মোট ১,৪০,১১৩ জন গরিব ও বস্তিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কলকাতার জন্য JNNURM-এর BSUP (বেসিক সার্ভিসেস টু আরবান পুওর) প্রকল্প এবং KEIP প্রকল্পের অধীনস্থ যে ঘোষিত পুনর্বাসন প্রকল্প প্যাকেজগুলি আছে তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। প্যাকেজগুলি অস্বচ্ছ। উচ্ছেদের আগে বিশদভাবে কিছু জানানোও হয় না। KEIP প্রজেক্টে জমিভিত্তিক পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছিল। আর BSUP প্রকল্পে বলা আছে পরিবার পিছু একটি বেডরুম, একটি টয়লেট, একটি বারান্দা থাকবে। সঙ্গে কমিউনিটি হল, জীবিকা কেন্দ্র, পার্ক, জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু পুনর্বাসিত পরিবারগুলির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত অপরিসর ১৫০-১৫৫ বর্গফুটের মধ্যে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পানীয়জলের ব্যবস্থা নেই, জীবিকা কেন্দ্র, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা নেই। শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সবই বিপর্যস্ত।

বারো : ২০০০ সালে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তায় ৬১টি এনজিও-র মাধ্যমে ১৪০০ স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হয়। লরেটো ডে স্কুল, শিয়ালদহের শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুসারে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, হিন্দি ও উর্দু মাধ্যমে পড়ানো জন্য। ১৬ আগস্ট, ২০০১ থেকে কলকাতা পুর এলাকার ১৪১টি ওয়ার্ডে প্রায় ৭০০ কেন্দ্রে পড়ানো শুরু হয় পথশিশু ও দরিদ্র পরিবারের স্কুলছুট শিশুদের। পরে এই প্রকল্পের দায়িত্ব নেয় সর্বশিক্ষা মিশন। কলকাতা পুরসভার (প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার) পক্ষ থেকে সরাসরি পরিচালনার ভার অর্পিত হয় কলকাতা পুরসভার নজরাধীন সিটি লেভেল প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন সংস্থার উপর। ৬১টি এনজিও-কে কার্যত কন্ট্রাক্ট দিয়ে এই স্কুলগুলি চালানো হতে থাকে। এনজিও-গুলি অনিয়ম ও দুর্নীতি চালাতে থাকে। প্রতিবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর চালানো হয় দমনপীড়ন। ন্যূনতম প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সাতশো শিক্ষক-শিক্ষিকা (সেবক/সেবিকা) এবং মিড ডে মিলের রাঁধুনি আয়া, কয়েকশো মানুষ এই প্রকল্পে কাজ করতেন। ৩১ মার্চ ২০১২ থেকে সবাই একসাথে ছাঁটাই হলেন। এই শিক্ষা প্রকল্পের অংশীদার এনজিও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, শিক্ষিকারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পাননি। দিনের পর দিন মাসিক ভাতা (প্রথমে যা ছিল ১০০০ টাকা, পরে হয় ২০০০ টাকা) পুরো না পেয়েও ভাউচারে সই করতে বাধ্য হওয়া, চেক পেয়ে নগদে ১০০/২০০ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি অজস্র অভিযোগ পেয়েও সিএলপিও এবং সর্বশিক্ষা দপ্তর রহস্যজনকভাবে নীরব থেকেছে। শিক্ষাপ্রকল্প চালুর দাবি এবং সমস্ত ছাঁটাই শিক্ষাকর্মীদের পুনর্বহালের দাবি করেছেন এরা। মিছিল, ধর্না, পথসভা ইত্যাদি কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের সংগঠিত করছে 'কলকাতা শিক্ষালয় টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'।

তেরো : গৃহশ্রমের কাজ করেন যারা তাদের আদৌ শ্রমিক বলা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক অনেক দিনের। কিন্তু গৃহ পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসেবে গণ্য করে দেশের কয়েকটি রাজ্য যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, ঝাড়খন্ড, কেরালা, কর্নাটক, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ইত্যাদিতে তাঁদের জন্য কাজের সময় ধরে মজুরি নির্ধারণ, শ্রমিক হিসাবে প্রাপ্য সামাজিক সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন হয়েছে।

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে-র (৬১তম রাউন্ড, ২০০৪-০৫) তথ্য অনুযায়ী দেশে ৪২ লাখ গৃহ পরিচারিকা আছে, যাদের কাজের সময় ৮ থেকে ১৮ ঘণ্টা। আইএলও-র ১৮৯ কনভেনশনে (২০১১) গৃহশ্রমের কাজকে একটি 'ভদ্রস্থ কাজ' গণ্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগের অথবা পরের কোনো সরকারই এঁদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার, বিশেষ করে রাজ্যস্তরে আইন প্রণয়নের, কোনো চেষ্টাই করেননি। বর্তমান সরকার এবং অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মুখে তাঁরা যাই বলুন আদপে গৃহ পরিচারিকাদের শ্রমিক বলে গণ্য করে আইনি অধিকারগুলি অন্যক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের মতো তাঁরাও পান সে ব্যাপারে আন্তরিক নন। বর্তমান রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, এখনও তাঁরা ভেবে উঠতে পারছেন না, এদেরকে শ্রমিক বলে গণ্য করে কীভাবে শ্রমসংক্রান্ত অধিকারগুলি দেওয়া হবে, অথচ ১ জুলাই ২০১১ দেশের সমস্ত রাজ্যের শ্রমসচিবকে চিঠি দেন কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রকের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ লেবার। তাতে গৃহ পরিচারিকাদের 'শপ অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট' আইনের এবং ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় আনার কথা বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে গৃহ পরিচারিকাদের একাংশকে সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি এনজিও রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড

ইউনিয়নের কাছে আবেদন জানায়। আশ্চর্যের বিষয়, কোনো কারণ না দেখিয়ে তাদের সেই আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার, দু দলই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বে-আইনি কাজ করেছেন। সম্প্রতি আবার 'সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামে একটি এনজিও উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, রাজারহাট, দক্ষিণ কলকাতা ইত্যাদি অঞ্চলে পরিচারিকাদের সংগঠিত করে 'পশ্চিমবঙ্গ পরিচারিকা সমিতি' নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

চোদ্দ : এ রাজ্যে বড় রাজনৈতিক দলগুলি আলাদাভাবে খেতমজুরদের নিয়ে সংগঠন করে না। যদিও ভিন রাজ্যে তাদের অনেককেই খেত মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেখা যায়। ২০০১ জনগণনায় দেখা গেল, রাজ্যে কৃষক কমছে, কৃষি মজুর বাড়ছে— ৫৬ লাখ থেকে ৭৩ লাখ হয়েছে দশ বছরে, ১৭ লাখ কৃষি মজুর বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মজুরদের সারা বছর কাজের গ্যারান্টি দিতে হবে, মহারাষ্ট্রে 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের' আদলে এই দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগী এনজিও গড়ে তোলে পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি। খেতমজুরদের অধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার একাধিক ব্লকে এঁরা সংগঠন গড়ে তোলেন। গ্রামীণ মজুরদের এই সংগ্রামী সংগঠনটি খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের বঞ্চনার বহু বিষয় প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। সংগঠিত গ্রামীণ রাজনীতির মাতব্বরদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এমন একটি মজুর সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিলনা। পরবর্তীতে খাদ্যের অধিকার, প্রকল্প, তথা আইনের প্রয়োগে বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরার কাজ এঁরা করে চলেছেন। এনআইআরইজিএ-তে বিশেষত মহিলাদের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত কাজ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা, সময়মতো মজুরি, বেকারভাতা, দেরিতে মজুরি দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ, আইন সংশোধনের মাধ্যমে পরিবারের সব কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া এবং ১০০ দিনের পরিবর্তে ৩০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা— এসব দাবি নিয়ে গ্রামীণ মজুরদের সংগঠিত করার কাজ এঁরা করে চলেছেন।

পনের : মেদিনীপুরে এক মিটিংয়ে গেছিলাম। ১১টি ব্লকের ৬২টি গ্রামের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল জমি, গ্রামের মানুষের বাসযোগ্য জমি, কৃষিজমির পাট্টা সংক্রান্ত বিষয় এবং বনাঞ্চলের মানুষ ও বনের উপর নির্ভরশীল মানুষের জমি, বনসম্পদ পাওয়া ও ভোগদখলের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়। এসব নিয়ে 'আদিবাসী বনবাসী অধিকার মঞ্চের' আহ্বানে সভায় অসংখ্য অভিযোগ শুনলাম। 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি প্রকল্পে' যে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরেকজন দখল করে রয়েছেন। অথচ যেখানে বাস্তু জমিতে বসবাস করছে এবং দখলে রয়েছে সেই জমি খাস জমি হওয়া সত্ত্বেও পাট্টা দেওয়া হয়নি। সমস্যা নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের দ্বারস্থ হলে তাঁরা জানাচ্ছেন, জমির পাট্টার কাগজটি রাখুন, পরে দেখা হবে। জমি সংক্রান্ত বিষয়, আদিবাসীদের উপর নির্যাতন ও আদিম জনজাতি গোষ্ঠীদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধর্না, অনশনের মতো কর্মসূচি করে চলেছে এই মঞ্চ। লালগড়ের আদিবাসীদের বিদ্রোহকে সদর্থক সমালোচনা ও সংহতি জানিয়ে আদিবাসীদের একাধিক সামাজিক ও কল্যাণকামী সংস্থা ও বনবাসীদের যুক্ত মঞ্চের সঙ্গে একযোগে গড়ে ওঠে রাজ্য জুড়ে এই যৌথমঞ্চ।

ষোলো : ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৬। রবিবার রাতে কলকাতার নানা জায়গায় পুলিশ এবং দলীয় ক্যাডারদের যৌথ সন্ত্রাস শুরু হল। বুকে সিএমসি ব্যাজ লাগানো হাজার হাজার সশস্ত্র মানুষ কলকাতার কয়েকটি মোড়ে হকার উচ্ছেদের নামে (অপারেশন সানশাইন) ভাঙচুর, আগুন লাগানো, লুঠপাট ইত্যাদি চালান। ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাহিনী ঘোষণা করল, অপারেশন সফল হয়েছে। তদানীন্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যানবাহনের গতি ফিরিয়ে আনতে না পারলে তাঁদের মন্ত্রিত্বের অবলুপ্তি ঘটাবেন। শত্রু এবং প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন রাজ্যের ফুটপাথে কেনাবেচা করেন এমন দোকানি, হকার, ফেরিওয়ালা।

২৫ নভেম্বর ১৯৯৬ থেকে ৮ জানুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতায় হকারি করতেন এমন ১৮ জন আত্মহত্যা করেন। সারা রাজ্যে প্রায় ১০০ হকার অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যান। ৮ জানুয়ারি মমতা ব্যানার্জির আহ্বানে হাজার হাজার হকারের ভুখা মিছিল। ৯ জানুয়ারি হকাররা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মজরের কলকাতা আগমনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ধর্মতলা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হকাররা অবরোধ সৃষ্টি করেন। সেই অবরোধ তুলতে প্রশাসন লাঠি, গ্যাস, গুলি চালায়, ব্যাপক ঘরপাকড় হয়। অবশেষে রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারে জন মেজরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

একদিকে যেমন অত্যাচারী প্রশাসকের কথা আমাদের স্মৃতিতে ধরা থাকবে, অন্যদিকে 'অপারেশন সানশাইন' নামে হকার উচ্ছেদ একটি নতুন বোধোদয়ের জন্ম দিয়েছে। হকার সংগ্রাম কমিটি, হকার সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ কর্তৃ হকারদের স্বার্থরক্ষায় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এক অনন্য সংগ্রামের নজির রেখেছে। হকারদের জীবিকার অধিকার পুনর্বাসনে এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশ জুড়ে হকার, ভেন্ডার, ফেরিওয়ালাদের এক যৌথ ফেডারেশন গড়ে উঠেছে, যাদের লাগাতার প্রচেষ্টায় হকারদের জন্য জাতীয় নীতি ও পথ-হকারদের জন্য আইন তৈরি হয়েছে। আইনে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রান্তিক মানুষের জীবিকার সুরক্ষায় এক নিশ্চিত বড় প্রাপ্তি।

পশ্চিমবঙ্গে ২০ লাখ মানুষ হকারি পেশায় যুক্ত। কলকাতায়

হকার রয়েছেন ২ লাখ ৭৫ হাজার। এরপর রয়েছেন তাঁরা, যাঁরা প্রস্তুত করা জিনিসপত্র বিক্রয় করেন। এঁদের সবাইকে ধরলে হকার পেশায় মোট যুক্ত মানুষের সংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লাখ। কলকাতায় রয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার খাদ্যবিক্রেতা হকার। হকার সংগ্রাম কমিটি ২০০৪ আগস্ট তদানীন্তন মুখমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেয়, তাতে বলা হয়, তাঁদের হিসাবে ২০০১ সালে কলকাতার হকাররা মোট ব্যবসা করেছেন ৮,৭৭২ কোটি টাকার। এছাড়া এই চিঠিতে তাঁরা চমকে দেওয়ার মতো কিছু তথ্য দেন। কলকাতার হকাররা পুলিশ, মস্তান আর ইউনিয়ন তোলাবাজদের দেন বছরে ২৬০ কোটি টাকা। মহাজনদের সুদ দেন বছরে ৫১০ শতাংশের মতো।

২০০৯ জাতীয় নীতি প্রণয়ন হয়েছে। ২০১২ স্ট্রিট ভেন্ডারস্ (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রীট ভেন্ডিং) আইন হয়েছে। হকার নীতি প্রণয়ন, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হকারদের জন্য বড় প্রাপ্তি। অধিকারের ইতিহাসে বড় সংযোজন। কারণ হকাররা অবৈধ দখলদার নন। হকার পেশাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ নয়, এটা স্বীকার করা হয়েছে জাতীয় নীতিতে।

৮ অক্টোবর ২০১০ সুপ্রিম কোর্টে হকার সংক্রান্ত এক মামলার রায়ে বিচারপতি জি এস সিং এবং অশোককুমার গাঙ্গুলি বললেন, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় এক্ষেত্রে মানুষের অধিকার নিয়ে যতটা বাস্তবসম্মত মনোভাবের পরিচয় রেখেছে, সেই বাস্তববোধ, অধিকারের প্রতি মান্যতা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কর্তারা, ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা দেননি।

সতেরো : ৪ জানুয়ারি ২০১২। নৈহাটি শিল্পাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চ-এর আহ্বায়ক রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেন। তাঁরা দাবি করেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল নৈহাটি শিল্পনগরী আজ শিল্প-শ্মশানে পরিণত। কারখানা বন্ধের ফলে ২০ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। ২০০৯ ও ২০১১ লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের সময় বন্ধ কারখানার সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। বন্ধ কারখানার বিষয়টি একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে সামনে এসেছে এবং এটাও অনস্বীকার্য যে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার সমস্যার যথার্থ সমাধান ব্যতিরেকে কোনো শিল্পায়ন বাস্তবে সম্ভব নয়। সরকার পরিবর্তনের পর শিল্পের জমিতে শিল্প গড়তে হবে এই ঘোষণায় খানিকটা সম্ভাবনার আলো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দু-একটি ঘটনা ছাড়া বন্ধ কারখানা খোলা বা সেই জমিতে নতুন শিল্প গড়ার কোনো উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছেনা। রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলিতে সারি সারি কারখানা বন্ধ। ব্যারাকপুর, কল্যাণী, গার্ডেনরীচ, হাইডরোড, হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বেলেঘাটা, দমদম— সর্বত্র এক ছবি। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অজস্র শ্রমিক তাদের বকেয়া বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা পায়নি। 'আইনের' অজুহাতে আটকে দেওয়া হয়েছে তাদের প্রাপ্য পাওনা। আর আইনের দোহাই দিয়ে রাজ্য সরকার চুপচাপ। কার্যত দর্শক। বিশ্বায়ন, উন্নয়নের নানান প্রতিশ্রুতি সরকার দিচ্ছেন, পুঁজির আগমন-নির্গমন নিয়ে নানান কথাবার্তা। কম দামে জমি, করছাড়ের অবাধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। আর এর জন্য পুঁজিপতিদের খোলামেলা তোষামোদ করা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে না, হাজার হাজার বন্ধ কারখানা খুলবে কীভাবে? ঐ সমস্ত কারখানা-শ্রমিকরা কাজ কীভাবে ফিরে পাবে? তাদের বকেয়া টাকা কোথা থেকে কীভাবে আদায় হবে? এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা কোন সরকারি দলের উপর নির্ভর না করে গড়ে তুলেছে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি। এরা দাবি তুলেছেন : বন্ধ কারখানা খোলা, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম ৩০০০ টাকা ভাতা (যা বর্তমানে ১৫০০ টাকা রয়েছে), ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ৫৮ বছরের উর্ধসীমা বাতিল করা— যতক্ষণ না শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছেন ততক্ষণ তাদের ভাতা দিয়ে যাওয়া, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বিপিএল কার্ড দেওয়া, বন্ধ কারখানার শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

আঠারো : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার গজাশিমূল, জিতুশোল অঞ্চলের তিনটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণে লাগোয়া এলাকায় চাষবাস, পানীয় জল সহ পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত। লোহার গুঁড়ো, চিমনির ধোঁয়া ইত্যাদি ঘাসের উপর জমা হয়। জলে আস্তরণ পড়ে। চাষবাস নষ্ট, যেটুকু হচ্ছে গুণমানে কম। জলস্তর নেমে যাচ্ছে হু হু করে। সব মিলিয়ে আশেপাশের ৫০টি গ্রামের ৫০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, কারখানার এক কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল হাসপাতালে দূষিত জল খেতে হচ্ছে রোগী, স্কুল পড়ুয়াদের। বহু আন্দোলন করে কারখানা বন্ধ করা যায়নি। গ্রামবাসীরা গড়ে তুলেছেন 'ঝাড়গ্রাম পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'। হাজার হাজার গ্রামবাসী কলকাতায় পরিবেশ দপ্তরে ধর্ণায় বসেছেন। ফলশ্রুতি দূষণ প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ইত্যাদি একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা। এদের সমর্থনে কলকাতায় সংহতি সমাবেশ করে নাগরিক মঞ্চ। এই অপরাধে বর্তমান প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হামলায় প্ররোচনা ইত্যাদি ১৮টি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। চার্জশিট হয়েছে, এখন জামিনে আছি। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার। সরকার পরিবর্তন হলেও কেসগুলি আজও প্রত্যাহার হয়নি। অন্যদিকে দূষণ একইভাবে চলছে, সেখানেও কোনো পরিবর্তন নেই।

প্রতি ১০০ টন স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনে ১.৬০ লক্ষ লিটার জল লাগে। মোটামুটি ৮০ হাজার মানুষের পানীয় জল গ্রহণ করে প্রস্তুত হয় ১০০ টন ইস্পাত। বিনিময়ে উদ্গীরণ করে ১৮০-২০০ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ২০-৩০ টন বর্জ্য পদার্থ, ১০০ টনের মত ধূলিকণা। এই হিসাবে ঝাড়গ্রামের রশ্মি ইস্পাত দৈনিক ২.৫ লক্ষ লিটার জল শোষণ করে। অর্থাৎ দৈনিক এক লক্ষের বেশি মানুষকে তাদের প্রাপ্য পানীয় জল থেকে বঞ্চিত করে রেখে মুনাফা করে কোটি কোটি টাকা। এইভাবে প্রতি ১০০ টন স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনের বিনিময়ে স্থানীয় মানুষকে শুধুমাত্র কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের এবং জলের খাতে বছরে ৯.৬ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি বহন করতে হয়। এছাড়াও আছে বনভূমি ধ্বংস, জল-জমি-বাতাস দূষিত করা।

উনিশ : বীরভূমের খাদান বিরোধী আন্দোলনের কুড়ি বছর হলো। সরকার নিয়ন্ত্রিত পাথরকল ও খনি কর্পোরেশন গড়ে উঠেছিল সাঁওতাল কৃষকদের অনেক জমি বে-আইনিভাবে দখল করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ৬ মে, ১৯৯৪ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। এই সময়েই বীরভূমের খাদান ও পাথরভাঙ্গা কল নিয়ে সাঁওতাল গ্রামবাসীদের দুর্দশার কথা প্রকাশ পায় কলকাতার সংবাদপত্রে। এই ঘটনাগুলি খাদান শিল্পের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে জনমত গঠনে আন্দোলনের জমি তৈরি করে। অদিবাসী মানুষরা অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকে। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে কার্যকর সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বন্ধ হয়ে যায় পাথর খাদান, ক্রাশার। এরকম অবস্থায় ২০১০-এর জুলাই-আগস্ট মাসে রামপুরহাটে মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। বলা হয়, মাসড়া পঞ্চায়েত এলাকার শালবাদড়া অঞ্চলের পাথরকল ও পাথরখনি শিল্পকে পরিবেশমুখী ও সমাজমুখী করে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে চালু করা হবে। শালবাদড়া এলাকার পাথরখাদান ও ক্রাশার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা এবং মাসড়া পঞ্চায়েত এলাকার ২০টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের গ্রামসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও বীরভূম আদিবাসী গাঁওতার সদস্যরা চুক্তিতে সম্মতি জানান। প্রসঙ্গত একই ধরনের চুক্তি হয় পাঁচামিতে। চুক্তির বয়ান পড়লে বোঝা যায়, আইন ও আদিবাসী সমাজের নিজস্ব ব্যবস্থা রীতিনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে এই চুক্তিতে সব পক্ষ সম্মতি জানিয়েছে।

চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হুবহু এখানে তুলে ধরছি—

> মাঝি হাড়ামের অনুমতি ছাড়া কোনো খাদান-ক্রাশারমালিক বা তাদের বহিরাগত কর্মচারী আদিবাসী গ্রামে ও আদিবাসীর বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। গ্রামের কোনও ব্যক্তিকে ঘুষ দিতে পারবে না বা অন্য কোনো সুবিধে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সামাজিক স্বার্থের বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। কোনওভাবে এরকম ঘটনা ঘটলে যৌথ কমিটির মাধ্যমে সেই খাদান বা ক্রাশার মালিককে এলাকা-ছাড়া করে দেওয়া হবে এবং সেই গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকার বদলালো, চুক্তির অধিকাংশ শর্তই মানা হল না। বীরভূমের খাদান বিরোধী আন্দোলন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আদিবাসী, মূলবাসী, অসংগঠিত শ্রমিকের নিজস্ব মোর্চা গড়ে তুলে বড় বড় রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

কুড়ি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা, কুলপি সহ একাধিক দ্বীপের শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলো নিয়ে কাজ করছে জন-সাংস্কৃতির সংস্থা। এঁরা বলেন, শ্রমজীবীদের উন্নয়ন বলতে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝায় না, তাঁদের বৌদ্ধিক চাহিদাকেও বোঝায়। অথচ আন্দোলন-কর্মীরাও অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্ব দেন না। অথচ বৌদ্ধিক অগ্রগতি না হলে নতুন চিন্তা আসবে কোথা থেকে? সমাজের চিন্তাশীল অংশই সমাজপরিবর্তন ঘটায়। শ্রমজীবীদের চিন্তা করার সুযোগ না দিলে তাঁরা সমাজপরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় থাকবেন কী করে? জনসংস্কৃতির দাবি, প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় শিল্পচর্চা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি তাদের দাবি, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ন্যূনতম চারজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অপারেশন করার পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। প্রসঙ্গত জনসংস্কৃতির থিয়েটার দর্শক ও অভিনেতারা সবাই শ্রমজীবী। তাঁরা সম্মিলিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেন থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। কলাকুশলী ও দর্শকদের আলাপচারিতায় একদিকে উঠে আসে সমস্যার গভীরতা আর অন্যদিকে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা। সমাধানের রাস্তা খোঁজার চেষ্টা।

একুশ : পঞ্চায়েত পরিকল্পনা, বাজেট, উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা গ্রামসভা মিটিং-এর মাধ্যমে। অধিকাংশ পঞ্চায়েত গ্রামসভার মিটিং ডাকে না। ডাকলেও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিয়ম মেনে এজেন্ডা করা হয় না। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলা হয় বটে, কিন্তু আসলে সিদ্ধান্ত পড়ে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পড়ে লিখে নেওয়া হয়। বাড়ি বাড়ি থেকে মিটিং এবং উপস্থিতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে, গ্রামসভা যে হয়েছে দেখিয়ে পদ্ধতি রক্ষার কাজ চলে। পঞ্চায়েতে গ্রামীণ নাগরিকের অধিকারগুলি নিয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে প্রায় ১১টি জেলার ৫০টির মত এনজিও সংগঠনের যৌথ মোর্চা 'পশ্চিমবঙ্গ জীবন জীবিকা সুরক্ষামঞ্চ'।

বাইশ : পশ্চিমবঙ্গে এখানে ওখানে অনেকগুলি মহিলাদের নিজস্ব সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যায়। এরকমই একটি সংগঠন 'প্রমীলা বাহিনী' বেশ উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে কুচবিহারের দিনহাটা ব্লকে। এই নারী সংস্থাটি মদের ঠেক ভেঙে

কার্যত এলাকার গুন্ডা, পুলিশের আঁতাতের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে চারপাশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। এছাড়া এনআরইজিএ-তে মহিলাদের কাজের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে। অবশেষে কাজের দাবি মান্যতা পায়। পাচার বিরোধী এবং পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে এরা নিয়মিত আন্দোলন সংগঠিত করে। বসিরহাটের হাসনাবাদে মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার ও শরিয়তে নারী-বিরোধী বক্তব্যের বিরোধিতায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম মহিলা আন্দোলন'।

তেইশ : কলকাতায় ফুটপাতবাসীদের সংখ্যা কত? এটি নির্ধারণে ২০১৩ সালে কলকাতা পুরসভা একটা সমীক্ষা করে, যাতে জানা যায় সংখ্যাটি ৩৪ হাজার। যদিও বেসরকারি সংগঠনের দাবি, সংখ্যাটা দেড় লাখের মতো। সম্প্রতি কলকাতার অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থা, পেশা ইত্যাদি নিয়ে একটি সমীক্ষা হয়, যে গবেষণায় বর্তমান প্রতিবেদক যুক্ত ছিলেন (শীঘ্রই রিপোর্টটি প্রকাশ হবে)। তার একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। সমীক্ষাটি হয়েছে, কলকাতার ৩৬টি এলাকায় ১৮৬৭টি বস্তিবাসী পরিবারে, ৭৬৪টি ঝুপড়ি পরিবার এবং ৩৩৫টি ফুটপাতে বসবাস করে এমন পরিবার। এদের মধ্যে ১৪৬ ধরনের পেশায় (কাজে) যুক্ত মানুষ পাওয়া গেছে। ৫৩.২ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন পরিচারিকার কাজ করেন। ৯১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। শহরে গরিব মানুষদের বাসস্থানের অধিকার, নাগরিক পরিচয়পত্র, অসংগঠিত শ্রমজীবীদের পেশাগত পরিচিতি এবং তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন বেশ কয়েকটি এনজিও সংগঠন, কলকাতার ২৬টি ওয়ার্ডের গৃহহীন মানুষদের সংগঠিত করেছে 'নবজাগরণ মঞ্চ'। যৌনকর্মী, হিজড়ে সহ একাধিক প্রান্তিক মানুষ এবং অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করে চলেছে বিভিন্ন সংস্থা, যে কাজগুলি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসাবে দেখা যায়। যেমন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার সংস্থা, ক্যালকাটা সামারিটান, তিলজলা শেড ইত্যাদি। এইসব সংগঠন আলাদা আলাদাভাবে একাধিক যুক্তমঞ্চ গড়ে তুলেছে যারা একসাথে গরিব মানুষদের অধিকার আদায়ে ব্রতী হয়েছেন।

এতক্ষণ ধরে যাদের কথা বললাম, তার বাইরেও অসংখ্য সংগঠন মানুষের কল্যাণে, অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে চলেছে। এখানে তাদের কথা উল্লেখ নেই মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, সেই জানা-অজানা সংগঠন-উদ্যোগগুলির কর্মকাণ্ডকে প্রতিবেদক উপেক্ষা করছেন বা সেগুলিকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করছেন। এমন ভুল যেন কেউ না করেন, তার জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এখানে যাদের কথা বললাম তাদের মধ্যে কয়েকটি সংগঠন-উদ্যোগ মোর্চা বাদ দিলে অধিকাংশই এনজিওদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এর অনেক ভালমন্দ দিক রয়েছে।

ভারতে সামাজিক আন্দোলনে এনজিও-রা প্রধানত তিনটি পর্বের মধ্যে দিয়ে চলেছে :

১) দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাষ্ট্রের সাথে অংশীদার হিসাবে ত্রাণ ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

২) কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রয়োজনে বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ;

৩) আর এখন ''অস্বস্তিকর অংশীদার' (uneasy partner) হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এবং বিদেশি অর্থগ্রহণ।

গরিব মানুষের উপর নানান নির্যাতন, বঞ্চনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গণতন্ত্রী, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রীরা প্রতিবাদে উদ্যোগী হবে, এটা ধরে নেওয়া যায়। বাস্তবে সেটা হল না। কোথাও সংগঠন-এর অনুপস্থিতি বা কোথাও নীতি-বিমুখতা বা কোথাও দিশাহীনতা— গোটা ব্যাপারটা পড়ে রইল অনাবাদি, অসংগঠিত হয়ে। আমি এখানে সারা দেশের আলোচনা করছি না। আমাদের রাজ্যের কথা বলছি। প্রশ্ন করা যায়, কেন বলুন তো পরিচারিকাদের সংখ্যা এত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও কোনো শ্রমিক সংগঠন তাদের সংগঠিত করতে এগিয়ে এল না? আজও পশ্চিমবঙ্গে এদের কোনো ইউনিয়ন নেই। একইভাবে বলা যায়, কাগজকুড়ানিদের কোনো ইউনিয়ন হল না। শহরে শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থানের অধিকার আন্দোলনের বিষয়ে কোনো শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন সেভাবে আন্দোলন গড়ে তুলল না। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। লক্ষণীয় হলো, একই কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ভিন রাজ্যের সংগঠন এই ধরনের পেশা বা শহুরে শ্রমজীবীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছে, দাবি আদায় করছে। এখানে সীমাবদ্ধতা বলুন বা দিশাহীনতা— এই ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এখানে প্রবেশ/অনুপ্রবেশ যাই বলি না কেন, এনজিও-রা সেখানে সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল আন্দোলন সংগঠিত করছে।

তবে মনে রাখতে হবে, এনজিও-দের আন্দোলন মানে সেটা একটা প্রজেক্টের অংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই দেখা যায়, অমুক ক্ষেত্রে প্রজেক্ট-এর সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন, যুক্তমঞ্চ বা কর্মকাণ্ড প্রায় সময় মাঝপথেই থমকে যায়। এখনও পর্যন্ত স্রেফ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় এই সব কর্মকাণ্ড-কর্মসূচি কোথাওই চালিয়ে যাওয়া যায় না। আবার অপেক্ষা, কবে আর একটা প্রজেক্ট আসবে, ফান্ড আসবে। ব্যতিক্রম আছে। যারা একটু বিষয়ী (হিসাবী) তারা টাকা তুলে রাখেন, যত দিন না আরেকটা প্রজেক্ট আসছে সেই সময় পর্যন্ত চালিয়ে যান— তবে তার সংখ্যা কম।

প্রশ্ন হল, ফান্ড ছাড়া কি কাজ চলে? আমাদের একটি সংস্থা আছে। বছরে প্রায় তিনলাখ টাকা খরচ, সদস্য/সহযোগীদের দানে খুবই কষ্টেসৃষ্টে চলে, সংগঠনের পদাধিকারীরা বা সক্রিয় কর্মীরা

পেশাগতভাবে অন্য কাজ করেন, অবসর সময়ে বা ছুটিছাটা নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে সদস্যরা সংগঠনটি চালান। এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য একটি বিকল্প যা পঁচিশ বছর ধরে চলছে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই সংগঠন সরাসরি কোন ক্ষেত্রে নিজে কাজ করে না। সহায়ক সংস্থা। গ্রামে/শহরে মানুষকে দিনে-রাতে সংগঠিত করার কাজ, আন্দোলনের কাজ— এগুলো অবসর সময়ে, নিজের নির্ধারিত সময়ে সীমাবদ্ধ রেখে করা যায় না ডকুমেন্টশন, আইনি সহায়তা, রিপোর্ট, পরামর্শ, অনুসন্ধান, সেমিনার, কর্মশালা, সভা— এসব হয়ত সহায়ক সংগঠনের সাহায্যে করা যায়। অধিকারের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত, করার কাজ সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে করতে হয় (অবশ্যই দুয়েক জন ব্যতিক্রম আছে) এবং সেক্ষেত্রে অর্থ প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো, এই দেশি/বিদেশি অর্থ সহায়তা আসে রাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে বা রাষ্ট্রের নানান কাজের প্রচারক হয়ে। এটা সবসময় প্রমাণ করা না গেলেও এই অর্থপ্রাপ্তির ওপর সেহেতু একাধিক মানুষের জীবনযাপন নির্ভরশীল সেখানে কোথাও একটা আপস থাকে। এখন সেই আপস সংগঠনে প্রভাব ফেলে অবশ্যই।

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক পাঁচ হাজারের মত এনজিও সংস্থা আছে। এদের কর্মী সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এরা কাজ করে প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি এদের ভিত্তি। এর উপর ভর করেই বেসরকারি দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়। এই সব কর্মীরা তাদের অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ন্যায্য মজুরি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৌদ্ধিক ও কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে চলেছেন। এদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সংস্থাগুলি হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশি বরাদ্দ অনুদান পেয়ে আসছে। অথচ দেখুন, এই সব এনজিও কর্মীদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম পারিশ্রমিকে এদের কাজ করতে হয়। না আছে শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, না আছে শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। যদিও কেউ কেউ এদের স্বেচ্ছাসেবী বলে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চনার পক্ষে সাফাই গান। এসব নানান সমস্যা, আপাত বিরোধ সত্ত্বেও এই সব এনজিও-রা অনেক ভাল কাজ করছেন। সরকারকে কল্যাণমূলক কাজকর্মে, স্কীম তৈরিতে চাপ সৃষ্টি করে, জনমত গঠন করে, প্রকল্প-অধিকারগুলি কার্যকর করতে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। আজকের বাস্তবতায় সেটাই বা কম কী? প্রশ্ন হলো, বিশ্বায়ন উন্নয়ন এসবকে প্রশ্ন করতে পারে যে অনুন্নয়নের শিকার গরিব মানুষ, অধিকার না পাওয়া মানুষ, তাদের সংগঠিত করে অন্তত এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তো গোটা সমাজটাকে এঁরা দাঁড় করাচ্ছেন, সামাজিক সংঘর্ষ ও শ্রেণী আন্দোলনের একটা বাস্তব অবস্থা তৈরি হচ্ছে।

লেখার শুরুতে অনেকটা জুড়ে শ্রমজীবী অধিকার-এর স্বপক্ষে বেশ কিছু সংস্থার কথা, তাদের কাজকর্মের কথা বলেছি। ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাজকর্ম নিয়ে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য করিনি। এই কারণ নয় যে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি ও ধরন নিয়ে আমি একমত। আমার বক্তব্য হলো, এই ধরনের 'ফান্ড' পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা বা দলহীন রাজনীতির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। তবু এটাই শেষ কথা নয়। সমাজে নানান স্তরে সংগ্রামের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, হয়ত জানার বাইরে অনেক কিছু অজানা বিষয় রয়েছে—

শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নির্মাণের ইতিহাস হয়ে উঠুক

পরাধীন দেশে শ্রমিকদের সমানাধিকারের কথা যখন বলা হয়েছে তখন তার ন্যায্যতাকে নিয়ে সমাজ প্রশ্ন তোলেনি, আজকের সমাজ শ্রমিকদের দাবির ন্যায্যকে নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। এলিটবর্গ যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে আছে, যারা চিন্তায়-মননে এগিয়ে, তারাও শ্রমিকের অধিকার নিয়ে যুক্তি তর্ক শানাচ্ছে।

বিশ্বায়নের নীতির ফলে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের কর্মসংকোচন ঘটেছে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিজেদের দেশের সরকারের অমানবিক নীতির ফলে একটা দুঃসহ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে তারা। আসলে একটা 'কাঠামোগত হিংসা'র শিকার তারা। এই রাষ্ট্রীয় হিংসা, মানুষগুলোকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, এও বড়ো কম অপরাধ নয়। মজুর মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, দর কষাকষি করতে পারবে না। ফুটপাথের ধারে থাকবে, রেললাইনের ধারে থাকবে (যতদিন না সেখান থেকেও উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়)। শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, এই শ্রমজীবী মানুষদের পুঁজির হাতের পুতুল করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

পুঁজি তার উৎপাদন-লাভ-মুনাফা, টিকে থাকার প্রতিযোগিতা এসবের প্রয়োজনে শ্রমিকের সংজ্ঞা বদলিয়েছে, নানান স্তরে বিভাজন করেছে। অন্যদিকে মজুর আর মজুরির পরিচয়ে শ্রমিককে আটকে রাখার দায় শ্রমিকসংগঠনগুলি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ক্রমশ সরকার ও নীতি নির্ধারণের গোটা ব্যবস্থাটাই শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নিয়ে জীবিকার নিরাপত্তা ছাঁটাই করে এদের ত্রাণ-নির্ভর করে তুলেছে। শ্রমিক আজ নিজের দাবিতে ঘুরে দাঁড়াতে ভুলে গেছে (কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে)। সম্মিলিত শ্রমিকদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার রাজনৈতিক উদ্যোগ যার পরিণতি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা, তাকে দলীয় রাজনীতি বা গোষ্ঠী রাজনীতি বা সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করে শ্রমিকদের শক্তিকে সংগঠিত পুঁজির আক্রমণের মুখোমুখী দাঁড় করাবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

এসবের পরেও একদল সহমর্মী, সহযোগী, সক্রিয় কর্মী আছেন যারা স্বপ্ন দেখেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করেন, সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই করেন। তাদের ওপর ভরসা রাখছি।

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন

ভারতের শহরের বুকে শ্রেণী সংগ্রাম

পার্থ সারথি রায়

গত কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরের বুকে এক লড়াই চলেছে। কখনও কখনও তা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছে মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় (এখন হয়ত যাকে বলা হয় 'ড্রয়িং রুম') কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তা থেকে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই সংগ্রামের সরব বহিঃপ্রকাশ আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি যেমন বেঙ্গালুরুর এজিপুরায়, যখন সেখানকার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বর্গের বাসস্থান (Economically weaker setions quarters) থেকে ২০১৩ জানুয়ারি মাসে ১৫০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। বা কলকাতায় যেখানে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে নোনাডাঙ্গার বস্তির থেকে উচ্ছেদ হওয়া ১৮০ পরিবার তার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘকালীন প্রতিরোধ সংগ্রামে নামেন। এই একই লড়াই ভারতে বিভিন্ন বস্তির মানুষেরা, তা মুম্বাইয়ের গোলিবারেই বা চেন্নাইয়ের কান্নাগিনগর যেখানেই হোক না কেন, লড়ছেন, এবং এই লড়াই আগামীদিনে ভারতের শহরের প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক প্রধান ভূমিকা পালন করবে। মৌলিক স্তরে, জবরদখল বনাম নগরোন্নয়ন, অধিকার বনাম সৌন্দর্যায়নের বিতর্কের আড়ালে, এই সংগ্রাম আসলে শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংগ্রাম শহরে শ্রমিকশ্রেণী বনাম বুর্জোয়ার মধ্যে সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রামের মূল বিষয় হল 'নগরের অধিকার' (right to the city)। যেহেতু ভারতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বৃহদাংশ ইতিমধ্যেই শহরে অবস্থিত ও এই সংগ্রাম ভারতের ভবিষ্যৎ শহরগুলির চরিত্র ও সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে, তাই এই সংগ্রাম আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'নগরের অধিকার'-এর ধারণা ও স্লোগানটি অঁরি লেফেভ্রে ১৯৬৮ সালে প্রথম উপস্থাপনা করেন। বিখ্যাত বামপন্থী ভৌগলিক ডেভিড হার্ভে ২00৮ সালে এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে 'নগরের অধিকার'-এর বর্ণনা করেন এইভাবে,

> নগরের অধিকার শুধুমাত্র নাগরিক সম্পদের উপর ব্যক্তি-অধিকারের থেকে অনেক বেশি, তা হচ্ছে নগরের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন করার অধিকার। শুধু তাই নয়, এই অধিকারটি ব্যক্তি-অধিকারও নয়, বরঞ্চ সমষ্টিগত অধিকার কারণ এই পরিবর্তন শুধুমাত্র সম্ভব সমষ্টিগত ক্ষমতার প্রয়োগের দ্বারা নগরায়ণের প্রক্রিয়াগুলির পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে। আমি বলতে চাই যে আমাদের শহরগুলি, ও আমাদের নিজেদের, পুনর্গঠনের অধিকার আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান, ও একইসাথে সবচেয়ে উপেক্ষিত, অধিকারগুলির মধ্যে একটি।

শহরের শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ও জীবিকার উপর পুঁজির লাগাতার আগ্রাসন ও চাপ শহরের বুকে শ্রেণীসংগ্রামের নিত্যদিনের পরিচয় বহন করে। এখন দেখা যায় যে, যখনই শহরের খেটে খাওয়া মানুষ এই 'নগরের অধিকারের' প্রয়োগের চেষ্টা করে, তখনই তা শহরের বুকে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে। তাই এজিপুরার বস্তি উচ্ছেদের ইতিহাস নোনাডাঙার বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাসের সাথে সমান্তরাল ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দুটিরই উৎস শহরের ক্ষমতাবান শ্রেণীর 'সুন্দর' ও 'উন্নত' শহর গড়ার স্বপ্নের মধ্যে, যে স্বপ্নের একটি আবশ্যিক অঙ্গ শহরে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমাগত শহরের আরও প্রান্তিক দিকগুলিতে ঠেলে দেয়। একদিকে এই শহরের শ্রমিকশ্রেণীই শহরগুলিতে চালানোর জন্য আবশ্যিক পরিকাঠামোগত পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে, অন্যদিকে তাদের দৈনন্দিন জীবন এই ক্ষমতাবান শ্রেণীর চক্ষুশূল এবং তাদের দ্বারা অধিকৃত শহরের জমিগুলিকে নগরের সৌন্দর্যায়নের প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলিকে দোকান-বাজার বা বাসস্থান বা তথাকথিত পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা এই শ্রেণীর শহর গড়ার স্বপ্নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই থেকে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়, তার কেন্দ্রে রয়েছে জমি, যা শহরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, বিশেষত ভারতের মত বেশি জনসংখ্যা ঘনত্বের শহরগুলিতে। তার থেকেও বেশি উল্লেখযোগ্য যে পুঁজিবাদের আজকের নয়া-উদারনৈতিক চরিত্রে, যেখানে উৎপাদনক্ষম শিল্পের চেয়ে জমিজমা ও পরিষেবার ব্যবসা ও তা নিয়ে ফাটকাবাজী উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের প্রধান পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে শহরাঞ্চলের জমি এই শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান ভূমিকা ধারণ করেছে। যেহেতু শহরের খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের শহরে অবস্থানের কারণে, এই মহামূল্যবান সম্পদের উপর নিজের অধিকার কায়েম করেছে তাই পুঁজির পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়েছে তাদেরকে এই জমি থেকে হঠিয়ে তাদের করায়ত্ত করার, এবং একই সাথে তাকে নগরোন্নয়ন ও নগরের পরিভাষায় ব্যক্ত করার। এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-জীবিকা ও বাসস্থানের উপর এই আগ্রাসনের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা এই ক্ষমতাবান শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

বেঙ্গালুরুর এজিপুরার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বর্গের বাসস্থানের ঘটনা এই প্রক্রিয়ার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এই প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ১৯৮৪ সালে এজিপুরায় প্রথম জমি বরাদ্দ করা হয় এবং এর লক্ষ্য ছিল যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, প্রধানত বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া শ্রমজীবী

মানুষের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থাযুক্ত সরকারি আবাসনের বন্দোবস্ত করা। এজিপুর তখন ছিল বেঙ্গালুরুর এক প্রান্তে, এবং বেঙ্গালুরুর পৌরসভা বারো বছর লাগায় ওই অঞ্চলে দেড় হাজার এক কামরার আবাসন তৈরি করতে। তিন তলার এই আবাসগুলিতে জল বা পায়খানার ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ এবং পৌরসভা শিশুদের স্কুল বা আবাসিকদের জন্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র— কোন কিছুরই ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু বিকল্পহীন বহু পরিবার এই অবস্থাতেই ওখানে থাকতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় বহু কাঠামাগত ত্রুটি রয়েছে ও সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দ্বারা নির্মীত। এইটি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, যখনই রাষ্ট্র সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জন্য তার সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখাতে যায়, তা করা হয় অত্যন্ত দায়সারাভাবে ও দুর্নীতির আশ্রয়ে। এর ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই এজিপুরার অনেকগুলি আবাসনে ফাটল ধরে ও ২০০৫ সালে অনেকগুলি ধ্বসে পড়ে যাতে তিনজনের প্রাণ যায় ও বহু মানুষ আহত হন। এরপর বেঙ্গালুরু পৌরসভা এই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে, যে কমিটি ৪২টি বাড়ির মধ্যে ২১টি ভেঙে ফেলার ও বাকিগুলিকে মেরামত করার রায় দেয়। কিন্তু বেঙ্গালুরু পৌরসভা সবকটি বাড়িকেই খালি করে সেগুলিকে ভেঙে ফেলে। বাড়িগুলির আবাসিকদের ওখানেই অস্থায়ী কিছু আস্তানায় থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে বাড়িগুলি নতুন করে নির্মাণ করে তাদেরকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। তখন থেকে গত আট বছরে কাবেরি দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কিন্তু সেই মানুষগুলি তাঁদের টিন ও বাঁশের চালাগুলিতেই থেকে গেছেন এবং অন্যদিকে ক্ষমতাবান শ্রেণী কৌশল করেছে কীভাবে তাদের থেকে ওই জমির অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যায়।

এদিকে গত এক দশকে বেঙ্গালুরুতে এবং জাতীয় ও বিশ্বস্তরেও অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। এর মধ্যে বেঙ্গালুরু ভারতের 'সিলিকন ভ্যালি' হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় ও বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির আকর্ষণ ও বিনিয়োগের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেহেতু শহরটি জমিব্যবসা ও নির্মাণশিল্পেরও এক কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে উঠেছে। বিমানবন্দর থেকে শহরে যাওয়ার ৩০ কিমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নতুন বিলাসবহুল বাড়ি ও অফিসের বিজ্ঞাপন দেখে যে কোন পর্যটকের মাথা ঝিমঝিম করবে। প্রতিটি বিজ্ঞাপনই সম্ভাব্য গ্রাহকদের তাদের একান্ত নিজস্ব একটি একটি 'আমেরিকা বা ইউরোপের খণ্ড' যোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এর ফলে বেঙ্গালুরুতে জমির মূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, সারা দেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্মীরা এসে বেঙ্গালুরুতে বসবাস করা শুরু করেছেন, সেহেতু শহরও দ্রুতগতিতে বিস্তারিত হয়েছে এবং আগে যেইসব অঞ্চল প্রান্তিক ছিল সেগুলি এখন তাদের বাসস্থান, দোকানবাজার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জমি ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যেহেতু এইসব বহুজাতিক সংস্থার কর্মীদের হাতে প্রচুর কাঁচাপয়সা আছে, এবং ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ, সেহেতু বেঙ্গালেরুর মানচিত্রের আজ প্রধান অংশ হচ্ছে এদের জন্য নির্মীত বিলাসবহুল বাড়ি, মল, মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল ইত্যাদি। এর জন্য শহরের জমির উপর জমি ব্যবসায়ী, নির্মাণ শিল্পের মালিক, নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা, হোটেল ইত্যাদি ক্ষমতাশীল শহুরে পুঁজিপতিশ্রেণীর আগ্রাসন বেড়েছে। তৃতীয়ত, এই ক্ষমতাবান শ্রেণীর স্বপ্নের দ্বারা চালিত হয়ে, এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির জায়গার চাহিদা মেটাতে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোদমে শহরের খেটে খাওয়া মানুষের থাকার আর কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত জায়গা পুনরুদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েছে। এবং তা করা হচ্ছে শহরের উন্নয়ন বা পুনরুজ্জীবনের নাম করে। এর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যেমন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)। এই প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করতে প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরে বিভিন্ন সংস্থার উৎপত্তি হয়েছে, যেমন বেঙ্গালুরুতে Bangalore Agenda Task Force (BATF) কিংবা কলকাতায় Kolkata Environmental Improvement Project (KEIP)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থকোষ জাতীয় বহুজাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির থেকে আসা টাকা এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় এবং এইভাবে বিশ্বায়িত পুঁজির সাথে এই প্রকল্পগুলির যোগসূত্র সংযুক্ত থাকে। শহরগুলির সৌন্দর্যায়ন বা পুনর্নবিকরণের বা নগরায়ণের পরিকাঠামো বানানোর লক্ষ্য নিয়ে গঠিত এই সংস্থাগুলির গত এক দশক ধরে প্রধান কাজ হয়েছে শহরের সাধারন্য (commons) জমির অধিকার থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে উৎখাত করে এবং তাদেরকে ক্রমাগত শহরের প্রান্তিক অবস্থানে এবং প্রান্তিক জীবনে ঠেলে দেওয়া। একইসাথে, যে শহুরে জমি শিল্পের মত উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হত, এবং হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান করত, সেই জমির উপর অবস্থিত শিল্পগুলিকে বন্ধ করে সেই জমিকে নির্মাণশিল্পের কাজে ব্যবহার করা, যেমন হয়েছে মুম্বাইয়ের ঐতিহাসিক বস্ত্র কারখানাগুলির ক্ষেত্রে বা কলকাতার সাউথ সিটি মলের ক্ষেত্রে। এককথায়, শহরের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এক লাগাতার আক্রমণ চলেছে। এই আক্রমণকে সুসংহত করতে বিভিন্ন আইনি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং শহরের 'লিবেরাল' জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য রাখতে একে বিভিন্ন উদার চেহারা দেওয়া হয়েছে।

এইসব ঘটনার প্রভাব পড়েছে এজিপুরার বস্তির হতভাগ্য মানুষগুলির জীবনে। গত প্রায় এক দশক ধরে যখন তারা

তাদের পূর্বতন বাসস্থানের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বাঁশ-টিনের চালাগুলিতে জীবন অতিবাহিত করেছে, তখন তাদের বস্তির চারপাশের এলাকা এক মূল্যবান আবাসিক ও বাণিজ্যিক অঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেহেতু এই জমি বস্তিবাসীদের থেকে 'পুনরুদ্ধার' করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই বেঙ্গালুরু পুরসভা এই জমি বেসরকারি নির্মাণ সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তাবের আহ্বান করে, যারা পিপিপি ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই জমিতে বস্তিবাসীদের জন্য আবাসন নির্মাণ করে দেবে। দুটি সংস্থা প্রস্তাব দেয়, এবং এক সুদীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মাভেরিক হোল্ডিঙ্গস এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস বলে একটি বৃহৎ নির্মাণ সংস্থা এই কাজের দায়িত্ব পায়। এই সংস্থাটি গরুড় মল বলে বেঙ্গালুরুর একটি বৃহৎ শপিং মলের অধিকারী ও এটির মালিক উদয় গরুড়চার এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুঁজিপতি। উদয় গরুঢ়াচার, যে একদিকে তৎকালীন শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য, অন্যদিকে রাজ্যের এক প্রাক্তন পুলিশ বড়কর্তার সন্তান, সেই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে যারা আজকে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণের পুরোধা। এইসব মাঝারি মাপের পুঁজিপতিরা আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ও এই সম্বন্ধকে ও সরকারি বদান্যতাকে কাজে লাগিয়ে এরা বড় মাপের পুঁজিপতি হওয়ার রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গেও পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাথে সম্পর্কযুক্ত এই শ্রেণির পুঁজিপতিদের, টোডি ও নেওটিয়ার মত যাদের বেশিরভাগই মারোয়ারি সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশেষ রমরমা হয়েছিল এবং এরা নিজেদের প্রতিপত্তিবলে বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তের উপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, এমনকি নিজেদের প্রয়োজনমতো আইন সংশোধনও করিয়ে নিতে পেরেছিল। অধুনা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ছত্রছায়ায় একইরকমভাবে আরেক দল পুঁজিপতির রমরমা বেড়েছে যারা আজ পশ্চিমবঙ্গের শহর ও শহরতলি অঞ্চলে সর্ববৃহৎ জমি-হাঙর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে এক বড় ভূমিকা পালন করছে সারদা গোষ্ঠীর মত শাসকদলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত কতগুলি চিটফাণ্ড সংস্থা, যারা এই জমি ব্যবসাকে নিজেদের বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র বানিয়েছে, এবং শহরের উপকণ্ঠে বহু জমি নামে-বেনামে দখল করে রেখেছে।

যাই হোক, ফিরে আসা যাক এজিপুরার কথায়। পুরসভার সাথে মাভেরিক হোল্ডিঙ্গসের যে পিপিপি (public private partnership) চুক্তি হয় তাতে দেখা যায়, যে ২২ একর জমি প্রথমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য আবাসন বানানোর জন্য নির্ধাপিত হয়েছিল, যার মধ্যে ১৭ একর জমির উপর মাভেরিক হোল্ডিংস একটি শপিং মল বানানোর অনুমতি পায় এবং বাকি মাত্র ৫ একরের উপর মূল বাসিন্দাদের জন্য আবাসন নির্মাণ করার কথা হয়। অর্থাৎ এই ঘটনা একটি সাধারণের জমির ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য হস্তান্তরের এক জঘন্য নিদর্শন। অন্যদিকে বাস্তব অবস্থা ছিল যে, যেইসব মানুষ প্রথমে এই আবাসনগুলিতে ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এই এক দশকের সময়কালে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন, কারণ এই সময়ে তাদের ওইখানে কোন জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ছিল না। সেহেতু ওই বস্তিতে বসবাসকারী অনেকেই পরবর্তী সময়ে ওখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, যারা বিভিন্ন স্রোতে বেঙ্গালুরুতে আসা অভিবাসী খেটে খাওয়া মানুষ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাড়ির কাজ, অটো ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালক, সুরক্ষা কর্মী বা রাস্তার ছোট দোকানি বা বিক্রেতা। মাভেরিক হোল্ডিংসের কোন পরিকল্পনাই ছিল না এদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করার, এবং তারা সম্ভবত পরিকল্পনা করেছিল ওই ৫ একরের উপর আবাসনটিকেও মুনাফা অর্জনের কাজে লাগাতে। একইরকম ঘটনা আগে মুম্বাইতে ঘটেছে। তাই এজিপুর বস্তিবাসী শ্রমজীবী মানুষ তাদের উচ্ছেদের এই পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করার রাস্তায় নামে, এবং এমনকি কর্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করে। কিন্তু যখন এক বছরের প্রতিরোধের পর ন্যায়ালয় মাভেরিকের পক্ষেই রায় দেয় তখন উদয় গরুঢ়াচার প্রশাসন ও পুরসভার সাথে তার সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে পুলিশ ও বুলডোজার দিয়ে দু'দিনের মধ্যে পুরো বস্তিটিকে ধ্বংস করে ৮০০০ মানুষকে রাতারাতি গৃহহীন করে। যেই প্রতিরোধ করে তাকেই মারধোর করে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের মধ্যে ছিলেন বেঙ্গালুরুর ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থার এক মহিলা গবেষকও, যিনি বস্তিবাসীদের প্রতি সংহতিতে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। ২০ জনকে বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত করা হয় এবং পরের দিন তাঁরা জামিনে মুক্ত হন। দুই দিনের মধ্যে ৮০০০ মানুষকে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই দলিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং যারা এক দশক ধরে ওইখানে থেকে বেঙ্গালুরুর অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন, তাঁদের উচ্ছেদ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে ফেলে দেওয়া হয়। বস্তিবাসীদের সাহসী প্রতিবাদের জন্য, এবং বিভিন্ন নাগরিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিবাদের জন্য, বেঙ্গালুরু পুরসভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে ১৫ কিমি দূরে সরজাপুর অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হবে যদিও এখনও সেখানে কেন ব্যবস্থাই নেই। বেঙ্গালুরুর বুকে শ্রেণীসংগ্রামের এই প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে খেটে খাওয়া মানুষের এই পরাজয় সত্ত্বেও এর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে ক্ষমতাবান শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের শক্তির উপর।

যারা কলকাতায় নোনাডাঙার বস্তিবাসীদের আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের কাছে এজিপুরার ইতিহাসের সাথে নোনাডাঙার সাদৃশ্য একাধারে চিন্তার কারণ ও বলের উৎস। চিন্তার কারণ যেহেতু এটি শহরের খেটে খাওয়া

মানুষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিগুলির— রাষ্ট্র, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল, উঠতি পুঁজি, বৃহৎ পুঁজি এ একশ্রেণীর জনমত— বিশালতা দেখায়। অন্যদিকে এই সাদৃশ্য বলের উৎস, কারণ এটি থেকে প্রত্যক্ষ হয় যে এই বিচ্ছিন্ন লড়াইগুলি আসলে ভারতের শহরের বুকে ঘটে চলা এক অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামেরই প্রতিফলন, যে লড়াইয়ে সমগ্র শহুরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ জড়িত। কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত নোনাডাঙা অঞ্চলটিও নির্ধারিত হয়েছিল শহরে বসবাসকারী গরিব মানুষদের বাসস্থানের জন্য, বিশেষত সেইসব মানুষ যারা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বস্তি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সৌন্দার্যায়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রক্রিয়ায়। নোনাডাঙা অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের এই বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছিল এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পয়সায় চালিত Basic Services for the Urban Poor (BSUP) প্রকল্পের আওতায়। এই প্রকল্পের অধীনে কেএমডিএ ওই অঞ্চলে এইসব উচ্ছেদ হওয়া মানুষের জন্য এক কামরার আবাসন বানিয়ে দেয় এবং ৮-১০ জনের এক-একটি পরিবার এইসব আবাসনে থাকতে আরম্ভ করে। স্কুল বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মত কোন ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও ওই অঞ্চলে করা হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন ওইখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছে, আরও বহু শ্রমজীবী মানুষ, তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে, কিংবা জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসে ও অঞ্চলের বিভিন্ন ফাঁকা পড়ে থাকা জায়গায় ছোটখাট চালা বেঁধে সংসার পেতেছে এবং জীবিকা নির্বাহ করছে। এই মানুষেরা শহরের শ্রমিকশ্রেণীর একবড় অংশের প্রতিভূ, ট্যাক্সি চালানো থেকে নির্মাণকার্য অবধি শহরের বিভিন্ন অ-প্রথাগত শ্রমের ক্ষেত্রে যুক্ত। নিজেদের শ্রেণী সচেতনায় এরা নিজেদের বসতি দুটির নাম দেয় শ্রমিক কলোনি ও মজদুর পল্লী। গত বছর পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পরিচালনাধীন কেএমডিএ আপাতদৃশ্যভাবে আর্থিক অনটনের কারণে আবাসন নির্মাণের ভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পিপিপি ব্যবস্থার অধীনে এই নির্মাণ ব্যবসায়ী ওই জমির বেশিরভাগ অংশই বাণিজ্যিক কারণে, অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের জন্য, ব্যবহার করতে পারবে। এই পিপিপি প্রকল্প শুরু করার আগে, এবং জমিটি এই বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে কেএমডিএ এই জমিচে বসাবাসকারী সকল মানুষকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করে, এবং এই মানুষদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে অভিহিত করে। সেহেতু গত বছর মার্চ মাসের শেষে পুলিশ বুলডোজার দিয়ে নির্মমভাবে ওইখানে বসবাসকারী ১৫০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়, এবং তাদের ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওখানে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত হয়ে অনেকগুলি রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনের সাহায্যে এক বিরুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে, পুলিশের লাঠিচার্জ ও বহুসংখ্যক গ্রেপ্তার ও কারাবাস সহ্য করেও ওই জমিটির উপর নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে। গত এক বছর ধরে, সরকারের বিভিন্ন কৌশল ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতামন্ত্রীদের চোখরাঙানি স্বত্তেও তাদের থেকে সেই জমিতে বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যায়নি। সরকার ও শাসক দল সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করেছে, জমিটিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়ে বসবাসের অযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য একদিকে ঘরের প্রলোভন ও অন্যদিকে প্রাণের ভয় দেখানো হযেছে। কিন্তু ওখানকার বাসিন্দা শ্রমজীবী মানুষ, আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন বিভেদের জন্য দুর্বল হলেও, পুলিশ অত্যাচার ও শাসক দলের গুণ্ডামি অগ্রাহ্য করে, শহরের ক্ষমতাবান শ্রেণীস্বার্থের সামনে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ হিসাবে থেকে গিয়েছেন। এই লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারিত হবে প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর ঐক্যের দ্বারা।

এজিপুর ও নোনাডাঙা শহরকেন্দ্রিক শ্রেণীসংঘাত ও প্রতিরোধের একই বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। এই একই সংঘাত ঘটে চলেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শহরে ও আধাশহরে, এই সময়ই মুম্বাইয়ের গোলিবার আর অন্যান্য বস্তির বাসিন্দা শ্রমজীবী মানুষ তাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও সরকার ও এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্থ নির্মাণ ব্যবসায়ীর মধ্যে অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। মুম্বাইয়ের মানখুর্দ অঞ্চলের আগরওয়াড়ী বস্তির উৎখাত হওয়া মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন টাটা সমাজ বিজ্ঞান সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা, যার জন্য তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পুলিশের কাজে বাধাধানের অভিযোগে। প্রতিটি জায়গাতেই পুঁজির আক্রমণের শিকার এই মানুষগুলির শ্রেণী তাদের পরিচয়ের সাথে মিলে যায় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা দলিত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা শহরের বিরাট অ-প্রথাগত শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এজিপুরার বেশিরভাগ মানুষ হলেন দলিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। নোনাডাঙ্গার বেশিরভাগ বাসিন্দা ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা তপশিলী জাতির মানুষ, আগরওয়াড়ী বস্তির উৎখাত হওয়া মানুষেরা ছিলেন কর্ণাটকের বুড়িয়া জঙ্গম ও অন্ধ্রপ্রদেশের মাসানযোগী আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক যারা মুম্বাইয়ের মোরারজী মিলে কাজ করার জন্য এসেছিলেন। এবং প্রতিটি জায়গাতেই এই প্রতিরোধের সামনের সারিতে রয়েছেন মহিলারা, কারণ তাঁরাই দেখেছেন যে তাঁদের ছোট সংসার, জীবনের সকল স্বপ্ন ও আশা, সরকারি বুলডোজারের সামনে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ভারতের শহর জুড়ে চলা এই শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এখন প্রয়োজন তা হচ্ছে এইসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে

এক দেশব্যাপী জোট-গঠনের, যা এই সংঘাতের মৌলিক শ্রেণীগত রূপের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই করতে হবে। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে, বেশিরভাগ সংগঠন ও রাজনৈতিক কর্মীদের দৃষ্টি রয়েছে গ্রামাঞ্চলের উপর, যেখানে জাতীয় ও বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থানের স্বার্থে বৃহদাকারে জমি দখলের ও উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই সময়েই, শহরের বুকেও জমি নিয়ে, নগরের অধিকার নিয়ে, সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে। আসলে গ্রামাঞ্চলের ও শহরের এই সংঘাত অর্থনীতি ও শ্রেণীগতভাবে পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই অবস্থার জন্ম দিয়েছে গত দু'দশক ধরে চলা আসা নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের রাজনীতি। গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রতিসারণের কারণে কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার ফলে বহু মানুষের ক্ষেত্রেই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ গ্রাম ছেড়ে জীবিকার খোঁজে শহরে চলে আসছেন। এই অভিবাসই আজ গ্রাম ভারতের প্রধান চিত্র। এই লক্ষ লক্ষ মানুষ শহরে এসে অ-প্রথাগত শ্রমিকদের বাহিনীতে যোগদান করছেন, ও শ্রমের মজুত বাহিনীকে পুষ্ট করে পুঁজিপতিদের লাভের হার বজায় রাখছেন। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বতন গৃহমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ৬০ শতাংশ মানুষকে শহরে বসবাসকারী হিসাবে দেখার কথা বলেছেন। আর তাঁদের প্রধান কার্যক্ষেত্র হচ্ছে নির্মাণশিল্প, কারণ গত এক দশকে একমাত্র এই ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে। বৃহৎ শিল্পে প্রায় কোন কর্মসংস্থান না হওয়ার জন্যে অতীতের মতো শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমিক কলোনি গড়ে উঠছে না। সেহেতু এইসব মানুষ যখন শহরে আসছেন, তাঁদের থাকার জায়গা হচ্ছে শহরের সাধারণ জমি ও বস্তিগুলি, যেগুলি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এই অবস্থার বর্ণনা করে মাইক ডেভিস তাঁর 'প্ল্যানেট অফ স্লামস' গ্রন্থে লিখেছেন যে উন্নয়নশীল দুনিয়ায় শহরবাসীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশের বেশি মানুষ বস্তিতে বাস করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান শ্রেণীর 'উন্নয়নের' স্বপ্ন সফল করার জন্য ও পুঁজির উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য শহরের এই জমির দরকার। সেহেতু ভারতের শহরের বুকে এক দুষ্ট চক্রের জন্ম হয়েছে, গ্রামের মানুষ কৃষিভিত্তিক জীবিকা হারিয়ে দলে দলে শহরে আসছেন, শহরে এসে নির্মাণ ও অন্যান্য সরকারি শিল্পে যোগ দিচ্ছেন, শহরের মধ্যে বস্তিতে বসবাস করা শুরু করছেন, সেই বাসস্থান থেকে উৎখাত হচ্ছেন যখন বস্তির জমি নির্মাণ শিল্পের ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে। তারপর শহরের আরও প্রান্তে গিয়ে নতুন করে সংসার পাতছেন, আবার কিছু বছর বাদে শহর বিস্তারের কারণে সেখান থেকেও উচ্ছেদ হচ্ছেন। এই চক্র শহরের বুকে শ্রেণীসংগ্রামকে সংজ্ঞায়িত করে, ও গ্রামাঞ্চলের সংঘাতের সাথে এর যোগসূত্র স্থাপন করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা এই যোগসূত্রটি উপলব্ধি করে এবং আশঙ্কা করে যে শহরাঞ্চলের এই লড়াই দেশ জুড়ে হতে থাকা পুঁজিবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সাথে জুড়ে যেতে পারে। এই কারণেই তারা প্রতিটি শহুরে লড়াইয়ের মধ্যে বিপ্লবী অতিবাম শক্তির ভূত দেখে। যেহেতু তাদের শত্রু এই সংগ্রামের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাই আজ শ্রমিকশ্রেণীর ও তাদের সমর্থনে দাঁড়ানো বৈপ্লবিক শক্তিগুলির ক্ষেত্রেও এই উপলব্ধি প্রয়োজন ও এই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে আগামীদিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সচেতনতা বা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। সিপিআই(এম)-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক বামদলগুলি বিভিন্ন বস্তিতে বস্তি কমিটি গঠন করে, কিন্তু সেগুলিকে নিজেদের নির্বাচনী কাজে লাগানোর দিকেই তাদের প্রবণতা বেশি। সেহেতু অনেক সময় এই বস্তি কমিটিগুলিকেই কাজে লাগানো হয় বস্তিবাসী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ভাঙার কাজে। অনেক সময় এই কমিটির নেতারা বিভিন্ন ডেভেলপার বা কোম্পানির দালাল হিসাবেও কাজ করে। তাই বস্তিবাসী মানুষের এদের প্রতি কোন আস্থা নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন নকশালপন্থী বাম সংগঠনগুলি বস্তির শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে মাঝেমধ্যে আন্দোলন সংগঠিত করলেও,বা উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেও, এই বিষয়ে তাদের কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে তারা বস্তিবাসীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দলের জন্য কিছু কর্মী তৈরি করতেই বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়। অনেক সময় এই কর্মীরা দক্ষ সংগঠকের পরিচয় দিলে তাদের বস্তি থেকে তুলে নিয়ে অন্য ক্ষেত্রে, যেখানে পার্টির আগ্রহ বেশি বা শক্তি বেশি, সেখানে নিয়োগ করা হয়। তার ফলে অনেক সময় বস্তির মধ্যে অঙ্কুরিত সংগঠনটি মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, অনেক সময়ই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এনএপিএম (NAPM) জাতীয় গণ আন্দোলনকারী সংগঠন বা শহরের বুদ্ধিজীবী আর ছাত্রছাত্রীদের এক অংশ। কিন্তু এর দ্বারা বহু এনজিও (NGO) এই আন্দোলনগুলিতে ঢুকে পড়ছে এবং এই আন্দোলনগুলির এনজিও-করণ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে আজ বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াই অনেক সময়ই ধ্রুপদী মার্কসবাদী মতে 'শপ ফ্লোরে' (কারখানার মাটিতে) গড়ে তোলা সম্ভব নয়, কারণ শ্রমের অসংগঠিকরণের কারণে অনেক সময় 'শপ ফ্লোরে'র অস্তিত্বই থাকছে না। তাই শহরের বুকে এই বস্তিগুলির শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আজ পুঁজিবাদ-বিরোধী লড়াই-এর এক প্রধান ক্ষেত্র, যা একদিকে শহুরে শ্রমজীবী মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, অন্যদিকে পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য ও অসাফল্যের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ভারতে ভূমি-বিদ্রোহ— বিস্তার এবং সীমাবদ্ধতা

প্রণব দে

সভ্যতার বিস্তার আর জমি লুণ্ঠন, এই দুটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। জমি মানেই খাদ্য সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং রাজস্ব। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূমিসম্পদ, জলসম্পদ, অরণ্যসম্পদ সভ্যতার নির্মাণযজ্ঞে নিয়ত আহুতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সভ্যতা বিস্তারের স্থান নিয়েছে উন্নয়ন। আধুনিক এই উন্নয়ন পর্বে বায়ুসম্পদও বুঝি আর সাধারণের অধিগত থাকছে না। এমন দিন হয়ত সমাসন্ন, যখন বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য কর্পোরেট সংস্থার উপর নির্ভর করতে হবে।

অপরদিকে জমি কোটি কোটি মানুষের আশ্রয়, বেঁচে থাকার অবলম্বন। কৃষিভূমি, জলাভূমি, চারণভূমি, বনভূমি— নানারূপে ভূমি পৃথিবীর ২০০ কোটি মানুষের আশ্রয়। ভারতেরও কমবেশি পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ ভূমি-আশ্রয়ী। আশ্রয় অর্থে বাসস্থানের আশ্রয়, জীবিকার আশ্রয়, পরিবেশের আশ্রয়। ভূমি আগ্রাসন এই আশ্রয় থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে। কাজে কাজেই ভূমি-আশ্রয়ীদের সঙ্গে ভূমি-আগ্রাসীদের সংঘর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে অনিবার্য ঘটনা হিসাবে বারে বারে ফিরে এসেছে।

অষ্টাদশ শতকে পশ্চিমা ধনতন্ত্র ভূমি-আগ্রাসনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব বৃহতের গর্ভে বিলুপ্ত হলো। ক্ষুদ্র জোত, কৌম-ভূমি, সাধারণের অধিকারভুক্ত জমি— সব কিছুই বৃহৎ মালিকরা কুক্ষিগত করতে শুরু করে। ইওরোপে 'জমি ঘেরাও' প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান করা হয়। কার্ল মার্কসের ভাষায়,

> ...সম্পত্তির জবরদস্তি দখল ও সাধারণত সেই সঙ্গে আবাদ জমির চারণভূমিতে রূপান্তর শুরু হয় ১৫শ শতকের শেষে ও চলতে থাকে ১৬শ শতকের সময়েও। কিন্তু সে সময় প্রক্রিয়াটা চলছিল ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগ মারফত, আইনসংস্থা যার বিরুদ্ধে ১৫০ বছর ধরে ব্যর্থ লড়াই চালায়। ১৮শ শতকে যে অগ্রগতিটা ঘটল সেটা প্রকাশ পায় এই ব্যাপারে যে জনগণের ভূমি অপহরণে এখন আইন নিজেই হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও বড়ো বড়ো খামারীরা সেই সঙ্গে নিজেদের স্বকীয় পদ্ধতিরও আশ্রয় নিত। ...এ দস্যুতার পার্লামেন্টারী চেহারা হল সার্বজনীন জমি ঘেরাওয়ের আইন, অন্য কথায়, জনগণের জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে জমিদারদের দান করার জন্য ডিক্রি, জনগণকে উচ্ছেদের ডিক্রি। ...সংসদীয় দস্যুতা হলো সাধারণের জমি ঘেরাও করা, অন্য কথায় ডিক্রি যার জোরে জমিদাররা সাধারণের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নিজেদের অনুকূলে মঞ্জুর করে, জনগণকে নিঃস্ব করার ডিক্রি।[১]

এই দস্যুতার পথ ধরেই ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ সম্পদ সংগ্রহ করেছে এবং এ দস্যুতার বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বাভাবিক প্রতিরোধও প্রথমাবধি বর্তমান। একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দমন করে ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ তার পথ পরিষ্কার করেছে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকাতেও স্থানীয় অধিবাসীদের নিকেশ করে, তাদের জমি-জিরেত দখল করে ধনতন্ত্রের পদযাত্রা শুরু হয়। আমেরিকার সংবিধানেও ''ন্যায্য ক্ষতিপূরণের'' বিনিময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক পরসম্পদ হরণ বৈধ ঘোষণা করা হলো। আমেরিকার আদিবাসীরা ক্ষতিপূরণ কী পেয়েছিল জানা নেই, তবে 'দস্যুতার' বিরুদ্ধে সাধ্যমতো প্রতিরোধের পরেও তারা তাদের প্রায়-অবলুপ্তি ঠেকাতে পারেনি।

এশিয়া-আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি উপনিবেশে পরিবর্তিত হওয়ার পর, এইসব দেশগুলির অধিবাসী-আদিবাসীরাও ক্রমে নিজদেশে পরবাসী হতে শুরু করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কার্ল মার্কস ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

> ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে। একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক— পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং *এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রচেষ্টা*।[২] (গুরুত্ব আরোপ লেখকের)।

১৮৫৩ সালে মার্কস-এর এই মন্তব্যের ৬০ বছর আগেই ভারতের দেশীয় ভূমি-কাঠামো ভেঙে দিয়ে ইংরেজরা পাশ্চাত্য ছকে নয়া জমিদারি ব্যবস্থার সূচনা করেছে। উদ্দেশ্য ছিল, রাজস্বের মাধ্যমে জমি থেকে উদ্বৃত্ত আদায় নিশ্চিত করা। গ্রাম সমাজের কাঠামো তখন থেকেই ভাঙতে শুরু করে। এদেশের জল-জমি-জঙ্গল দখলকে বৈধতা দানের জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রচলন করা হয়, তা মার্কসের ভাষায় বলা যেতে পারে, ''এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রচেষ্টা''। আর এই 'বৈষয়িক ভিত্তি'-র মূল কথা হলো, সাধারণের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রকর্তৃক বেদখল এবং সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির পণ্যায়ন। জঙ্গলে যুগ যুগ ধরে বসত যাদের, তারা সরকারি বিধানে চিহ্নিত হলো অনুপ্রবেশকারী রূপে আর জঙ্গলের কাঠ চলে গেল ইজারাদারের দখলে। কৌমভূমি, জলাভূমি— যা ছিল ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ, তাও রাতারাতি পরিণত হলো সরকারি সম্পত্তিতে। দেশের যাবতীয় সম্পদ মালিকানা-ভুক্ত করা ঔপনিবেশিক আইনের অপরিহার্য অঙ্গ, তাতে কেনাবেচার সুবিধা হয়। ভারতে এভাবেই শুরু হয় ''সংসদীয় দস্যুতা''।

২

রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যের সম্পত্তি জবরদখল অনুমোদন পেয়েছিল eminent domain বা সার্বভৌম অধিকার তত্ত্বের মাধ্যমে। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ বিচারপতি হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius) ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন,

> প্রজাদের সম্পত্তি, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বলে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ফলত রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, কেবল প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে নয় ...জনগণের সুবিধার্থেও, সেই সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং মনে করা হবে, রাষ্ট্রিয় কর্তারা চাইছেন, জনগণের সুবিধার্থে ব্যক্তিগত সুবিধা সমর্পিত হোক। ...কিন্তু সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সরকারি খরচে, যারা সম্পত্তি হারিয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ করতে হবে এবং যিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তিনিও প্রয়োজনে, এই বাবদ সাধারণ কর প্রদান করবেন।[৩]

সোজা কথায়, রাষ্ট্র বা সরকার তার সার্বভৌম ক্ষমতাবলে 'জনস্বার্থে' যে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে, জবরদস্তি অধিগ্রহণ করতে পারে। জনস্বার্থের সংজ্ঞা রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে। এই এমিনেন্ট ডোমেইন থিয়োরিই দেশে দেশে জমি অধিগ্রহণের নীতি। ভারতবর্ষে ইংরেজরা ১৮২৪ সাল থেকে এই নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে এবং অবশেষে ১৮৯৪ সালে যে জমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়ন করে, তা 'সংসদীয় দস্যুতা'র আর এক নিদর্শন বললে অত্যুক্তি করা হবেনা।

সংসদীয় দস্যুতা বলার কারণ, শুরু থেকেই এই আইনের প্রধান সুবিধাভোগী বৃহৎ এবং কর্পোরেট পুঁজি। শুরু থেকেই তাই কৃষক তথা ভূমিজীবীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

৩

ঘটনাচক্রে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ভারতে কৃষকদের সঙ্গে প্রথম সংঘাতটা হয় টাটা কোম্পানির। পুনের কাছে মুলসি পেটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে দশ সহস্রাধিক কৃষকের জমি নিমজ্জিত করে বৃহৎ পুঁজির মুনাফালোভী প্রকল্পকে সাধারণ মানুষ জনস্বার্থ বলে মেনে নিতে পারেনি। তীব্র দমন-পীড়নের মাধ্যমে কৃষকদের সত্যাগ্রহ (১৯২০-২৪) বৃটিশরাজ দমন করে।

অন্যের বা সাধারণের সম্পদ গ্রাসের মাধ্যমে পুঁজির পুঞ্জীভবনের এই প্রক্রিয়া আদিতে যেমন ছিল, অন্তেতেও তাই। নব্বই দশকের বিশ্বায়ন এই প্রক্রিয়াকে আরও সংহত, আরও ত্বরান্বিত করেছে। নিত্যনতুন ক্ষেত্র পুঁজির খাদ্যে পরিণত হচ্ছে। ২০০৩ সালে তাঁর "নয়া সাম্রাজ্যবাদ" বইতে ডেভিড হার্ভে লিখছেন,

> মার্কস পুঁজির আদি সঞ্চয়ের যা যা বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূগোলে এখনও প্রবলভাবে উপস্থিত। বিগত তিন দশকে মেক্সিকো ও ভারতের মতো দেশে কৃষক জনসাধারণের বিস্থাপন এবং ভূমিহীন সর্বহারা শ্রেণীর গঠন ত্বরান্বিত হয়েছে। কৌম সম্পদের অনেক উৎস, যেমন জল, (প্রায়শ বিশ্ব ব্যাঙ্কের নির্দেশে) ব্যক্তিমালিকানাধীনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং পুঞ্জীভবনের পুঁজিবাদী পথে, উৎপাদনের ভিন্নতর প্রক্রিয়া ও তার ব্যবহার (দেশীয় এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনও) নিরুদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় শিল্পসংস্থাগুলি বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। পারিবারিক কৃষির স্থান নিয়েছে কৃষি-বাণিজ্য। এবং দাসত্ব অন্তর্ধান করেনি (বিশেষত যৌন ব্যবসায়ে)।

পুঁজির এই ধারাবাহিক উৎপীড়নে ঠিক কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তা বলা কঠিন। ওয়াল্টার ফার্ণান্ডেজ জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পরে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, মোটামুটি পঞ্চাশ বছরে ছয় কোটি মানুষ উন্নয়ন যজ্ঞে বিস্থাপিত হয়েছে। ৭০ লক্ষ হেক্টর বনভূমি এবং ৬০ লক্ষ হেক্টর কৌম জমি সহ মোট জমি গেছে ২.৫ কোটি হেক্টর।[৪]

স্বাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের সম্পদ সবটাই যে কর্পোরেট এবং ব্যক্তিপুঁজি সরাসরি গ্রাস করেছে, তা তো নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'আধুনিক ভারতবর্ষের মন্দির' তথা বাঁধ নির্মাণে সর্বাধিক মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে। খনি নির্মাণে উচ্ছেদ হয়েছে ২৫/৩০ লক্ষ মানুষ। কিন্তু এই উচ্ছেদ উচ্ছিন্ন মানুষকে কোনো সুফল এনে দিতে পারেনি। বৃহৎ বাঁধ নির্মাণে মানুষকে যত মূল্য দিতে হয়েছে, সেই তুলনায় সমাজের বৃহত্তর অংশ প্রতিদান বেশি কিছু পায়নি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির সুবিধা নিয়েছে বৃহৎ পুঁজি আর এখন বিশ্বায়নের অর্থনীতির যুগে পুরো উদ্যোগটাকেই তারা গিলে ফেলছে।

৪

পুঁজিবাদী ব্যাখ্যায় আধুনিক যে উন্নয়ন পর্ব চলছে, সেখানে পুঁজির বাহু অক্টোপাসের মতো বহুধা বিস্তৃত। *সেজ*, বাঁধ, রাস্তা, খনি, জৈব জ্বালানি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নয়ন গ্রাস করেছে ৬৫ লক্ষাধিক হেক্টর জমি। ভবিষ্যতে গ্রাস করার পরিকল্পনা রয়েছে আরও প্রায় ১.৮০ কোটি হেক্টর জমি, সব মিলিয়ে ২.৫ কোটি হেক্টরের কাছাকাছি। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে কম করেও ৭০ লক্ষ মানুষ সম্পদচ্যুত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুঁজি এই পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়ন করতে পারছে না, কারণ ভারতীয় জনতার মরিয়া প্রতিরোধ। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চলছিলই। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট— ভারতের প্রায় সর্বত্র *সেজ* (SEZ) বিরোধী এবং জমি অধিগ্রহণ বিরোধী যে তীব্র আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় চলমান লুণ্ঠনের গতি, কিছুটা হলেও, মন্দীভূত হয়েছে। কোথাও চলতি প্রকল্প স্থগিত হয়েছে, কোথাও

বাতিল হয়েছে, আবার কোথাও পুলিশি নিপীড়ন, রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস আন্দোলনকে দমিত করেছে। এই আন্দোলনগুলির চাপেই শতাব্দী প্রাচীন অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট লুঠ মঞ্জুর করার নীতি থেকে সরকার সরে আসেনি বা কর্পোরেট উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও ছেদ পড়েনি।

৫

১৯৯১ সালে ভারতে নয়া-উদারনীতি কার্যকর হওয়ার পর, রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে সংরক্ষিত ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। উড়িষ্যা— প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের পূর্ব উপকূলের এক রাজ্য। উদারীকরণের প্রথম সুযোগেই বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে এই রাজ্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ১০০ কোটি টন বক্সাইট (এ্যালুমিনিয়ম আকরিক) সমৃদ্ধ উড়িষ্যার দক্ষিণপ্রান্তে রায়গড়, কোরাপুট, কালাহান্দি অঞ্চল প্রাথমিকভাবে হয়ে ওঠে বৃহৎ পুঁজির লক্ষ্যস্থল। মুখ্য খেলোয়াড় ছিল হিন্ডালকো (আদিত্য বিড়লা গ্রুপ) এবং আলকান (কানাডা) কোম্পানীর যৌথ সংস্থা উৎকল এ্যালুমিনা ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (ইউএআইএল), স্টারলাইট, লারসেন-টুবরো, বেদান্ত প্রভৃতি। উড়িষ্যা সরকার আদিবাসী অধ্যুষিত জমিগুলি বৃহৎ কোম্পানিগুলির হাতে সঁপে দেয় এবং শুরু হয় মূলবাসীদের বিতাড়ন পর্ব। বলাবাহুল্য, সরকার জমি হস্তান্তরের বিষয়ে অধিবাসীদের মতামত নেওয়ার কোনো প্রয়োজনও বোধ করেনি।

বিস্থাপনের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সাল থেকে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে এবং সরকার গ্রামবাসীদের দাবি যথারীতি উপেক্ষা করে। শুরু হয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, বিক্ষোভ, জমায়েত এবং পথ অবরোধ। 'বাপহলি মালি সুরক্ষা পরিষদ', 'প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা পরিষদ', 'আঞ্চলিক সুরক্ষা পরিষদ' এবং আরও কয়েকটি গণসংগঠন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করে একযোগে আন্দোলন চালাতে থাকে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মধ্যপ্রদেশে তখন 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' চলছে। নর্মদা আন্দোলনের নেতৃত্ব, এনএপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে উড়িষ্যার সংগঠনগুলির স্বাভাবিক ভাবেই সংযোগ স্থাপিত হয়।[৫] কোম্পানির পোষা গুণ্ডাবাহিনী আসরে নামে। পুলিশ চোখ বুজে থাকে। আন্দোলনকারীদের মিথ্যা অভিযোগে ধরপাকড় শুরু হয়। সাহস পেয়ে মস্তান বাহিনী মেয়েদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। মেয়েরা হাটে-বাজারে এমনকি নদীর ঘাটে পর্যন্ত যেতে সন্ত্রস্ত বোধ করতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতনও চরমে ওঠে।

১৯৯৯ সালে শাসক বিজেডি দলের বিধায়ক বিভীষণ মাঝির নেতৃত্বে বিজেপি, কংগ্রেস, বিজেডি 'সর্বদলীয় কমিটি' গঠন করে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সমর্থনে প্রচার করতে শুরু করে। অবশ্য ইতিমধ্যে কাশিপুর আন্দোলন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সমর্থন পেতে শুরু করেছে। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও পুলিশি নির্যাতনের সমালোচনা করতে শুরু করে। 'সর্বদলীয় কমিটি' অচিরেই বুঝতে পারে, তাদের পিছনে জনসমর্থন নেই। বিপরীতে খনি-বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশগুলিতে পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষের জমায়েত শাসকশ্রেণীর ঘুম কেড়ে নেয়।

১৫ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে স্থানীয় মাইকানছ গ্রামে প্রতিবাদীদের এক সভা চলছিল। আসন্ন 'চাক্কা জ্যাম' এবং অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে সভায় আলোচনা চলছিল। 'সর্বদলীয় কমিটি'র বিজেডি নেতা ভাস্কর রাও ও তার দলবল গ্রামে ঢুকে জোর করে সভা বানচাল করার চেষ্টা করে। জনতা তা প্রতিরোধ করে। পরের দিন ১৬ ডিসেম্বর, 'আইন-শৃঙ্খলা' রক্ষা করতে দুই প্লেটুন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে এবং পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপনকারী পুরুষদের সন্ধান পাওয়ার জন্য মেয়েদের উপর অত্যাচার শুরু করে। মেয়েদের উপর অত্যাচারের খবর পেয়ে নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা যখন পাহাড় থেকে নামতে শুরু করে, পুলিশ তাদের দেখা মাত্রই গুলি চালায়। ১৮ বছরের তরুণ রঘু ঝড়িয়া, ২৫ বছরের যুবক অভিলাষ ঝড়িয়া, ৪৩ বছরের জামুধর ঝড়িয়া পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[৬] সরকার নির্বিকার এবং নির্লজ্জ। ২৯ ডিসেম্বর ২০০০, সরকার হঠাৎ মাইকানছ সহ ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা আহ্বান করে। ছয়টি গ্রামসভা একযোগে খনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে এবং কোম্পানীগুলির সহিত চুক্তি বাতিলের দাবি করে। সরকার গ্রামসভার অভিমত উপেক্ষা করে। জনমতের চাপে ২০০১ সালে বিচারপতি পি কে মিশ্র তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। দুই বছর বাদে, ২০০৩ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। সরকার কমিশনের সুপারিশ মতো দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি বিধানও করেনি।

ভারতের সংবিধানের পঞ্চম তপসিলভুক্ত (Fifth Schedule) উপজাতি এলাকাগুলিতে PESA আইন প্রযুক্ত এবং সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত সমথা রায় (১৯৯৭) অনুযায়ী উক্ত এলাকায় সম্পদ সংরক্ষণের অধিকারী একমাত্র গ্রামসভা। গ্রামসভার অনুমতি ব্যতীত অ-উপজাতিদের হস্তান্তর অবৈধ। কে মানছে সংবিধান? কোথায় সুপ্রিম কোর্ট? উন্নয়নের নয়া সংবিধানে কর্পোরেট পুঁজিই শেষ কথা।

উড়িষ্যার অপর প্রান্তে জাজপুর জেলায় কলিঙ্গনগরে ১৩০০০ একর জুড়ে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, তার অর্ধেক কৌম জমি। সরকার সাধারণের অধিকারভুক্ত জমি তার নিজস্ব জমি হিসাবে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে চালান করেছিল। বাকি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যেগুলি সরকারি জমি, সেগুলিতে অবশ্য পাট্টা দেওয়া যেত, কিন্তু সরকার স্থানীয় আদিবাসীদের সে সুযোগ দেয়নি। ফলত, যারা বিস্থাপিত হয়েছিল, তারা সকলে

ক্ষতিপূরণ পাননি। জমিহারাদের কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বলা বাহুল্য, কোম্পানিগুলি সেই প্রতিশ্রুতির প্রতি দায়বদ্ধ ছিলনা। ১৯৯২ সালে, জমি অধিগ্রহণের একেবারে প্রাথমিক স্তরে সাধারণ ভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখা যায়নি। পরিবার পিছু একজনের কর্মসংস্থানের মৌখিক আশ্বাস গ্রামবাসীদের শান্ত রেখেছিল। ১৯৯৭ সালে, বিনা কর্মসংস্থানে যখন তাদের স্থানান্তর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, তখন থেকেই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। স্থানান্তরের পূর্বে তারা কর্মসংস্থানের দাবিতে ধর্না শুরু করে। পুলিশ জোর করে গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে, বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়, পঞ্চাশাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে।[৭] উড়িষ্যা সরকার কিছু বাড়তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু জবরদস্তি অধিগ্রহণে রাশ টানেনি।

২০০৪ সালে 'সুখিন্দা উপত্যকা আদিবাসী-হরিজন একতা ও সুরক্ষা পরিষদ' গঠনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলি সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই 'সুরক্ষা পরিষদ'-এর নামকরণ হয় 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ'। ৯ মে ২০০৫, রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী 'মহারাষ্ট্র সিমলেশ' কোম্পানির ভূমিপূজা উপলক্ষ্যে কলিঙ্গনগরে পদার্পণের দিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পুলিশ নির্দয় লাঠিচার্জ করে। মধ্যরাতে গ্রামে ঢুকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে গ্রেপ্তার করে। মানুষের ক্ষোভ চরমে ওঠে। ৭ অক্টোবর টাটা কোম্পানী বিতর্কিত জমির দখল নিতে এলে গ্রামবাসীরা একযোগে বাধা দেয়। টাটারা দখল নিতে ব্যর্থ হয়। ২ জানুয়ারি ২০০৬, টাটা কোম্পানি, পুলিশের সহায়তায়, পুনরায় জমির দখল নিতে আসে। শত শত গ্রামবাসী সমবেত হয়ে অবরোধ শুরু করে। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় অবরোধকারীদের উপর গুলি চালিয়ে অকুস্থানেই দুজন মহিলা, এক কিশোর সহ ১২ জনকে হত্যা করে। পরে একজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ৩৭ জন আহত হয়। এক পুলিশ কর্মীরও মৃত্যু হয়।[৮]

পুলিশি সন্ত্রাসে প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ-এর নেতৃত্বে পারাদ্বীপ হাইওয়েতে ১৪ মাস ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন অবরোধ শুরু হয়। উড়িষ্যা সরকার 'প্রতিরোধ মঞ্চ'কে আলোচনায় আহ্বান করতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকল্প প্রত্যাহার করতে সরকার রাজি হয়নি। রাজ্য সরকারের তরফে একটি 'পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন নীতি' ঘোষণা করা হয়।

নিয়মগিরিতে স্টারলাইট-বেদান্ত এবং জগৎসিংহপুরে পসকোর ক্ষেত্রে উড়িষ্যা সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে, তাতে এই সরকারকে প্রতারক ছাড়া কিছু বলা যায়না। বনাধিকার আইন লঙ্ঘন করে, পরম্পরাগত বনবাসীদের অস্বীকার করে এবং আঞ্চলিক গ্রামসভাগুলির অভিমত সম্পর্কে বিকৃত তথ্য প্রদান করে অথবা অনৃতভাষণ করে কোম্পানিগুলোর পক্ষে উড়িষ্যা সরকার কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তরের থেকে ছাড়পত্র আদায় করার চেষ্টা করেছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। পসকো-র ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক তাদের স্বনিয়োজিত কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করে যেমন ছাড়পত্র দিয়েছিল, নিয়মগিরিতে স্টারলাইট-বেদান্ত-এর ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি, সম্ভবত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে। ১৬ আগস্ট ২০১০ তারিখে পরিবেশ মন্ত্রক নিয়োজিত এন সি সাক্সেনা কমিটি নিয়মগিরিতে বক্সাইট খনি প্রকল্প সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে সুস্পষ্ট ভাষায় বক্সাইট প্রকল্পের আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ করা হয়। ২৬ আগস্ট ২০১০ নিয়মগিরিতে কংগ্রেস রাজপুত্র রাহুল গান্ধীর সভা ছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে সমগ্র অঞ্চলকে কংগ্রেস বিরোধী করার ঝুঁকি রাজপুত্র নিতে পারেন নি। বিশেষত তদানীন্তন স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ ভক্তচরণ দাস যখন নিয়মগিরি আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সরকারি সংস্থা উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশন পরিবেশ মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে। ১৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ মন্ত্রকের আদেশ বহাল রাখে। উড়িষ্যার নিয়মগিরিতে স্টারলাইট-বেদান্ত-এর বক্সাইট খনি প্রকল্প স্থগিত হয়ে যায়।

পসকো প্রকল্পের ক্ষেত্রে, উড়িষ্যা সরকার শুধু বনাধিকার আইন লঙঘন করেনি, পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি, যেমন 'উপকূল নিয়ন্ত্রণ বিধি' ইত্যাদিও লঙঘন করেছিল। কিন্তু নিয়মগিরি এবং জগৎসিংহপুর, উভয় অঞ্চলে মানুষের লড়াইটা ছিল মূলত বনাধিকার আইনকে অবলম্বন করে। ২০০৬ সালের বনাধিকার আইন অনুযায়ী, বনাঞ্চলে জনজাতি এবং পরম্পরাগত বনবাসীদের অধিকার ও স্বত্ব নিয়মমাফিক নির্ধারণ না করে বনভূমির পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভাগুলির অভিমত নেওয়া বাধ্যতামূলক। জগৎসিংহপুর জেলার পসকো প্রকল্পাধীন অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামসভা, 'পসকো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'-র অধীনে, বনভূমি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বরাবর ঐকমত্য প্রদর্শন করে গেছে। সিপিআই দলের তদানীন্তন স্থানীয় বিধায়ক অভয় সাহু ছিলেন সংগ্রাম সমিতির অন্যতম নেতৃত্ব। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং শঠতার আশ্রয় না নিলে সরকারের জেতার কোন সম্ভাবনা এতদঞ্চলে সম্ভব ছিলনা।

৬

মার্কস কথিত 'সংসদীয় দস্যুতা'-র আর এক নিদর্শন হলো Special Economic Zone Act 2005 (সেজ)। ইতিমধ্যেই ৮৬ হাজার হেক্টর জমি সেজ প্রকল্পগুলি গ্রাস করেছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা আরও প্রায় ৬৪ হাজার হেক্টর।[৯] আমাদের দেশে হেক্টর প্রতি জনসংখ্যা ৩.৩ (FAO) ধরলে ইতিমধ্যেই সেজ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য ২.৮ লক্ষ মানুষ উৎখাত হয়েছে। আরও দুই লক্ষাধিক মানুষ উচ্ছেদের পথে।

সেজ বিরোধী সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ, নন্দীগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দৌলতে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে নানাবিধ প্রকল্পের জন্য চুক্তি করে। তার অন্যতম ছিল নন্দীগ্রামে সেজ প্রকল্প। প্রাথমিক স্তরে ২৯টি মৌজায় কমবেশি ৪০০০ হেক্টর জমিতে সেজ গঠনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 'হলদিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটি' ২ জানুয়ারি ২০০৭ এই মর্মে এক নোটিশ জারি করে। ৩ জানুয়ারি থেকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। গঠিত হয় 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। শুরু থেকেই শাসকদল ছিল আক্রমণাত্মক। রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী এবং তদানীন্তন শাসকদল আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী (হার্মাদ বাহিনী নামে সমধিক পরিচিত) একযোগে আন্দোলন দমনের জন্য আসরে নেমে পড়ে। ৭ জানুয়ারি ২০০৭, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রথম শহিদ ভরত মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মাইতি, শেখ সেলিম নিহত হয়েছিল হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে। 'প্রতিরোধ বাহিনীর' পাল্টা আক্রমণে নিহত হয়েছিল সিপিএম নেতা শঙ্কর সামন্ত। ৯ জানুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হলদিয়া কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করে বলেন, নোটিশ জারি করে এইচডিএ অনধিকার চর্চা করেছে। পাশাপাশি এটাও জানিয়ে দেন, বিধিমতো প্রক্রিয়া মেনে সেজ গঠিত হবে। আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে এক পুলিশকর্মী খুন হয়ে যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রাম থেকে কিছুটা দূরের এক জনসভায় বলেন যে, ''নন্দীগ্রামের মানুষ না চাইলে এখানে কেমিক্যাল হাব হবেনা। আমরা এই প্রকল্প অন্যত্র নিয়ে যাব''। কিন্তু সরকারি ভাবে প্রকল্প বাতিল করা হলো না। পুলিশি সন্ত্রাস চলতেই থাকল। ১৪ মার্চ ঘটে গেল সেই নারকীয় ঘটনা। নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের (নাকি হার্মাদ বাহিনীর?) গুলিতে ১৪ জন প্রাণ হারালো। আহত অনেক।

এই ঘটনার পরেই সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বুদ্ধিজীবী এবং নাগরিক সমাজ প্রতিবাদে সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী ২৯ মার্চ আবার এক জনসভায় নন্দীগ্রামে সেজ প্রকল্প বাতিলের ঘোষণা করেন। কিন্তু হার্মাদ বাহিনীর দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়না। কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে ইতস্তত সংগ্রাম চলতেই থাকে। রক্তও ঝরতে থাকে। নভেম্বর মাসে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হার্মাদ বাহিনী নন্দীগ্রাম দখল করে। হত্যা ও ধর্ষণে নন্দীগ্রাম কেঁপে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষায়, ''ওদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে'' (paid back in the same coin)। ১৪ নভেম্বর ২০০৭ কলকাতায় প্রায় লক্ষ মানুষের মৌনমিছিলে সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনতার ধিক্কার ধ্বনি মূর্ত হয়ে ওঠে।

মহারাষ্ট্রের রায়গাড় জেলায় পেন ও উরান তালুকে ৪৫টি গ্রামে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে রিলায়ান্স কোম্পানি 'মহা-মুম্বাই *সেজ*' গঠনের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম ভিন্নতর এক নিদর্শন স্থাপন করে। পেন তালুকের ২২টি গ্রামের জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও কৃষিসমৃদ্ধ। ২০০৬ সালে রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়ার পর মূলত পেন তালুকের এই ২২টি গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে '*সেজ* বিরোধী সংঘর্ষ সমিতি' গঠন করে। আবেদন-আলোচনা, গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা ইত্যাদি কর্মসূচির পর ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ১৯ দিন ব্যাপী অনশনেও সরকারের সাড়া না পেয়ে, 'সংঘর্ষ সমিতি' মার্চ মাসে রাস্তা রোকো আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বুদ্ধিজীবী এবং নাগরিক সমাজের একাংশ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন যে বিষয়টি নিয়ে ক্যাবিনেট পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে মহারাষ্ট্র সরকার ১৯ জুন ২০০৭ অধিগ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ের নোটিশ প্রকাশ করে। 'অধিগ্রহণ ও সেজ বিরোধী মোর্চা' প্রায় দশ হাজার মানুষের সমাবেশে অধিগ্রহণের নোটিশ জ্বালিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে 'পেজেন্টস এ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'-র সভাপতি, ৮২ বছর বয়েসি অধ্যাপক এন ডি পাতিল, মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে ২৪ জুলাই ২০০৮ অনির্দিষ্ট কাল অনশন শুরু করেন। রায়গাড়, পুনে, ঔরঙ্গাবাদ, ধুলে, কোলাপুর, নাসিক সহ বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা দলে দলে অনশন মঞ্চে সমবেত হয়েছিলেন। বিরোধী দলের বিধায়ক, নেতারাও এই সমাবেশকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। অসুস্থ অধ্যাপক পাতিলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন। ২৫ জুলাই বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির বিধায়করা বিধানসভায় এই সেজ প্রকল্প নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন। ২৬ জুলাই বিধানসভা জনমত (Referendum) যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জনমত নিশ্চিত ভাবে সেজ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রায় দেয়। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে রিলায়ান্স সেজ প্রকল্প বাতিল ঘোষিত হয়।

৭

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সারা দেশেই ভূমি-বিদ্রোহ ব্যাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তা একমাত্রিক নয়। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুরে অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার, খেতমজুর প্রভৃতি কৃষিজীবী বিভিন্ন সম্প্রদায় সামিল হওয়ার কারণে আন্দোলন সার্বিক রূপ গ্রহণ করেছিল। পুরুলিয়ায় অধিগৃহীত জমির দাম নিয়ে রফা হওয়ার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। বীরভূম জেলার 'লোবা' অঞ্চলের অধিবাসীরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে কয়লা খনির জন্য জমি দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বেসরকারি কোম্পানি 'এমটা'-কে নয়। তাদের আশঙ্কা, বেসরকারি কোম্পানিতে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মসংস্থান হবেনা। মহারাষ্ট্রে রিলায়েন্স সেজ-বিরোধী আন্দোলনে, শুধুমাত্র কৃষিসমৃদ্ধ গ্রামগুলিই অংশগ্রহণ করেছিল।

অন্য গ্রামগুলিকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে রাজারহাটের আন্দোলন নিঃসঙ্গতার কারণে দানা বাঁধতে পারেনি। ভারতবর্ষের অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪) জমির মালিক ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু জমির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বর্গাদার, খেতমজুর প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ, যারা ক্ষতিপূরণের কোনো ভাগ পায়না। ভূমি-মালিকের সঙ্গে অন্যান্য ভূমিজীবী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। কৌমজমির ক্ষেত্রে ভূমিজীবী মানুষকে কোনো ক্ষতিপূরণই দেওয়া হয়না, অথচ জীবিকা থেকে তারা উৎখাত হয়ে যায়। বিশেষত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সম্মুখীন হয় দারুণ দুর্বিপাকের।

এই বহুমাত্রিকতার ধারাবাহিকতায় বিক্ষোভগুলি অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়, জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে, কৃষক এবং ভূমিজীবী মানুষের উষ্মার কারণ একাধিক— ক) উর্বর এবং উৎপাদনশীল জমি হাতছাড়া করতে কৃষক সম্প্রদায়ের অনীহা প্রায় সর্বজনীন, খ) অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, গ) জমিহারা এবং জীবিকাচ্যুত মানুষের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, ঘ) পুনর্বাসন প্রকল্পে উপেক্ষা, ঙ) কৌমজমি বিনষ্ট হওয়ার ফলে পরিবেশগত ভারসাম্যে রদবদল এবং উক্ত ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা, চ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বেসরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিকে জমি সমর্পণে অনিচ্ছা, এবং সর্বোপরি ছ) স্থিতাবস্থা বিপন্ন করে বিস্থাপনে আপত্তি।

ভারতের প্রান্তিক জনসাধারণের উপর, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছিল, তা কিন্তু ছিল একমাত্রিক। সরকারের উন্নয়নের নীতি ছিল 'কর্পোরেট উন্নয়ন'। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে সামাজিক সুরক্ষার যাবতীয় আইনগুলি সরকারি স্তরে অমান্য করে এবং পুলিশি সন্ত্রাসের মাধ্যমে যে বিস্থাপন যজ্ঞ চলছিল, তা ছিল একমুখী। কিন্তু সেই অর্থে এই সার্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সার্বিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। যে প্রকল্প ঘিরে আন্দোলনের শুরু, সেই প্রকল্পতেই আন্দোলনের শেষ। সমসাময়িক বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্বের পারস্পরিক সংযোগ ছিলনা তা নয়, কিন্তু যে রাজনৈতিক সমন্বয় চলমান আন্দোলনগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে পারতো, সেই সমন্বয় দেখা যায়নি। সিঙ্গুর এবং পসকো আন্দোলন, নন্দীগ্রাম এবং মহারাষ্ট্রের রায়গাড় আন্দোলন সমকালীন হলেও পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেনি। প্রভূত আত্মবলিদানের মাধ্যমে, প্রচণ্ড নিপীড়ন সহ্য করে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলন স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনগুলি স্থানিকতাকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হতে পারেনি। ছত্তিশগড়-মধ্যপ্রদেশে ভিন্ন পথে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে। সে সংগ্রামও ঘাঁটি এলাকার চতুষ্পার্শ্বে সীমাবদ্ধ।

স্বতঃস্ফূর্ততা সম্বন্ধে লেনিনের এক সতর্ক বার্তা ছিল,

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতি, প্রকৃত অর্থে বুর্জোয়া মতাদর্শের অধীনস্থ করার পথে চালিত করে... কারণ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নিছক ট্রেড ইউনিয়নবাদ... এবং ট্রেড ইউনিয়নবাদের অর্থ বুর্জোয়াদের অধীনে শ্রমিকদের দাসত্ব।[১০]

সচেতন রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতার কারণে হোক বা গণআন্দোলনগুলির নেতৃত্বে তাদের উপযুক্ত সমাবেশ না থাকার কারণেই হোক, যেভাবেই হোক শাসকশ্রেণীর কোনো না কোনো পক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনগুলিকে কব্জায় নিয়ে নিয়েছিল। সংসদীয় বাম দলগুলির কোন কোন ব্যক্তিত্ব স্থানীয় চাহিদার তাগিদে আন্দোলনগুলিতে সামিল হয়েছেন, নেতৃত্বও দিয়েছেন, কিন্তু আন্দোলনগুলির অগ্রগতিতে বা উত্তরণে দলীয় স্তরে তাদের কোনো সদর্থক ভূমিকা ছিলনা। সংসদীয় বামেরা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পর থেকে তারা বিশ্বব্যাঙ্ক-বিশ্ববাণিজ্যসংস্থা পরিচালিত উন্নয়ন কর্মে সামিল হয়েছে। জবরদস্তি অধিগ্রহণের তারা বিরোধিতা করে না। কর্পোরেট পুঁজির আবাহনে বামেরাও গলা মেলায়। সামগ্রিক এই পরিস্থিতিতে, বর্তমান শতাব্দীর ভূমি আন্দোলনগুলি, শাসকশ্রেণীকে বিব্রত করলেও, মৌলিক কোনো চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করতে পারেনি।

অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতের শাসকশ্রেণী এখন অনেক বেশি সংহত। সংসদে অংশগ্রহণকারী বর্তমান কোনো রাজনৈতিক দলই প্রকৃত অর্থে শাসকশ্রেণীর প্রতিপক্ষ নয়, বরং তারা শাসকশ্রেণীরই বিভিন্ন পক্ষ। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে কর্পোরেট পুঁজি। মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার পূর্ণ আয়োজন তারা করেছে।

মানুষ বিদ্রোহ করছে আত্মরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষার প্রবণতা মানুষের সহজাত। কিন্তু সেই আপ্তবাক্যটাও তো সত্য, আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। বোঝাই যাচ্ছে, শুধু প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন আজকের এই সামগ্রিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আইন-আদালত কর্পোরেট পুঁজির উদগ্র আগ্রাসন সর্বাংশে প্রতিহত করতে পারবে না। শাসকশ্রেণীর মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদ, কর্পোরেট পুঁজি ও তাদের দালাল দেশীয় শাসকশ্রেণী বনাম শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র মেহনতি জনতা— এক সামাজিক জাগরণ।

আজকাল 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'শ্রেণী দর্শন' ইত্যাদি শব্দগুলি 'অচল' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতই এইসব তত্ত্বে জলসিঞ্চন করছে। কিন্তু পুঁজির বিরুদ্ধাচরণ না করে আধুনিক বিশ্বে যেহেতু কোনো সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সেহেতু সচেতন রাজনৈতিক শক্তি ভিন্ন এই আন্দোলনগুলিকে সঠিক দিশায় চালিত করা সম্ভব নয়।

এর পর ১১১ পৃষ্ঠায়

বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন

নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলন : মতাদর্শ ও ভবিষ্যত

সমরেশ মিত্র

ভূমিকা

পুরোপুরি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র এই নিউক্লিয়ার বিষয়টি কীভাবে একটি আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠলো সে বিষয়ে যে কোনও আলোচনার সূত্রপাত করতে হয় গত শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকে মাথায় রেখে। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখল এবং মার্কিন দেশের একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার বিষয়টি আলোচনায় না এনে নিউক্লিয়ার বিষয়ক আন্দোলন এবং তার মতাদর্শ অনুধাবন করা কঠিন হয়ে উঠবে।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জার্মানি। বিজ্ঞান, বিশেষত রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনে জার্মানি বাকি ইউরোপ এবং মার্কিন দেশকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানে জার্মানীর এই সাফল্যের পেছনে ছিল জার্মানিতে বসবাসকারী ইহুদি বিজ্ঞানীদের অবদান।

হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের ফলে এই বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই জার্মানি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। মার্কিন দেশ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের সাদরে গ্রহণ করে তার বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলির আরও উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়।

জার্মানি থেকে বিতাড়িত বেশ কিছু বিজ্ঞানী জার্মানিতে হিটলারের উত্থান দেখেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর জার্মানির পক্ষে নিউক্লিয়ার বোমা বানানো হয়ত কঠিন হবে না। হিটলারের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকলে কী অবস্থা হতে পারে তা আন্দাজ করে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা, যাঁরা তখন মার্কিন দেশকেই নিজের দেশ করে নিয়েছেন, তাঁরা নিউক্লিয়ার বোমা-র সম্ভাবনার কথা মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের জানান। মার্কিন দেশ এই বোমা বানানোর জন্য ম্যানহাট্টান প্রকল্প গঠন করে। এক সময় এই প্রবাসী বিজ্ঞানী এবং মার্কিন বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় সত্যিই নিউক্লিয়ার বোমা নির্মাণ সম্ভব হয়। এই বোমার নিশ্চিত বিধ্বংসী রূপ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে যখন মার্কিন নিউক্লিয়ার বোমার আঘাতে এশিয়ার শহর হিরোসিমা এবং নাগাসাকি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। শুরু হয় নিউক্লিয়ার অস্ত্রের যুগ।

যুদ্ধ বিরোধিতা অস্ত্র বিরোধিতা

যুদ্ধের সেই আদি যুগ থেকেই যুদ্ধ-বিরোধিতা ছিলো। কখনও অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, কখনও বা মানুষের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে সেই বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে।

আধুনিক যুগে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিরোধী মেজাজ গড়ে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশই এই যুদ্ধে কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে বিষবাষ্প সহ অন্যান্য নানান রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। তারপর জনমানসের চাপে তৎকালীন রাষ্ট্রপুঞ্জ বাধ্য হয় "যুদ্ধাপরাধ" বিষয়টিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে। "যুদ্ধাপরাধ" বলতে বিষবাষ্প এবং অন্যান্য রাসায়নিককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ এবং অস্ত্র-বিরোধিতা-র সূত্রপাত হিসেবে এই ঘটনাটি ভাবা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল রুশ বিপ্লব। প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে রাশিয়াও যুদ্ধ-বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করে। সেই সময় রাশিয়ার বিভিন্ন সীমান্তে বৈদেশিক হানাদারি অব্যাহত ছিলো। তৎসত্ত্বেও যুদ্ধ-বিরোধিতার বিষয়ে রাশিয়া অন্যান্য সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির যুদ্ধবিরোধিতার ধারা অতিক্রম করে একটি ভিন্ন ধারার সূচনা করে।

ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলির যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের পেছনে মূল মতাদর্শ ছিলো যুদ্ধের অমানবিক দিক সহ বীভৎসতার দিকটি নিয়ে সরব হওয়া। ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ে এই ইউরোপ-কেন্দ্রিক যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন কখনও প্রায় তেমন কোনও প্রশ্ন তোলেনি। তাই তাদের নিজ নিজ দেশের শাসক-বিরোধী বা বৃহৎ অর্থে রাষ্ট্র-বিরোধী অবস্থান কখনই ব্যবস্থা-বিরোধী সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী রূপ নেয়নি। এই সমস্ত আন্দোলন অবস্থা-বিশেষে অবশ্যই সমরায়ন অর্থনীতির বিরোধিতা করেছে বা শাসক পরিবর্তনের দাবিও তুলেছে, কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তনকে তারা তাদের আন্দোলনের এ্যাজেন্ডাভুক্ত করেনি।

এদিক থেকে যুদ্ধ এবং অস্ত্র-বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার অবস্থান ছিলো একেবারে মৌলিকভাবেই আলাদা। যুদ্ধ, অস্ত্র এবং বিশ্বব্যাপী সমরায়নের জন্য রাশিয়া বিশ্ব-পুঁজিবাদকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার নির্দিষ্ট প্রকাশ হিসেবে অস্ত্র ব্যবসা, অস্ত্র বাজার এবং যুদ্ধ-র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে যে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়, তার মধ্যে মতাদর্শের দিক থেকে দুটি প্রধান ধারাকে চিহ্নিত করা যায়। একটি ধারার আন্দোলন চলে রাশিয়া-র বাইরে ইউরোপে, যাকে মোটাদাগে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ বিরোধিতা বলা যায়। এই আন্দোলনের বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী এবং মূল নেতৃত্বে থাকেন বিভিন্ন অর্থনৈতিক বর্গ থেকে আসা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের

মানুষ। মানবতাবাদ থেকে স্বাধীনচেতা, ন্যায়নীতির সমর্থক মানুষরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তেমনি যুদ্ধ-র ফলে আর্থিক মন্দায় রুটিরুজি হারানো শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে সামিল ছিলেন।

রুশ-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ আর একটি ধারাও ছিলো এই যুদ্ধে-বিরোধিতার পেছনে। তারা রাশিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাফল্যের জন্য পুঁজিবাদ উৎখাত করার আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইতো। একটা সময়ে, বিশেষত ইউরোপ ফ্যাসিবাদের উত্থানপর্বে দুটি আন্দোলনের ধারা হাতে হাত মিলিয়ে চলতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলার সময়ই একদল মানুষ শান্তিবাদী হিসেবে এই যুদ্ধের বিরোধিতায় সরব হন। এই ধারাটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ-বিরোধী সামাজিক ধারাটির যোগ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী দিকটি সারা বিশ্বের শান্তিকামী জনতাকে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান, এবং ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়ায় ক্রমাগত আগ্রাসন আবারও একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পটভূমি নির্মাণ করে দেয়।

বিশ্বব্যাপী আসন্ন গৃহযুদ্ধের বিপদ যখন প্রকাশ্যে, তখন সারা পৃথিবীর শিল্পী-সাহিত্যিকরা আন্তর্জাতিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকে স্থানিক চরিত্র থেকে একটি বৈশ্বিক চরিত্র দিতে সক্ষম হন। একযোগে সারা বিশ্ব জুড়ে নানান দিবস পালিত হয়। যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি আন্দোলনের এই সময়কালে বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারা অনেকটা কাছাকাছি এসে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের বিপক্ষে একজোট হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ নির্দেশিত বিপজ্জনক এবং মানবতবিরোধী অস্ত্র সম্ভার নির্মাণ এবং এই সমস্ত অস্ত্রের ভাণ্ডার ধ্বংস করার দাবি প্রবল হয়ে ওঠে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান সেই সময়ে শান্তি আন্দোলনের কর্মীদের বিচলিত করে। এই সময় শান্তিকামী বিভিন্ন ধারা নানান আন্তর্জাতিক সংহতি গড়তে সাহায্য করে এবং যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে।

নিউক্লিয়ার বোমা এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন

মার্কিন দেশ যখন ম্যানহাট্টান প্রকল্প গঠন করে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর উদ্যোগ নেয়, তখন সেই উদ্যোগটি এতটাই গোপনীতায় ভরপুর ছিলো যে মার্কিন মন্ত্রীসভার হাতে গোণা কয়েকজন ব্যক্তির বাইরে কেউই বিষয়টি জানতেন না, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই ম্যানহাট্টান প্রকল্প গঠন এবং নিউক্লিয়ার বোমার রূপায়ণযোগ্যতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। বিজ্ঞানী জর্জ ইউয়াল্ড-কে যখন এই প্রকল্পে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদানের জন্য মার্কিন সরকার আমন্ত্রণ জানায়, তখন যুদ্ধ বিরোধী এই বিজ্ঞানী সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ম্যানহাট্টান প্রকল্পের সেই ভ্রূণাবস্থা থেকেই তিনি প্রকাশ্যে বিজ্ঞানের সমরায়ণ এবং নতুন প্রজন্মের সমরাস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন গঠনে সক্রিয় অংশ নেন।

নিউক্লিয়ার বোমা নির্মাণের প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হলে সেই বোমাকে প্রতিপক্ষ দেশের অসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রথমে সরব হন ম্যানহাট্টান প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানীরাই। ন্যায়নীতি এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দেন সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানীরাও। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলার আগেই বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে একটি স্মারকলিপি দেন। সেই স্মারকলিপির মূল বিষয় ছিল যে নিউক্লিয়ার বোমার প্রয়োগ ঘটলে নিউক্লিয়ার বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র নির্মাণের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হবে যা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করবে। তাই নিউক্লিয়ার বোমা সংক্রান্ত যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত শক্তিগুলি হিটলার এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মিত্র হয়ে উঠছে, তাদের সঙ্গে বিনিময় ঘটানো হোক। মার্কিন প্রশাসন তখন তাদের নিজস্ব যুদ্ধবাজ লবিটির কব্জায়। তারা অস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে সারা বিশ্বে তাদের উচ্চতর সামরিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর। ফলে বোর-এর এই প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যাত করে।

১৯৪৫ সালে বোমা প্রয়োগের কয়েকদিন আগেই বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক এই বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দেন, কেননা ততদিনে ম্যানহাট্টান প্রকল্পে কার্যরত বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন যে জার্মানির পক্ষে এই নিউক্লিয়ার বোমা বানানো সম্ভব নয়। কিন্তু সামরিক গোপনীয়তার অজুহাতে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ফ্রাঙ্ক-এর এই রিপোর্ট চেপে দেয়। মার্কিন দেশের যে শিকাগো শহরে প্রথম নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়, সেই শিকাগো শহরের বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী এবং বিকিরণ বিশেষজ্ঞ জে জেফ্‌রিস্‌-এর নেতৃত্বে বোমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। গোপনীয়তার কারণে তখনও নিউক্লিয়ার বোমার বিপদ এবং নিউক্লিয়ার বোমা যে বিশ্বশান্তি এবং যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে একটি নতুন উপাদান সংযুক্ত করতে চলেছে, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষ তখনও কিছুই জানতে পারেননি। তাই এই সময়ে যাবতীয় আন্দোলন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরাই সংগঠিত করেছিলেন।

লস আলামোস গবেষণাগারের একজন তরুণ বিদ্যুতিন ইঞ্জিনিয়ার যখন জানতে পারেন যে বিজ্ঞানীদের দাবিকে উপেক্ষা করে মার্কিন প্রশাসন হিরোসিমায় অসামরিক জনগণের ওপর কোনো আগাম সতর্কতা প্রচার না করেই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে, তখন তিনি অনেক বিজ্ঞানীকে একজোট করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। সেখানে উল্লেখ থাকে যে

এই বোমার বিধ্বংসী শক্তি প্রত্যক্ষ করার পর বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা নেই। ক্রিশ্চান প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের এই লক্ষ্যে সক্রিয় হওয়ার জন্য এই প্রতিবাদপত্রে আহ্বান জানানো হয়।

তেজস্ক্রিয়তার শিকার যে কেবল হিরোসিমা-নাগাসাকির শিশু-বৃদ্ধ-নারীরারাই হয়েছিলেন তাই নয়, ম্যানহাট্টান প্রকল্পের বহু বিজ্ঞানী তেজষ্ক্রিয়তার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। স্লোটিন মারা যান। হারবার্ট অ্যান্ডারসন বেরিলিয়াম তেজষ্ক্রিয়ার শিকার হন এবং কয়েক বছরের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট পেয়ে কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানহাট্টান প্রকল্পের সহকর্মী বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমারকে একটি খোলা চিঠিতে লেখেন :

> নাগরিক এবং মানুষ হিসাবে আমাদের অধিকারের ওপর এই সব (বিজ্ঞানীদের সতর্কতা উপেক্ষা করা এবং তাঁদের প্রায় গৃহবন্দি করে রাখার বিষয়টি এখানে বোঝানো হচ্ছে) অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকে যে কোনও মূল্যে প্রতিরোধ করা উচিত। মৃত্যুর বিনিময়ে যুদ্ধ বিজয় অর্জিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা ফেরত চাই।

এমন কি হিরোসিমায় বোমা বর্ষণের দিনও প্রায় ১০০ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ ম্যানহাট্টান প্রকল্পের সামরিক কর্ণধার লেসলী গ্রোভ্‌সকে বলেছিলেন যে বোমার সঙ্গে তেজষ্ক্রিতার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা সমন্বিত কিছু প্রচারপুস্তিকাও ছড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীদের এই আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলে যে এমন সতর্কবার্তাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরবর্তীকালে যুদ্ধক্ষেত্রে বিষবাষ্প ব্যবহারের সমতুল্য মনে করে মার্কিন দেশকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করবে।

ইতিমধ্যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকি-র বোমাবর্ষণের মধ্যবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী ডেগনিয়ান তেজষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কষ্টকর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু একই সঙ্গে নিউক্লিয়ার বোমার ভয়াবহতা এবং তেজষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের একজোট হওয়ার পটভূমি রচনা করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের সংগঠিত উদ্যোগ

ডেগনিয়ানের মৃত্যুর বিষয়টি সামনে রেখে উইলি হিগিনবোথাম লস আলামস-এর অনেক বিজ্ঞানীদের একজোট করে অ্যাসোসিয়েসন অফ অ্যাটমিক সাইন্টিস্টস নামক সংগঠন নির্মাণ করেন। এই গোষ্ঠী নিউক্লিয়ার বোমার বিপদ নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির দায়িত্ব নেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিকাগো এবং নিউইয়র্ক-এর যে সমস্ত গবেষণাগারের নিউক্লিয়ার বোমা সংক্রান্ত গবেষণা সামরিক সতর্কতার কারণে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল, সেই সমস্ত গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরাও একজোট হয়ে অনুরূপ সংগঠন নির্মাণ করেন।

নিউক্লিয়ার বোমা প্রয়োগের পর বোমা-র তাত্ত্বিক দিক সংক্রান্ত এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণার ফল সাধারণের কাছে ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে নানা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এই সময়কার আন্দোলনের কয়েকটি মূল ধারা ছিলো খানিকটা এই রকমের :

ক) নিউক্লিয়ার বিষয়ক গবেষণাকে একদল বিজ্ঞানী বোমা নির্মাণের পরিবর্তে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। তাঁরা নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের সমরায়ণের তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানকে কল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের একজোট করা এবং নাগরিক মতামত সমাবেশিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

খ) কোনও কোনও বিজ্ঞানী তেজষ্ক্রিয়তার বিপদ সম্পর্কে প্রচারের পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিরাময়ের কাজে তেজষ্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা চালান।

গ) নিউক্লিয়ার শক্তির রূপায়ণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওযার পর একদল বিজ্ঞানী নিউক্লিয়ার বোমার পরিকাঠামো ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের সপক্ষে প্রচার চালান। এই বিজ্ঞানীদের একাংশ নিউক্লিয়ার বোমা বিষয়ে এবং নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বশাসিত নাগরিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক নজরদারির প্রশ্নটি সামনে আনেন।

মার্কিন দেশের যুদ্ধবাজ লবিটি জাতীয় স্তরে নিউক্লিয়ার বোমা এবং শক্তির বিষয়টিকে নাগরিক নজরদারির আওতায় না আনার জন্য জোর চেষ্টা চালায়। এই লক্ষ্যে তারা মার্কিন সেনেটে মে-জনসন বিল নিয়ে আসে, যে বিলের মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের সামরিক লবিটি নাগরিক নজরদারির দাবি নাকচ করার চেষ্টা চালায়। বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নাগরিক নজরদারির দাবিটি আদায়ে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সেও অনুরূপ আইন প্রণীত হয়।

বোমার-বিরোধিতায় বিভিন্ন উদ্যোগ

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটালাজিক্যাল ল্যাবরেটরির-র বিজ্ঞানীদের সংগঠন দ্য এ্যাটমিক সাইন্টিস্ অফ শিকাগো গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য হিসেবে নাগরিকদের নিউক্লিয়ার বোমা এবং শক্তি সম্পর্কে সচেতন করা এবং বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট করার বিষয়টি ঘোষিত হয়। এই সংস্থার মুখপত্র হিসেবে *বুলেটিন অফ দ্য এ্যাটমিক সাইন্টিস্টস অফ শিকাগো*, যা পরবর্তীকালে *বুলেটিন অফ দ্য এ্যাটমিক সাইন্টিস্টস* নামে নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকে। পত্রিকাটি আজও প্রকাশিত হয় এবং নিউক্লিয়ার বোমা এবং শক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার পত্রিকা হিসেবে এটির মান্যতা প্রশ্নাতীত।

অক্টোবর ২৫, ১৯৪৫ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার পারমাণবিক বোমা বিরোধী বিজ্ঞানীদের সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে ফেডারেশন অফ এ্যাটমিক সাইন্টিস্টস্ গঠন করেন। নাগাসাকিতে দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ার পর বার্ট্রান্ড রাসেল *গ্লাসগো ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় নিউক্লিয়ার

বোমা এবং অস্ত্র বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে লেখেন :

> মানবজাতি আজ সুস্পষ্ট একটি বিকল্পের দ্বারপ্রান্তে। হয় আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব, অথবা আমাদের সবাইকে সামান্য একটু সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যদি আমাদের সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হয় তবে রাজনৈতিক ভাবনায় আমাদের অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে।

রাসেল এবং আইনস্টাইন আরও অনেক বিজ্ঞানী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহায়তায় নিউক্লিয়ার গবেষণা বিষয়ে রুশ-মার্কিন সহায়তার পক্ষে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রস্তাবটি রাসেল-আইনস্টাইন ইশতেহার হিসেবে প্রকাশ করেন। একই ধরনের উদ্যোগ তৈরি হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান এবং রাশিয়ায়। ভারতেও শান্তি আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ নেহরুকে এই বিষয়ে অবহিত করলে নিউক্লিয়ার বোমা এবং তেজষ্ক্রিতার বিপদ বিষয়ে ভারত সরকার একটি পুস্তক প্রকাশ করে, যার ভূমিকা লেখেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল স্বয়ং।

রাসেল-আইনস্টাইন ইশতেহার থেকে শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়ার বোমা বিরোধী আন্তর্জাতিক শান্তি সংগঠন, পাগওয়াস কনফারেন্স-এর জন্ম হয়। এই সম্মেলনটি প্রথমে ভারতে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ১৯৫৭তে সুয়েজ খাল সংকট-এর ফলে সম্মেলনটি কানাডার নোভা স্কটিয়া-র পাগওয়াস গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন আজও বিশ্বশান্তির পক্ষে এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে সরব। তবে সম্মেলনটি ক্রমশ সরকার-পন্থী কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

নিউক্লিয়ার অস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার বোমা বিরোধিতায় বহু ধরনের মানুষ বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে সামিল। খ্রিস্টান পাদ্রী, বৌদ্ধ শ্রমণ, গান্ধীবাদী, শান্তিকামী থেকে শুরু করে মন্দির কমিটি, এবং অন্যদিকে মাওবাদী থেকে সংসদপন্থী বাম, গ্রিন পার্টি, রেড-গ্রিন পার্টি, আদিবাসী সংগঠন— কে না সামিল এই আন্দোলনে। এছাড়া রয়েছে নানান মতাদর্শের নারীবাদীরা। বোমার বিরোধিতায় মার্কিন দেশের মায়েরা ৬৫ কিমি দীর্ঘ মানব-শৃঙ্খল তৈরি করেন, ইংল্যান্ডে মিশাইল কারখানার চারপাশে অবস্থান করেছেন সে দেশের মানুষ। ফ্রান্সে, জার্মানিতে, ইতালিতে, রাশিয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে।

পোখরান-বিস্ফোরণের পরপর এদেশে সারা দেশ জুড়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কলকাতায় *পরমাণু অস্ত্র প্রসার বিরোধী মঞ্চ* সহ আরও নানান উদ্যোগ, মুম্বাইতে *অনুবোম বিরোধী আন্দোলন* ছাড়াও সারা দেশে অসংখ্য উদ্যোগ রয়েছে। এখনও প্রতি বছর সারা দেশে জুড়ে হিরোসিমা-নাগাসাকি দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা বিরোধী অবস্থান ঘোষণা করেন। ভারত - পাকিস্তান সরকার পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের পর ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জনগণ এবং শান্তি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপী নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বিরোধী সকলের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

নিউক্লিয়ার বোমা-বিরোধী আন্দোলন : নানা ধারা, নানা মতাদর্শ

নিউক্লিয়ার বোমা-বিরোধী আন্দোলনকে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানভাবে তাদের বৃহৎ আন্দোলনের পরিকল্পনা এবং মতাদর্শের অংশ করে তোলেনি, যদিও এই বিষয়ে আন্দোলনে তাদের যোগদান বিরল নয়। বিদেশে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী জোলিও ক্যুরি, বার্নাল বা আমাদের দেশে মেঘনাদ সাহা বা কোসাম্বির মতো বিজ্ঞানী বিরল নন। কিন্তু সংগঠিত বামপন্থী বা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই আন্দোলন গড়ে তুলছে বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে, এমন ঘটনার দেখা সচরাচর মেলে না।

সব দেশের ক্ষেত্রেই এর কারণ হিসেবে দুটি সাধারণ কথা বলা যেতে পারে। নিউক্লিয়ার বিষয়ে মার্কিন দেশের একাধিপত্য ঘুচে যাওয়ার পর পৃথিবীতে যুদ্ধের সংখ্যা ও বিস্তার এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমতুল্য হয়নি। প্রভাব বলয়ের রাজনীতির ফলে নিউক্লিয়ার বোমার অধিকারী দেশগুলি পরস্পরের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় যে কোনো বাজার দখলের যুদ্ধ সহসা নিউক্লিয়ার যুদ্ধে পরিণত হবে, এমন সম্ভাবনা গত শতকের ৫০-এর দশকের তুলনায় অনেক কম সন্দেহ নেই। অনেক রাজনীতিবিদ, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতিবিদরা, এই বিষয়টির নাম নিয়েছেন নিবৃত্তিকরণ বা ডেটারেন্স। বর্তমানকালে এই নিবৃত্তিকরণ তত্ত্বের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই "পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার নিশ্চিতকরণ" বা 'মিউচুয়ালি অ্যাসিয়োর্ড ডেস্ট্রাকসন'-এর ধারণায়। প্রতিটি নিউক্লিয়ার বোমার অধিকারী দেশ এমন ব্যবস্থা করেছে যে তারা যদি অন্য কোনো নিউক্লিয়ার অস্ত্রধর দেশ কর্তৃক নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে আগ্রাসক দেশটিও আক্রান্ত দেশটির নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা নিশ্চিৎভাবেই বিধ্বস্ত হবে। এই চূড়ান্ত নিবৃত্তিকরণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের ধারণার বিপরীতে গিয়ে আরও নতুন নতুন এবং আরও বিধ্বংসী বোমা এবং অস্ত্র সম্ভারের জন্ম দিচ্ছে। তবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-এর হাতে নিউক্লিয়ার এবং থার্মো নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে তার অতীতের আগ্রাসী অভিযানে কিছুটা হলেও সংযত হয়েছিলো তা অস্বীকারের উপায় নেই।

ঠিক এই কারণেই বামপন্থী এবং কমিউনিস্টরা বাছ-বিচার না করে নিউক্লিয়ার বোমার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন না। অধুনা-লুপ্ত সোভিয়েত রাশিয়া বা মাও-এর চীন যখন নিউক্লিয়ার এবং থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার অধিকারী হয়, তখন বামপন্থীরা এবং কমিউনিস্টরা এই ঘটনাকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার খর্ব বলে বিবেচনা করে তা বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে অবস্থান রাখেন।

সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই অবস্থানের কোনো যৌক্তিকতাই যে ছিল না বা তা যুদ্ধ-বিরোধী অস্ত্র-বিরোধী অবস্থানের বিরোধী ছিল, এমন কথা বলাটা একপেশে হবে। এই সমস্ত বাস্তব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং খানিকটা ইতিবাচক নিবৃত্তিকরণের অবস্থান থেকে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের পক্ষে দেশ-জাতি-নির্বিশেষে নিউক্লিয়ার বোমার বিরুদ্ধে সংগঠিত যে কোনও কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া মতাদর্শগত কারণেই সম্ভব নয়। এমন একটি অবস্থায় বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের হাত থেকে শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে যায় তাঁদের হাতে, যাঁরা যেকোনও দেশের বোমাকেই যেকোনও মূল্যে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। এই আন্দোলন থেকে নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আপাত প্রস্থানের ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অহিংসা, মানবপ্রেম, হানাহানি এবং অস্ত্রবিরোধী অংশটির এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বেড়ে যায় বিপুলভাবে।

তাই আমরা দেখি এই কলকাতা শহরে যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে আনন্দমার্গী, পীতাম্বর-দিগম্বর গোষ্ঠী, সর্বোদয়ীদের অনেকেই সামিল হয়েছেন, অথচ প্রায় সেই একই সময়ে সেই একই বিষয়ে আহূত প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সভায় কেবলই বামপন্থীদের ভীড়।

তত্ত্বের দিক থেকে আরও বেশি অস্ত্রবলে বলীয়ান হওয়ার ফলে নিবৃত্তিকরণ এবং তার বিপরীতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, এই দুই বিকল্পের দ্বন্দ্ব থেকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের কী বামপন্থী ধারা, কী অ-বাম ধারা, কেউই মুক্ত নয়। এই বিষয়টি নতুন করে সামনে আসে যখন পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ রোধ করে সিটিবিটি বিধি গ্রহণ করার বিষয়টি নতুন মাত্রা পায়। এই বিধিকে বৈষম্যমূলক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একচেটিয়া অবস্থার বৃদ্ধিকারী বলে বামপন্থীরা বিধিটির যথার্থ সমালোচনা করে বিধিটির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। আবার যাঁরা নির্বিচারে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার বোমার বিরোধী, তাদের একাংশ আবার জাতীয়তাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে বলেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাপিয়ে দেওয়া বিধি জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, অতএব এই বিধি অচল। একটি তৃতীয় ধারা এই দুই অবস্থান থেকে সরে এসে ঘোষণা করে যে যদি পৃথিবীতে একটিও কম নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ কমানো যায়, তবে ন্যায়বিচারের নিরিখে, নিরস্ত্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিধি যতই অসাম্যমূলক ও বৈষম্যে ভরপুর হোক না কেন, এই বিধিকে মান্যতা দেওয়া উচিত। একদিকে যেমন এই বিধির বিপক্ষে সারা ভারতে মিছিল হয়েছে, অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গান্ধীবাদী এবং সর্বোদয় কর্মীরা এই বিধির পক্ষে অনশনে বসেছেন। অথচ এই দুই দলই পোখরান-২ বিস্ফোরণের পরবর্তীকালে এই বিস্ফোরণের বিরোধিতায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে দিনের পর দিন মিছিলে সামিল হয়েছেন। এই সমস্ত শক্তির মধ্যে মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে হয়ত আগামীদিনে যুদ্ধ ও নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য একটি রূপরেখা তৈরি হবে।

নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী আন্দোলন

বিজ্ঞানীরা জানতেন যে নিউক্লিয়ার বোমা আর নিউক্লিয়ার চুল্লি-র মধ্যে পার্থক্য মাত্র একটি ধাপের। নিউক্লিয়ার বোমা আসলে একটি অনিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার চুল্লি। নিউক্লিয়ার বোমার জন্য প্রয়োজনীয় টেকসই শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে যে নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার চুল্লি পাওয়া যাবে, সেই চুল্লির থেকে উদ্ভূত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব।

বস্তুত নিউক্লিয়ার বোমার শক্তিধর প্রত্যেকটি দেশই আগে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন চুল্লি বানিয়েছে এবং পরবর্তী ধাপ হিসেবে সেই চুল্লির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই অনিয়ন্ত্রিত চুল্লির প্রযুক্তিটিকে নিউক্লিয়ার বোমার প্রযুক্তিতে পরবর্তিত করেছে। মার্কিন দেশে নিউক্লিয়ার বোমার নির্মাণের ম্যানহাট্টন প্রকল্পের পূর্বসূরী ছিলো বিজ্ঞানী ফের্মি নির্মিত "শিকাগো পাইল"— যা আদতে একটি নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন চুল্লির আদি-সংস্করণ। রাশিয়া-চীন-ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-ভারত-পাকিস্তান-কোরিয়া— প্রত্যেকটি দেশেই আগেই শক্তি-উৎপাদনকারী নিউক্লিয়ার চুল্লি চালু হয়েছে এবং তারপর সেই সমস্ত দেশ নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করেছে।

নিউক্লিয়ার শক্তি-বিরোধী আন্দোলনে প্রথম থেকেই দুটি ভিন্ন মতাদর্শ-ভিত্তিক আন্দোলনের দেখা মেলে। মুখ্য ধারাটি নিউক্লিয়ার বোমা এবং নিউক্লিয়ার শক্তির এই মিথোজীবী অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে নিউক্লিয়ার-শক্তি বিরোধী আন্দোলনকে শেষ বিচারে নিউক্লিয়ার বোমা-বিরোধী, অস্ত্র-প্রসার-বিরোধী এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করতে চায়। তাদের মতে, নিউক্লিয়ার শক্তি-বিরোধী আন্দোলন একটি নৈতিক আন্দোলন। যার মুখ্য স্তম্ভ হলো মৃত্যু-বিরোধী এবং হত্যা-বিরোধী এবং প্রাণ-রক্ষার স্বপক্ষে।

আর একদল আন্দোলনকারীর দেখা মেলে, যারা নিউক্লিয়ার শক্তি এবং নিউক্লিয়ার বোমার মিথোজীবী অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত কিন্তু তারা আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে চায় কেবল বাণিজ্যিক নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলির বিপক্ষে। এখানে একটা বলা দরকার যে পৃথিবীর কোথাও, কোনো দেশে এমন কি ভারতের ক্ষেত্রেও নিউক্লিয়ার শক্তি - নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলন কখনও নিউক্লিয়ার গবেষণা, গবেষণার জন্য নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরোধিতা করে না। গবেষণা চুল্লিগুলি সম্পর্কে এই দুই দলেরই বক্তব্য প্রায় এক সুরের— গবেষণার দিশা এবং অভিমুখ পরিবর্তন করে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ কমানোর চেষ্টা করা এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আরও উন্নত মানের সহায়তা প্রদান করা।

যে দুটি ধারার কথা বলা হলো, সেই দুটি ধারা দুটি ভিন্ন ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণা ছাড়াই আঞ্চলিক এবং অন্যান্য ধারণার ভিত্তিতেও নিউক্লিয়ার চুল্লি - নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখন আমরা নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার বিভিন্ন বাস্তব কারণগুলি নিয়ে সাধারণ আলোচনা করে দেশে দেশে, বিশেষত আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবো।

অর্থনৈতিক কারণ

বিভিন্ন বাস্তব ভৌগোলিক কারণে সারা পৃথিবীতেই বাণিজ্যিক নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলি সেই সমস্ত স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে প্রচুর জলের জোগান রয়েছে— অর্থাৎ সমুদ্রের উপকূল বরাবর বা নদী-জলাধারের নিকটবর্তী অঞ্চলে। আবার ঠিক এই জলের কারণেই এই অঞ্চলগুলি শস্য চাষ বা মাছ-চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। এদিকে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসলে একটি বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে মানুষ এবং বসতি উচ্ছেদ করতে হয়। যাঁরা উচ্ছেদ হয়ে তথাকথিত পুনর্বাসন পাবেন, যদি আদৌ পান, তখন তাঁরা কিন্তু সেই বর্ধিত শক্তি-উৎপাদনের সুবিধা থেকে নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত হবেন। এছাড়াও কোথাও আজ পর্যন্ত নিউক্লিয়ার চুল্লি প্রতিষ্ঠার কারণে উচ্ছেদ হওয়া মানুষরা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাননি— পুনর্বাসনের জন্য দুটি প্রজন্ম পর্যন্ত সময় লেগেছে বা লাগছে, এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর।

চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনের একটি প্রাথমিক শক্তি মাঝারি জমির মালিক থেকে ক্ষুদ্র-জোতের মালিকরা— তাদের পাশে থাকে ঐ সমস্ত জমিতে কর্মরত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারবর্গ। খুব কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বড় জোতের মালিকরাও এই আন্দোলনে সমর্থন জোগায় বা ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলনে যোগ দেয়।

চুল্লি বিরোধী আন্দোলনের সংগঠনকারীরা তাই প্রাথমিক-ভাবে এই আন্দোলনকে জমি-রক্ষার আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলেন, যার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, রাষ্ট্র-বিরোধী উপাদান থাকে। রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের সঙ্গে সমঝোতার মূল বিন্দু হিসেবে মুখ্যত জমির প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা বা বলপ্রয়োগকে হাতিয়ার করে।

জমি রক্ষা আন্দোলনে যোগদানকারী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ ভিন্ন। বড় বা মাঝারি জোতের মালিক সাধারণভাবে এই আন্দোলনে আসে জমি রক্ষার কারণে নয়, বরং তারা আসে আন্দোলনের মাধ্যমে দর-দাম করে তাদের জমির বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে নিতে। আন্দোলনের এই অংশের মূল লক্ষ্য জমি রক্ষা নয়, জমির অর্থমূল্য। এই বিশ্লেষণের পক্ষে আমরা জৈয়তাপুর, মহারাষ্ট্র বা গুজরাট বা হরিয়ানার প্রস্তাবিত নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলতে পারি। জৈয়তাপুরে সরকার দফায় দফায় জমির জন্য ক্ষতিপূরণের অংক বৃদ্ধি করার রাস্তা গ্রহণ করাতে বড় এবং মাঝারি বড় চাষিরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়— সরকারের পক্ষ থেকেও জমির ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করার পূর্বশর্ত ছিলো আন্দোলন প্রত্যাহার। সরকারের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে বৃহৎ বা মাঝারি চাষির বক্তব্য গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বদল হয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের চরিত্র এবং রূপ। ক্ষতিপূরণ নিয়ে যাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন, তাঁদের আর স্থানীয় সমস্যা নিয়ে মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তাই চুল্লির বসানোর পর পরবর্তী ক্ষতি, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন কোনও সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে তাদের যোগদান শূন্য বা খুবই সীমিত আকারে। অথচ আন্দোলনের প্রচারে, আর্থিক সাহায্য ও আন্দোলনের মুখ হিসেবে বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। অন্য ধারার আন্দোলনের এটিও একটি দিক, যা শাঁখের করাতের মতো আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে গেছে। বিশেষত জৈয়তাপুরের ক্ষেত্রে একর প্রতি ২৩-২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষিত হওয়ার পর ধর্না এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, জঙ্গি আন্দোলনে ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। বড় জোতের চাষিরা অন্য একটি দিক থেকে এই জমি রক্ষা আন্দোলনের পক্ষে বিপদ হিসেবে দেখা দেয়। এই বর্গের মানুষরা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জমি হস্তান্তরে রাজি হয়ে গেলে সরকার চুল্লির জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন অনেকটা জমি এক লপ্তে পেয়ে চুল্লির কাজ শুরু করে দেয়। এবং তারপর করদাতা জনতার টাকা খরচ হয়ে গেছে এই হুজুগ তুলে বৃহত্তর জনমত গঠনে অনেকটাই সফল হয়। এ বিষয়টি আমরা কোদানকুলম বা অন্যান্য চুল্লির ক্ষেত্রে, যেখানে এখনই চালু চুল্লির সঙ্গে নতুন নতুন ইউনিট বসানো হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছি।

মাঝারি বা ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা কিন্তু জমি রক্ষার আন্দোলন থেকে যেতে বাধ্য হন। তাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এত বেশি নয় যে তা দিয়ে নতুন লগ্নি করে প্রজন্ম পর প্রজন্ম টিকে থাকা যাবে। তারা জমি রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, ''চুল্লি চাই না'' আওয়াজ তোলেন। কেননা চুল্লি না বসালে উচ্ছেদের প্রশ্ন নেই এবং তাদের পূর্বাবস্থা বজায় রাখা যাবে। এই গোষ্ঠীর মানুষরা সরকারের প্রচারের কয়েকটি দিক নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়। যেমন সরকারের একটি প্রচার থাকে যে চুল্লি বসলে ঐ অঞ্চলে উন্নয়নের চেহারা হবে আধুনিক, শহর-কেন্দ্রিক, সেখানে চাষের ক্ষেত্রে সরকারি সেচ-বীজ-সার-এর সুবিধা বা ভরতুকি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকল্প ক্ষেত্রের বাইরের মানুষদের শক্তির চাহিদার প্রশ্ন, উন্নত মানের জীবন-যাপনের প্রশ্নে সংলগ্ন অঞ্চলের দু ধরনের মানুষ পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে হাজির হয়। তাই আমরা দেখি এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ, যাদের অর্থনৈতিক অবস্থান মধ্য বা ক্ষুদ্রচাষি বা ছোটো দোকানের মালিক, তারা ক্যামেরার সামনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বলে বসেন যে চুল্লি অন্য জায়গায় বসুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের রেহাই দেওয়া হোক। একই কথা শোনা গেছে পশ্চিমবঙ্গের হরিপুরের প্রস্তাবিত চুল্লির ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নটি

আরও তীব্র হবে যখন ১২৩-নিউক্লিয়ার চুক্তি মতে ভারত সরকার ২০১৫-র মাঝামাঝি থেকে হরিপুর নিউক্লিয়ার চুল্লির কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেবে।

আন্দোলনে সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় এবং বৃহত্তম শক্তি ভূমিহীন কৃষক, অসংগঠিত শ্রমিক এবং মৎস্যজীবীরা। এদের জীবন-জীবিকা জল আর জমির নিগড়ে বাঁধা। জমি এবং জল রক্ষা এদের কাছে জীবন রক্ষার চেয়ে কম কিছু নয়। ক্ষতিপূরণের কোনো কিছুই এরা পাবেন না। সরকারের এই বর্গের মানুষদের জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই, তাই এদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আকর্ষণীয় প্যাকেজও নেই। চুল্লি বসুক বা না বসুক, স্থানত্যাগ এদের পক্ষে মৃত্যুর সামিল। এরা খুব ভালোভাবেই জানে যে এদের যা দক্ষতার স্তর তা নিয়ে চাষের কাজ বা মাছ ধরার কাজে তারা অপরিহার্য, কিন্তু নির্মাণ বা পরিকাঠামো বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা অদক্ষ মজুরের সমতুল্য। যতদিন প্রকল্প চলবে, ততদিন এদের কাজ হয়ত বা মিলবে, কিন্তু তারপর তাদের না থাকবে থাকার জায়গা, না থাকবে জীবিকা। তাদেরকে এই কারণেই থেকে যেতে হবে, এবং জমি এবং জল বাঁচানোর দাবিতে অনড় থাকতে হবে। আর চুল্লি বসলে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে চুল্লির বিরূপ প্রতিক্রিয়া এদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে। ''চুল্লি চাই না'' দাবির এরা সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং যোদ্ধা। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন কোণে কোণে নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলন যে একেবারে মুছে যায় নি তার কারণ এই গোষ্ঠীর মানুষরা এখনও ধীরগতিতে হলেও আন্দোলনের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাই আমরা দেখি, সেই ষাটের দশকে জোর করে জমি দখল করে নিঃশব্দে উচ্ছেদ করে মহারাষ্ট্রের তারাপুর বা উত্তরপ্রদেশের নারোরা-তে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসেছে, সেখানে আজও আন্দোলন চালাচ্ছেন স্থানীয়ভাবে থেকে যাওয়া ঠিকা শ্রমিকরা। বিভিন্ন অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের মতো বুনিয়াদি দাবি নিয়ে, ইএসআই, ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি নিয়ে এমনকি শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্র গুলি চালাচ্ছে, মৃত্যু-হত্যা-হাজতবাসের ঘটনা ঘটছে।

সাম্প্রতিক কোদানকুলমের আন্দোলনের মূল শক্তি সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবী এবং ভূমিহীন কৃষক, সঙ্গে রয়েছেন অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা এবং নারী শ্রমিকরা, যারা বিশ্বায়নের যুগে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়েছেন। তাঁরা জানেন যে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি, জমির বদলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, বাস্তুর বদলে বাস্তু এবং জীবিকার বদলে জীবিকার যে প্যাকেজ সরকার আন্দোলনকারীদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে তার কোনোটাই তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাদের জমি নেই, বাস্তু বলতে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানাহীন নিরেশ জমির ফালি। আর তাদের জীবিকার ক্ষেত্র, অর্থাৎ চাষের জমি এবং সাগরের জল, যা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তার বিকল্প দেওয়া সরকারের সাধ্যাতীত। তারা এটাও জানেন যে চুল্লি পুরোমাত্রায় চালু হলে তাদের বিপদ বাড়বে— কমবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, চুল্লির ফলে যে তথাকথিত উন্নতি ঘটবে, তার কোনও সুফল তারা পাবেন না— কেন না তথাকথিত সেই সুফলের উৎস হলো তাদের মতো বিশাল এক অংশের মানুষদের বঞ্চনা। সারা পৃথিবীরই এই বর্গের মানুষরা চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান শক্তি।

অর্থনীতি : অন্য যুক্তি

অর্থনৈতিক দিক থেকে নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরোধী আরও দুটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। প্রথম দৃষ্টিকোণটিতে অবস্থান করেন শক্তি-অর্থনীতিবিদরা। অনেকেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি হিসেবে নিউক্লিয়ার শক্তি অত্যন্ত মহার্ঘ্য এবং তা টেকসই নয়। এই ঘরানার অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যেমন বাজার-অর্থনীতির সমর্থক রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী ঘরানার পেশাদার অর্থনীতিবিদরাও।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার লবির সমর্থক এবং নিরপেক্ষ অনেক অর্থনীতিবিদ পরিবেশ সংক্রান্ত যুক্তি তুলে বলেন যে নিউক্লিয়ার শক্তি বিশ্ব উষ্ণায়ণ ঘটায় না (তথ্যটি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সঠিক নয়), অতএব পরিবেশ রক্ষার মূল্য ধরলে এবং দীর্ঘস্থায়ী সুবিধার কথা ভাবলে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যয় অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির মতোই দাঁড়াবে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায়, অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছরের অভিজ্ঞতায়, এর কোনও সমর্থন মেলেনি।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় যে ধারাটি খুব জোরের সঙ্গে নিউক্লিয়ার শক্তির বিরোধিতা করে, তারা হলো কার্বন লবি অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল) নিয়ে বিপুল মুনাফা-ভিত্তিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কুশীলববৃন্দ। তারা নিউক্লিয়ার-বিরোধী অর্থনীতিবিদদের যুক্তি আত্মস্থ করে নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলে শক্তি-বাজারে তাদের ''মার্কেট শেয়ার'' ধরে রাখার চেষ্টা চালায়।

স্বাস্থ্যহানি : তেজস্ক্রিয়তার বিপদ

বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নিউক্লিয়ার-শক্তির বিরোধিতায় সরব যে বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকরা, তাঁরা সবাই নিরপেক্ষ গবেষণা করেন এবং স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগারের বিজ্ঞানী। তাঁদের সঙ্গে তথাকথিত প্রতিরক্ষা গবেষণা বা সমরাস্ত্র গবেষণার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ নেই। প্রধানত তিনটি বিষয়ে তাঁরা নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত যে নিউক্লিয়ার চুল্লি যে পরিমাণ শক্তি তার জীবদ্দশায় উৎপন্ন করে আর যে পরিমাণ শক্তি এই চুল্লি বসিয়ে তাকে উৎপাদনক্ষম অবস্থায় আনতে ব্যয় করতে হয় তাদের মধ্যে কোন সমতা

নেই। পরিভাষায় যাকে বলে 'কমিশন অ্যান্ড অপারেশন লোড'' (অর্থাৎ বসাতে এবং চালু রাখতে ব্যয়িত শক্তি), নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার পরিমাণ চুল্লির জীবদ্দশায় উৎপাদিত সমগ্র শক্তির চেয়ে বেশি। দ্বিতীয়ত, নিউক্লিয়ার ফিসন এবং ফিউশন, তা সে নিয়ন্ত্রিত হোক বা অনিয়ন্ত্রিতই হোক, তার থেকে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খনিজ বিভাজনক্ষম নিউক্লিয়ার জ্বালানির চেয়ে বেশি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে খনিজ ইউরেনিয়াম, যা নিউক্লিয়ার চুল্লির কাঁচামাল, তার থেকে প্রাপ্ত জ্বালানিতে তেজস্ক্রিয়তার ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীভূত থাকে। চুল্লির বর্জ্য পদার্থ পরিমাণের দিক থেকে কম হলেও তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে ভয়াবহ। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্বিষ অবস্থায় পৌঁছানোর সময়কাল তিন হাজার মানব প্রজন্ম (৯০ বছরে তিন প্রজন্ম হিসেবে ধরে)। তৃতীয়ত, এত দীর্ঘ সময় ধরে বর্জ্য পদার্থ নিরাপদ রাখার প্রযুক্তি আমাদের এখনও আয়ত্তের বাইরে। শুধু প্রযুক্তি নয়, যে সামাজিক-রাজনৈতিক সুস্থিত সমাজব্যবস্থা এত দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারি চালাতে পারবে, আজকের বহুধা-বিভক্ত মানব সমাজ তা করতে পারবে না— গত ৭০ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী বহু বিজ্ঞানী সামিল। এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার— আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। হাতের কাছে চট-জলদি উদাহরণ হলো বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বা দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী। বিদেশে ক্যারেন সিল্কউড হত্যা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

দুর্ঘটনাজনিত বিপদ

সাধারণ মানুষ পরমাণু বিরোধী বিজ্ঞানীদের যে যুক্তিটিতে সবচেয়ে আস্থা রাখেন সেটি হলো চুল্লিতে দুর্ঘটনার অনিবার্যতা এবং দুর্ঘটনার পরবর্তী ফলাফল বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীতে। জন্মলগ্ন থেকেই দেশ-বিদেশে ছোট থেকে বড় দুর্ঘটনা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলোর নিত্যসঙ্গী। ছোট ছোট দুর্ঘটনার খবর রাষ্ট্র গায়েব করে দিতে সক্ষম হলেও বড় বড় দুর্ঘটনার খবর দুর্ঘটনার তীব্রতা, ব্যাপ্তি এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্যই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

সাধারণ মানুষ এও জানেন যে বোমার সঙ্গে বা তেজস্ক্রিয়তার গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিজ্ঞানীই ব্যতিক্রমহীনভাবে তেজস্ক্রিয়জনিত ক্যান্সারে মৃত্যু বরণ করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণাও বলছে, নিউক্লিয়ার চুল্লির আশপাশে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব জাতীয় গড়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। নিউক্লিয়ার-চুল্লির বিরোধিতায় এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রচার আন্দোলন জারি আছে। এবং এই আন্দোলনের মূল শক্তি স্থানীয় অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক এবং মৎস্যজীবীরা— কেননা তাঁর চুল্লির আশপাশে স্রেফ জীবিকার কারণে থেকে যেতে বাধ্য হবেন বলেই তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হবেন।

নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যাঁরা নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরোধিতা করেন, তাঁদের আন্দোলনের একটি মূল বিষয় হলো নিউক্লিয়ার চুল্লির এই দুর্ঘটনাপ্রবণতা এবং তেজস্ক্রিয়তা-প্রতিরোধে মানব জাতির অপারগতা। থ্রি মাইলস আইল্যান্ড, সেলাফিল্ড, চের্নোবিল, ফুকুসিমা-র দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে চুল্লির দুর্ঘটনার সঙ্গে সমাজ-সংগঠন, আর্থিক অবস্থা, প্রযুক্তির উন্নতির স্তর ইত্যাদির কোনও সম্পর্ক নেই। তেমনি দুর্ঘটনার প্রভাব কোনো জাতি-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ঠিক এই কারণেই দেশে দেশে নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। এর পেছনে রয়েছে যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব এবং ন্যায়নীতির দৃঢ় বনিয়াদ।

স্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাণিজ্যিক নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরোধিতা শেষ বিচারে নিখিল দৃষ্টিকোণ থেকে চুল্লির বিরোধিতার মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে দেয়। নিউক্লিয়ার চুল্লির বিরুদ্ধে নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক অরূপায়ণযোগ্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নটির মূল বিষয় হলো : 'নিউক্লিয়ার চুল্লি কোথাও নয়, কখনও নয়'। এই দৃষ্টিকোণ একই সঙ্গে চুল্লি, বোমা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ— এই তিনটি মূল বিষয়কে একসূত্রে গেঁথে দেয়।

বিভাজনক্ষম বস্তু এবং অস্ত্র-প্রসার

নিউক্লিয়ার চুল্লির জ্বালানি এবং নিউক্লিয়ার বোমার জ্বালানি একই। এছাড়াও নিউক্লিয়ার চুল্লি থেকে যে ফুরিয়ে-যাওয়া-জ্বালানি অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম-ভিত্তিক বোমা তৈরি করা হয়। দুটি ইরাক যুদ্ধে এবং সম্প্রতি লিবিয়ার বিরুদ্ধে যে ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামকে বোমা হিসেবে মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছে তার প্রমাণ রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বোমা ব্যবহার করলে সেই ভূখণ্ডে তেজস্ক্রিয়তা থেকে যায় বহুদিন। তাছাড়া, নিউক্লিয়ার চুল্লির গর্ভে জন্ম নেয় মারাত্মক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল প্লুটোনিয়াম, যার অর্ধজীবনকাল বিরাট। এসব দিক থেকে বিবেচনা করে একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে উদাহরণ এবং প্রমাণও রয়েছে যে প্রায় সব দেশই চোরাই পথে নিউক্লিয়ার চুল্লি থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম সরিয়ে ফেলে। সরিয়ে ফেলার একমাত্র কারণ হলো এই সমস্ত বস্তুকে নিউক্লিয়ার বোমার মশলা হিসেবে ব্যবহার করা। এই জাতীয় বস্তুগুলিকে বিভাজনক্ষম পদার্থ বলা হয় এবং এগুলি ব্যবহার করে ক্ষেপণাস্ত্রে বহনযোগ্য ছোট আকৃতির কিন্তু বহুগুণ বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা সম্ভব। বস্তুত বহু দেশ এভাবেই নিউক্লিয়ার বোমার প্রাথমিক রসদ সংগ্রহ করেছে। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, ইরান প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ তোলে যে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের ছল করে ইরান বা অন্যান্য ইসলামি দেশগুলি বুঝি 'ইসলামি নিউক্লিয়ার

বোমা' তৈরি করে ফেলবে। 'নিউক্লিয়ার চুল্লি বন্ধ হোক' শ্লোগান কার্যকর হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্লুটোনিয়ামের উৎপাদন কমবে এবং তা বিভাজনক্ষম বস্তুর চোরাই চালান কমিয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রসার-বিরোধী ভূমিকা পালন করবে।

এই অংশটির উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনের নানান মাত্রা আছে। একদিকে স্থানীয় স্তরে তা যেমন জল-জঙ্গল-জমি বাঁচানোর লড়াই-এর সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে বৈশ্বিক স্তরে তা অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী গড়ার প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত। নানান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রশ্নের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরের পরিবেশ রক্ষা থেকে বিশ্ব-উষ্ণায়ণ, বিকল্প শক্তি, নবীকরণযোগ্য শক্তি-চক্রে ফিরে যাওয়া, সম-বণ্টন, ক্ষমতায়ণ, গণতান্ত্রিক বোধ এবং অংশগ্রহণের বিষয়গুলি ঘিরেও আবর্তিত হয় নিউক্লিয়ার শক্তি ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়গুলি।

আন্দোলনের রূপ ও বিকাশ

মানুষের শক্তি চাহিদা বৃদ্ধি স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক— আন্দোলনকে মানুষের এই মৌলিক চাহিদাকে মান্যতা দিতেই হবে। এই প্রশ্নে গান্ধীবাদী নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনকারীরা কৃচ্ছসাধন এবং 'অল্পে তুষ্ট' থাকার বুদ্ধ-সংঘারামে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী, ব্যক্তির দিক থেকে শক্তি ব্যয় করার চাহিদার বিষয়টিকে মান্যতা দিয়ে তাঁরা বিকল্প শক্তি, শক্তির অপচয় বোধ, শক্তি চাহিদার হিসেব কষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেন। তাই আন্দোলনের প্রথমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে আন্দোলনকারীরা একজোট হন, আন্দোলনের খানিক অগ্রগতির পর এই জাতীয় মতাদর্শগত প্রভেদ আন্দোলনগুলিকে প্রভাবিত করে।

এই আন্দোলনটিকে যে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করতে হবে তা বোঝা যায় রাষ্ট্রের পক্ষে জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপের সাথে সাথেই। সহায়ক শক্তিগুলি তাৎক্ষণিক স্থানীয় ইস্যুর পাশাপাশি দীর্ঘকালীন প্রশ্নগুলি তুলে ধরেন। এই আন্দোলনে তাই জঙ্গি প্রতিরোধের পাশাপাশি দাবিগত অ্যাডভোকেসি-র ভূমিকা থাকবেই।

আন্দোলনের রূপ কী হবে তা নিয়েও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মতবিরোধ থাকে। গান্ধীবাদীদের কাছে সত্যাগ্রহ বা অহিংসার পথই চূড়ান্ত কথা। সত্যাগ্রহ বা অহিংসা আন্দোলনের পথ হিসেবে কতটা সার্থক, সে প্রশ্ন না তুলেও যে কথা বলা দরকার তা হলো আন্দোলনের এই রূপটি শেষ বিচারে একটি বিপজ্জনক উপাদান যোগ করে। সারা পৃথিবী জুড়েই, আমাদের দেশে তো আরও বেশি করে, এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি ভূমিহীন কৃষক, মৎস্যজীবী, আদিবাসী, দলিত প্রান্তবাসীরা। মূলত জঙ্গি এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের 'বশ'-এ রাখার চক্রান্ত হিসেবে যে অহিংসা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে এই সম্প্রদায় অশেষ অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং তাঁদের সংগ্রামী মেজাজ বদলের জন্য এই অহিংসা মতাদর্শ সতত ক্রিয়াশীল। একদল সংগ্রামী, লড়াকু মানুষদের শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গণ্ডীতে আটকে ফেলার এই সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় বাবু শ্রেণীর হাতে। সংগ্রামী মেজাজ মার খায়। আন্দোলনে অত্যাচার নামে, সংগ্রামী জনতা রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের মুখে পড়ে পিছু হটে যায়। জৈয়তাপুর থেকে পসকো, নর্মদা থেকে কুদানকুলম— সর্বত্রই এই সাধারণ চিত্র দেখতে পাই।

বামপন্থীদের সংকট

সাবেকি বামপন্থীদের সংকট আরও গভীর। এই সমস্ত আন্দোলনে বুনিয়াদি শক্তির বা শ্রমিকদের প্রায় অনুপস্থিতিতে এই আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা বামপন্থীরা কেমনভাবে পালন করবেন সে নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। জমি-আন্দোলনে তাঁদের এতদিনের সংগ্রামের উত্তরাধিকার ভূমিবণ্টন (ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে) কর্মসূচিটির এই ক্ষেত্রে সঠিক রূপ কী হবে তা নিয়ে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক প্রশ্নের সমাধান তাঁরা আজও করে উঠতে পারেননি। ভূমিহীন কৃষক সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রটি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এই আন্দোলনে সেই সব মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ থাকায় বামপন্থীরা দৃঢ় সংগঠন গড়তে ব্যর্থ হচ্ছেন। এছাড়া বিকল্প শক্তি, বিকল্প পরিবেশ ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি এখনও সাবেকি বামপন্থীদের শ্রেণীভাবনায় স্থান পায়নি। ফলে স্বভাবতই এই সব আন্দোলনে তাঁদের উপস্থিতি প্রান্তিকতার স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে আপাতত।

উপসংহার

বিশ্বায়নের যেমন একদিকে বিশ্বায়িত পুঁজির আগ্রাসী রূপ নিয়ে আমাদের ওপর চেপে বসছে, অন্যদিক থেকে তেমনি বিশ্বায়িত প্রতিরোধের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। ফুকুসিমা-বিরোধী আন্দোলন রসদ যোগাচ্ছে কোদানকুলম-কে। জৈয়তাপুর বা কোদানকুলামে বিদেশের নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উৎসাহী যোগদান এদেশের শাসকদের বিচলিত করেছে। তাই আমরা শুনতে পাই, এই সব আন্দোলনে বিদেশি টাকা আর বিদেশি 'বিভেদমূলক শক্তি'র উপস্থিতির অলীক কাহিনী। সুইডেনের নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলনের বিজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের দেশে বিকল্প শক্তি-গবেষণার জন্য আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি।

শ্রেণী-ধর্ম-মতাদর্শ ছাপিয়ে নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার পরিসর তৈরি করতে পারা এই আন্দোলনের অন্যতম জোরের জায়গা। বামপন্থীরা এই বিষয়টি যত দ্রুত উপলব্ধি করে সঠিক বিশ্লেষণ ও সঠিক শ্লোগানের ভিত্তিতে সঠিক সাংগঠনিক রূপের মাধ্যমে এই বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করতে পারবেন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মূল শ্লোগানটি রূপায়ণের পথে মানবজাতি তত দ্রুত পা বাড়াতে পারবে।

গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে ওড়িশার পসকো প্রকল্প বন্ধ

সন্দীপ কুমার পট্টনায়ক

এই কাহিনী ওড়িশার জগৎসিংহপুর জেলায় দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানি পোহাং আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি-র (পসকো) ইস্পাত কারখানা ও তার জন্য বন্দর গড়ার বিরুদ্ধে চলমান গণ আন্দোলন নিয়ে।

২০০৫ সালের জুন মাসে এখানকার আটটি গ্রামের মানুষ পসকো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি (পিপিএসএস)-র পতাকাতলে এই প্রকল্পের জন্য তাদের জমি নিয়ে নেওয়ার সরকারি ও কোম্পানির যৌথ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়ছে। তারা তাদের জমি ও জীবিকা বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করছে। রাজ্য সরকার ও পসকো কোম্পানি তাদের জমি নেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রতিরোধে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন রণকৌশল অবলম্বন করেছেন। কর্তৃপক্ষের তরফে হিংসাত্মক আক্রমণ চালানো হলেও, জনগণের সংগ্রাম গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ থেকেছে। প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি গ্রামবাসীরা বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী তাদের ব্যক্তিগত ও কৌম অধিকার তুলে ধরেছেন। রাজ্য সরকার অবশ্য তা মানেন নি।

রাজ্য সরকারের একটি বিতর্কিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রক ২০১১ সালের ২ মে পসকো প্রকল্প-কে বন আইন সংক্রান্ত চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেন। সমিতি একে চ্যালেঞ্জ জানায়। তারা বলে যে এই ছাড়পত্র প্রকৃত তথ্যের ওপর, এলাকার আসল অবস্থার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় নি। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের এই ছাড়পত্র জমি ও জীবিকা রক্ষার লড়াইয়ে মানুষকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। যতদিন না পসকো এই প্রকল্প ত্যাগ করে যায় ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন তারা। তাদের এই লড়াই সারা ভারতে অনেক সংগ্রামের, অনেক গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। পরিবেশ ও জীবিকা বাঁচানোর সংগ্রামগুলির সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে পসকো-বিরোধী এই লড়াই।

পসকো-র ১২০০ কোটি ডলারের প্রকল্প

২২ জুন ২০০৫। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম স্টিল কোম্পানি পসকো ওড়িশা সরকারে সঙ্গে একটি মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) সই করে। এর মধ্যে পড়ছে জগৎসিংহপুর জেলায় এরাসামা ব্লকে খনি, ইস্পাত কারখানা, তার জন্য একটি শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র ও একটি বন্দর নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ। বন্দরটি হবে পারাদীপ বন্দরের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে জটাধারীতে। প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার জন্য ৬০ কোটি টন উচ্চ মানের লৌহ আকরিক লাগবে। সেটা পাওয়া যাবে সুন্দরগড় জেলার খন্ডধর পাহাড়টিকে আগামী ৩০ বছর ধরে একমাত্র তারাই ব্যবহার করতে পারবে এই শর্তে— জায়গাটি প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা থেকে মোটামুটি ২০০ কিমি দূরে। প্রকল্পটির জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় ১২০০ কোটি মার্কিন ডলার বা ৫২০০০ কোটি টাকা। এদেশের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হতে চলেছে এটি— সেকারণে এটিকে 'মর্যাদাপূর্ণ' বলে মনে করা হচ্ছে।

পসকোর একটি শাখা (সাবসিডিয়ারি) পসকো-ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বক্তব্য অনুযায়ী, এই বৃহৎ সম্মিলিত (ইন্টিগ্রেটেড) ইস্পাত কারখানাটির ফলে ভারতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ঘটবে। প্রকল্পটি সরাসরি ১৩০০০ লোককে চাকরি দেবে এবং পরোক্ষভাবে ৩৫০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার— দুই সরকারই এ থেকে রাজস্ব পাবে। অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্ক, পরিষেবা কর ও কর্পোরেট আয়কর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ বছরে মোটামুটি ৮৯,০০০ কোটি টাকা পাবে।

গ্রামবাসীদের জন্য মৃত্যুঘণ্টা

পসকো প্রকল্প থেকে সরকারি ভাণ্ডারে টাকা আসবে, কিন্তু জগৎসিংহপুরের ২০,০০০ গ্রামবাসীরা পুরোটাই বা আংশিক জমি হারাবে, তাদের জীবিকার উৎস হারাবে। তদুপরি, প্রকল্পটি পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনবে। শিল্প থেকে দূষণ, বাস্তুতান্ত্রিকভাবে সংবেদনশীল এলাকার ধ্বংসসাধন ও রাষ্ট্রশক্তির হাত ধরে একটি বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ।

প্রকল্পটি হবে জগৎসিংহপুরের এরাসামা ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত— গড়কুজঙ্গ, নুয়াগাঁও ও ধিনকিয়া-র ৮টি গ্রাম ও ৩৩৫০টি পরিবারের জায়গা জুড়ে। এতে সমস্যায় পড়বে যেসব মানুষ তাদের এক-তৃতীয়াংশ দলিত (তফসিলি জাতি) ও ওবিসি। ২০০১ সালের জনগণনা ও ভোটার লিস্ট অনুযায়ী গড়কুজঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোলাঙ্গা গ্রামে ২১ জন জনজাতির মানুষ আছে, সেখানে ওয়ার্ড সদস্য মহিলাটি তফসিলি উপজাতির, কেন্দ্রটিও তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

কিন্তু সরকারি তথ্য অনুসারে মাত্র ৪৭১টি পরিবার বা ২৫০০ মানুষ এই প্রকল্পে অসুবিধায় পড়বেন। সরকার পরিবারগুলিকে গুনেছে জমির মালিকানা দিয়ে। যারা বনের জমি চাষ করেন তারা বাদ পড়ে গেছেন। লোকে বনভূমিতে কাজুবাদাম, পান ইত্যাদি চাষ করেন। সংখ্যাটি স্থানীয়

তহশিলদারের অনুমান। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন নি। তাই ঠিক কতজন উৎখাত হবেন তার হিসাবটা পরিষ্কার নয়।

যখন এই প্রকল্প ঘোষিত হয় তখন থেকে ২০ হাজারের বেশি গ্রামবাসী এর বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রাম করে আসছেন। তারা পসকো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি (পিপিএসএস) গঠন করেছেন। এই সমিতিই জনগণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পসকো প্রকল্প নিয়ে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি হলো এর জন্য কতটা জমি লাগবে।

জনগণের জীবিকার প্রতি আঘাত, কৃষি ও পরিবেশের ক্ষতি

পসকোর প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ধিনকিয়া, গোবিন্দপুর ও নুয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি গ্রাম নিয়ে। ইস্পাত কারখানা-শক্তিকেন্দ্র ও বন্দরের জন্য মোট ১৬২০ হেক্টর জমি অনুমোদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২৫৩ হেক্টর জমি বনভূমি।

দারুন কর্মচঞ্চল কৃষি অর্থনীতির এলাকা এটি। এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকেরা এখানকার উর্বর জমিতে পান, কাজুবাদাম, ধান, সজনে ডাঁটা ও মাছ চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থাতেই ছিলেন। বনভূমিতে পান চাষ ঐ এলাকার পরিবারগুলোর উপার্জনের বড় উৎস। একটি হিসাব অনুযায়ী, এলাকাটিতে ৫০০০ পানের বরজ আছে, সেগুলোর দেখাশোনা করেন ১০,০০০ চাষি। সরকারি হিসেবে অবশ্য পানের বরজের সংখ্যা ১৮০০। পানচাষিরা বলছেন বরজের সংখ্যা ২৫০০। এগুলি বেশিরভাগই ধিনকিয়া ও গোবিন্দপুর গ্রামে। নারী ও বৃদ্ধরাই সাধারণত পানচাষে যুক্ত থাকেন। এ থেকে পরিবার পিছু বছরে লক্ষাধিক টাকা পাওয়া যায়। পানের চাহিদা বাড়লে আয় বাড়ে। বড় কথা হলো যে পানচাষিরা নিজেরাই বরজের মালিক। সেজন্য তাদের কাজে একটা আত্মসম্মান আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হলে এসব কাজের অবসান ঘটবে, স্থানীয় মানুষের স্থায়ী (সাসটেনেবল) জীবিকা ধ্বংস হবে।

প্রস্তাবিত জটাধারী বন্দরটি পরিবেশের বড় ক্ষতি করবে। সরকারি পারাদীপ বন্দরটির লাভ কমে যাবে। জটাধারী বন্দর তৈরি হলে জটাধারী নদীতে জলের প্রবাহ কমে যাবে, চারপাশের এলাকায় জল জমা হবে। ঐ জেলায় কৃষিকাজের ক্ষতি হবে।

তার ওপর, জাহাজ চলাচলের ফলে যে দূষণ ঘটবে তাতে মাছধরা জেলেদের সমস্যা হবে। বিশ্বে অলিভ রিডলি টার্টলদের সবচেয়ে বড় খাদ্য-এলাকাটি বিপন্ন হবে। নোলিয়াসাহি গ্রামের ১০৮টি পরিবারের সকলেই এই নদীর মোহনায় মাছ ধরে। পরিবার পিছু দৈনিক আয় ১০০ থেকে ৫০০০ টাকা। এই মাছের বেশির ভাগটাই যায় কটকে। জটাধারীতে বন্দর হলে এই আয় বন্ধ হয়ে যাবে। জেলেদের ওপর পসকো প্রকল্পের কী প্রভাব পড়বে সেটা খতিয়ে দেখা হয়নি। পসকো মনে করে না যে জেলেরা পসকো প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

গ্রীষ্মকালে কাজুবাদাম চাষ স্থানীয় মানুষের মূল জীবিকা। কাজুবাদাম চাষে প্রতি গ্রীষ্মে গড়ে ২০০০০ টাকা আয় হয়। কাজু ও পান বাজারজাত করার সুবিধা গ্রামবাসীদের আর্থিক নিরাপত্তা দেয়।

আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষিকাজ। মউ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার প্রকল্পটিকে জোবরায় মহানদীর বাঁধ থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে জল তোলার অনুমতি দেবে। ২৮.৫.২০০৫-এ লিখিত একটি চিঠিতে পসকো তিনটি প্রকল্পের প্রতিটির জন্য প্রতিদিন ৭৫০০০ ঘনমিটার জল চেয়েছে। কৃষি থেকে শিল্পে এতখানি জল চলে যাওয়াটা পসকো ও স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিবাদের আরেকটা বড় কারণ। এই পরিমাণ জল ওড়িশার পাঁচটা জেলার জলের প্রয়োজন মেটাতে পারে—কটক, জগৎসিংহপুর, জয়পুর, খুরদা ও কেন্দাপাড়া।

রাজ্য সরকারের দানখয়রাত এখানেই শেষ নয়। সুন্দরগড় জেলার খন্ডধরে প্রস্তাবিত লৌহ আকরিক খনির জন্য সরকার পসকো-কে ৬২০৪ হেক্টর জমি দেবে। এতে উৎখাত হবে ৫০টি আদিবাসী গ্রামের মানুষ। এর মধ্যে লাহুনিপাড়া ব্লকের পউরি ভুইয়ানার মতো আদিম জনজাতিরাও পড়ে। খনির কাজ শুরু হলে এলাকার জৈববৈচিত্র্যের ভয়ানক ক্ষতি হবে। ছোট ছোট নদীগুলো শুকিয়ে যাবে, জঙ্গল ধ্বংস হবে। একটি হিসাব অনুসারে, কেওনঝড় জেলার বানসপালের সুয়াকান্তি থেকে সুন্দরগড় জেলার বোনাই পর্যন্ত ১০০ বর্গ কিমি এলাকায় জঙ্গল ধ্বংস হবে।

স্থানীয় বিরোধিতা

পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩টি গ্রাম 'খন্ডধর সুরক্ষা সমিতি'-র পতাকাতলে জমা হয়ে খনির জন্য খন্ডধরের ৬২ বর্গ কিমি এলাকা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সব প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। এই সমিতি ঠিক করেছে যে খন্ডধর এলাকায় দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিটিকে খনির কাজ করতে দেবে না। তাদের ধারণা, তাতে এলাকাটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারাবে।

খন্ডধরের পাহাড়ি ভুয়ান, মুন্ডা ও অন্যান্য আদিবাসীরাও চুপ করে বসে নেই। ২০ হাজারের বেশি আদিবাসী প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাঁরা বলছেন যে এই প্রকল্প তাদের কাছ থেকে ভিটে ও জীবিকা কেড়ে নেবে। পসকো দাবি করছে যে তাদের প্রকল্পের ফলে মাত্র ৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এরা বলছেন, খন্ডধর পাহাড় ও অরণ্য তাদের জীবনের অংশ।

এ এলাকায় পিপিএসএস নেই। ব্যাপারটা এখনও বিচারাধীন, সংগ্রামও এখানে খুব জোরদার নয়।

পসকো প্রকল্পের বিরোধিতায় গ্রামবাসীরা একজোট হলেন

২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে, ওড়িশা সরকার পসকো-র সঙ্গে মউ সই করার দু মাস আগেই, এই চুক্তির খবর বেরিয়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা তখনই এই প্রকল্পের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম প্রথম স্থানীয় মানুষদের মধ্যে প্রকল্প নিয়ে একটা দোলাচল ছিল। কিন্তু ধিনকিয়া, গড়কুজঙ্গ ও নুয়াগাঁও পঞ্চায়েতের মানুষদের এটা বুঝতে দেরি হয় নি যে তাদের পিতৃপুরুষের জমি ও জীবিকা হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১১ জুলাই তাঁরা পিপিএসএস গড়ে তোলেন। নানান রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শের গ্রামবাসী একযোগে এই সমিতি গড়ে তোলেন।

এই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ও গণমুখী করার জন্য সমিতি গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে গণতান্ত্রিকভাবে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ঠিক করেন। এর সদস্য সংখ্যা ৫১। ৩০ শতাংশ নারী। এর মধ্যে ১১ জনের একটি কোর টিম আছে, তারা জরুরি ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর একটি টিম আছে যারা গ্রামবাসীদের মধ্যেকার বিবাদের নিষ্পত্তি করে, যাতে করে তাদের পুলিশের কাছে যেতে না হয়। এর ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা বাড়ে। জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়া পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। সমিতির সব সদস্যই নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সমিতিকে চাঁদা দেয়। সমিতি তৈরির সময় থেকে নারী সদস্যরা আন্দোলনের চাঁদা হিসেবে প্রতিদিন একমুঠো করে চাল সরিয়ে রাখেন।

সংগ্রামের প্রথম ধাপে, পিপিএসএস ছাড়াও দুটি গান্ধীবাদী সংগঠন, রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন ও নব নির্মাণ সমিতি, এলাকার মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন। সমিতি তৈরি হওয়ার আগে থেকেই এরা এই এলাকায় কাজ করছিলেন। ১৯৯৯ সালের সুপার সাইক্লোনে বিপন্নদের জন্য ত্রাণের কাজ করছিলেন তারা। অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের পাশেই অবস্থিত হওয়ায় প্রায়ই সাইক্লোন দেখা দেয়।

পসকো প্রকল্প ঘোষিত হওয়ার পর এই সংগঠনদুটি এই প্রকল্প সম্পর্কে ও জীবিকার ক্ষেত্রে তার কী ফলাফল হতে পারে সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের বিশদে জানাতে থাকেন। নুয়াগাঁও পঞ্চায়েতে এরা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠনের বিশ্বজিৎ রায়ের কথা অনুসারে, এই প্রকল্প তাদের জীবন ও জীবিকার উপর কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে নিয়মিত আলোচনার ফলে প্রকল্প সম্পর্কে ক্ষোভ তৈরি হয়। একে কাজে রূপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন নুয়াগাঁও-এর রেভিনিউ ইনস্পেক্টরের অফিস বন্ধ করে দেওয়ার দাবিতে একটি গণ ধরনা ডাকে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিতকরণের জন্য সমীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল এই অফিস। সামূহিক ও সংগঠিত প্রচেষ্টায় জনগণ ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে এই রেভিনিউ অফিস বন্ধ করে দিতে সক্ষম হন। তখন থেকে এখন পর্যন্ত এই অফিস বন্ধ আছে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এইসব কাজ স্থানীয় মানুষের মনোবল বাড়ায়, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগায়।

এই দুটি গান্ধীবাদী সংগঠন, যারা বারবার পসকো সমর্থক ও কোম্পানির ভাড়া করা গুন্ডাদের হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হচ্ছিল, তাদের পক্ষে অবস্থাটা সহজ ছিল না। যেমন, দুটি ঘটনার কথা বলি। ২০০৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ও ২০০৭ সালের ২৫ মে সত্যাগ্রহীরা পসকো-সমর্থকদের হাতে হিংস্রভাবে আক্রান্ত হন। এই ধরনের আক্রমণ ও ভীতিপ্রদর্শনকে পাত্তা না দিয়ে এই সত্যাগ্রহীরা প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলিতে যান 'হামারা চাহে যো হোগা, পর হাত হামারা নেহি উঠেগা' শ্লোগান নিয়ে। গান্ধীবাদী সংগঠনগুলোর এই অহিংস মনোভাব অনেক গ্রামবাসীকে আন্দোলনের পক্ষে টেনে আনে। গণ-আন্দোলনকে আরও ব্যাপক আকার দিতে এই সংগঠনগুলি সারা দেশের নানা সামাজিক আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

ইতিমধ্যে ওড়িশার শাসক পার্টি, বিজু জনতা দল বা বিজেডি মানুষকে পসকো প্রকল্পের পক্ষে প্রভাবিত করতে শুরু করে। শাসক পার্টির স্থানীয় নেতারা নুয়াগাঁওয়ে প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন গড়ার জন্য ইউনাইটেড অ্যাকশন কমিটি (ইউএসি) নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। জোর খাটিয়ে ও নিপীড়নের মাধ্যমে এরা পসকো-বিরোধী গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়। ভূমিহীন খেতমজুরদের টাকার বা ভাগচাষের জমির প্রলোভন দেখানো হয়। কিছু কিছু ভূমিহীন খেতমজুর পসকোপন্থী দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের জীবিকার অন্য পথ নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজ্য সরকার জনগণের শক্তি ভাঙতে, প্রকল্পটিকে বাতিল করার জন্য তাঁদের প্রতিজ্ঞা ভাঙতে ব্যর্থ হয়।

যেসব পন্থা আন্দোলনে শক্তি যোগায়

প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে মানুষকে জমায়েত করার জন্য, সংগঠিত করার জন্য পিপিএসএস কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলা তিনটি পঞ্চায়েতের এলাকা দিয়ে ১৩ জন পদযাত্রা করেন প্রকল্পটি সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য। তারপর মিটিং ও গণ-ধরনা সংগঠিত করা হয়। লোকেরা তাদের বাড়িঘর, জমি ও জীবিকার উৎস ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। আন্দোলনের শ্লোগান হয় : 'পসকো হটাও, ভিটামাটি বাঁচাও'। ধিনকিয়া গ্রামের সর্বেশ্বর সাহু গর্বভরে বলেন, "ইস্পাত কারখানার জন্য আমরা জমি দেব না। আমরা ধান আর পান চাষ করে যেতে চাই।"

রাজ্য সরকার জনগণের মনোভাব, তাদের দাবি উপেক্ষা করতে থাকেন। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য সরকার

পসকো-র জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্মতি দেন। সে মাসেই জেলা কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের কাছে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেয়। এই নোটিশ দেখে জনগণ কর্তৃপক্ষের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মেমোরান্ডাম জমা দেন। গ্রাম স্তর থেকে ব্লক স্তরে, জেলা থেকে রাজ্য স্তরে একের পর এক জনসভা করা হয়। সিপিআই, সিপিআই(এম), ওড়িশা গণ পরিষদ প্রভৃতি নানা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিপন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে যান, জনসভায় পসকো প্রকল্পের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন সমিতির দাবিকে আরো শক্ত করে, তাকে ন্যায্যতা প্রদান করে। সমিতি জনপ্রতিনিধিদের বোঝানোর চেষ্টা করে যাতে তাঁরা রাজ্য বিধানসভায় ও সংসদে পসকো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এতে মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন ও পরিবেশগত ক্ষতির প্রশ্নটি জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কের সামনের সারিতে চলে আসে। স্থানীয় নেতারা আর এক ধাপ এগিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নেন, তাতে জেতেন, এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় সিদ্ধান্তগুলি যাতে জনগণের পক্ষে যায় সেটা নিশ্চিত করেন।

গ্রামবাসীরা সরকারি কর্মী ও কোম্পানির লোকদের দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ব্যারিকেড গড়েন, বাইরের লোকদের গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দেন। সরকারি লোকেরা এলাকায় সমীক্ষার ছুতোয় এবং আকর্ষণীয় পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ঢুকতে চায়। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাতে টলেন নি। ''গ্রামবাসীরা পালা করে ২৪ ঘণ্টা ব্যারিকেড পাহারা দিতে থাকেন। ২০ জন নারী সহ ৩০ জন সপ্তাহে তিন দিন করে ধিনকিয়ার মূল গেটটি পাহারা দিতে থাকেন''—বলেন নুয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা সংযুক্তা মন্ত্রী। এই পাহারা এখনো চলছে।

ব্যারিকেড শুধু সরকারি কর্মীদের জন্যই নয়। মন্ত্রীদেরও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ২০০৬ সালের ২১ জানুয়ারি, প্রকল্পের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদের মোকাবিলা করতে স্থানীয় এমএলএ ও পঞ্চায়েতী-রাজ মন্ত্রী দামোদর রাউত ও অর্থদপ্তরের মন্ত্রী মনমোহন সামল গড়কুজঙ্গ গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করেন পসকো-র সমর্থনে প্রচার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই এলাকায় ঢোকার মুখে বালিতুথায় দশ হাজারের বেশি মানুষ মন্ত্রীদের পথ আটকে দাঁড়ায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাউত আবার নুয়াগাঁওয়ে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু পসকো-বিরোধী প্রতিবাদকারীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে, গ্রামে ঢুকতে দেয় না।

মউ সই হওয়ার এক বছর পর ২০০৬ সালের ২২ জুন দিনটি পিপিএসএস কালা দিবস হিসাবে পালন করে। এতে বালিতুথা গ্রামের ৭০০০ মানুষ অংশ নেন। তখন থেকে প্রতি বছর ২২ জুন কালা দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির জন্য।

মানুষের মন জয় করার চেষ্টায় পসকো বিফল

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পসকো তাদের কৌশল বদলায়। পসকো-র অফিসাররা এই প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন যোগাড়ের জন্য প্রচারাভিযানে নামল। পসকো-ইন্ডিয়ার নানা টিম বিপন্ন গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে লোকজনকে প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল। কোম্পানি গ্রামবাসীদের জন্য নানা সুবিধা ঘোষণা করল। যেমন, স্কলারশিপ, নতুন বাড়ি, নতুন জমি, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জন্য চাকরি, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ব্যাগ, মোবাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, পুনর্বাসনের আকর্ষণীয় পরিকল্পনা, এমনকি প্রকল্প তৈরির আগেই বিকল্প কর্মসংস্থান।

ধিনকিয়া পঞ্চায়েত সমিতির নেতৃত্ব, পসকো-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও এই এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে প্রকল্পটিকে সমর্থন করার জন্য চিঠি পাঠায় পসকো। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি-র অংশ হিসাবে ওরা পসকো ফাউন্ডেশন গড়ে। এর কাজ হলো প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা। কোম্পানি দাবি করে যে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য তারা সেরা পুনর্বাসন প্রকল্প দিচ্ছে। ''পসকো-ইন্ডিয়ার পুনর্বাসন প্যাকেজ তৈরি হয়েছে ওড়িশা সরকারের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, যেটিকে বলা হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ পুনর্বাসন নীতি।'' বলেন সীমন্ত মোহান্তি, পসকো-ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার (এক্সটার্নাল রিলেশন্স)। তিনি আরও বলেন, ''আমরা নিশ্চিত যে আমাদের প্রকল্পের এলাকার সবাই আমাদের প্যাকেজের ফলে সুবিধা পাবেন, প্যাকেজটি বিশেষ করে ভূমিহীনদের জন্য ও যাদের কাজের দরকার তাদের জন্য তৈরি। যারা সরকারি জমিতে পান লাগিয়েছেন তাদেরও আমরা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি।''

জনগণের হৃদয় জয় করার এত জোরদার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পসকো সুবিধা করতে পারে নি। ২০০৬ সালে গ্রামবাসীদের পাশে পেতে পসকো মোবাইল স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করে। পিপিএসএস-ও ধিনকিয়া ও গোবিন্দপুর গ্রামে দুদিনের স্বাস্থ্যশিবির করে। পিপিএসএস দেখাতে চায় যে স্থানীয় লোকেরা তাদের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পসকোর ওপর নির্ভরশীল নয়। সামাজিক কাজকর্মের নানা সংস্থা দিল্লী ও ব্যাঙ্গালোর থেকে ৬ জন ডাক্তারের একটি দল পাঠায় ধিনকিয়া ও গোবিন্দপুরে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। গোবিন্দপুরের ৩০০ জন গ্রামবাসী আর ধিনকিয়ায় ৪০০ জন গ্রামবাসী এই স্বাস্থ্য শিবির থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র নেন।

সরকারি নিপীড়ন

সরকার শীঘ্রই বুঝল যে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকার তখন এই গণ-আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ওপর আঘাত নামানো শুরু হলো। ২০০৭ সালের নভেম্বরে বালিতুথায় একটি ধরনার উপর পসকোর ভাড়াটে গুন্ডারা আক্রমণ নামায়। এতে অন্তত ১৭ জন আহত হন।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে হইচই শুরু হয়। গণ-আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠী পসকো-বিরোধী গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, কোরিয়ান কনফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন্‌স, কোরিয়ান হাউস ফর ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি, ইউনাইটেড স্টিল ওয়ার্কার্স (পসকোর স্টিল শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন) ও দক্ষিণ কোরিয়ার নানা সংগঠন পসকো-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে চিঠি দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলা গ্রামগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। এইসব সংগঠন দাবি করে যে পসকো-কে এই সব হিংসাত্মক ঘটনার দায়িত্ব নিতে, হবে, অবস্থার নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে, এবং যাতে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ও দাবির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে সেরকম গণতান্ত্রিক ও খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এর ফলে সরকার ও কোম্পানি দুই-ই মুসকিলে পড়ে যায়।

জনগণের সংগ্রামের অহিংস চরিত্র বজায় রাখতে এবং গ্রামবাসীদের কর্মশক্তিকে অন্য পথে চালিত করতে ২০০৮ সালের ২০ এপ্রিল পিপিএসএস শ্রমদান সংগঠিত করে। এটা করা হয় গঠনাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সংগঠিত করার জন্য এবং তারা যে নিজেদের কাজের নিজেরাই মালিক এই বোধ সৃষ্টির জন্য। জটাধরী নদীর মোহনায় মাটি খোঁড়া হয় যাতে করে জমিতে জল জমে না যায়।

পসকোপন্থী লোকেরা মানুষকে সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। ২০০৮ সালের ২০ জুন, গ্রামবাসীরা যখন মোহনার মাটি খুঁড়ে ফিরছিলেন, তখন গোবিন্দপুর গ্রামে তাদের ওপর আক্রমণ নামে। বোমার ঘায়ে পিপিএসএস-এর এক সদস্য দুলা মন্ডল নিহত হন, ৫০ জনের বেশি আহত হন। পিপিএসএস-এর আর এক সদস্য ধ্রুব সাহানি গুরুতর আহত হন। এই সব হিংসাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও পিপিএসএস নেতারা জনগণকে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন, শান্তি রক্ষা করতে বলেন। আক্রমণকারীদের দুদিন আটকে রাখার পর তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুলা মন্ডল শহিদ হন। গ্রামবাসীদের প্রতিজ্ঞা আরও জোরদার হয়। দুলা মন্ডলের আত্মত্যাগ তাঁরা ব্যর্থ হতে দেবেন না।

তাদের দাবি আদায়ের জন্য গ্রামবাসীরা আর এক ধাপ এগিয়ে বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করলেন। সেটা ২০০৯ সাল। নির্বাচন বয়কটের একটা কারণ হলো নির্বাচনের বুথ তাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে ত্রিলোচনপুর আর নুয়াগাঁওয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ধিনকিয়া আর গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দারা ওখানে গিয়ে ভোট দিতে রাজি ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, গ্রামের বাইরে গেলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে। গ্রামবাসীদের বেশির ভাগের নামেই পসকো-বিরোধী আন্দোলন নিয়ে পুলিশ কেস আছে।

নেতাদের গ্রেপ্তার করল সরকার

অন্য সব কিছু যখন ব্যর্থ হলো, তখন রাজ্য সরকার আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। তাদের আশা ছিল, এর ফলে স্থানীয় লোকদের মনে ভয় ঢুকবে। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদ থেকে ধিনকিয়া গ্রামে ফেরার পথে অভয় সাহুকে গ্রেপ্তার করা হলো। কুজঙ্গ পুলিশ তাঁর নামে ৩৬টা কেস দিয়েছিল। গ্রেপ্তারের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল, ঘণ্টা বাজিয়ে গ্রামবাসীরা একে অপরকে সতর্ক করে দিল। কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে কুজঙ্গ থেকে ধিনকিয়া যাওয়ার রাস্তা কেটে দিল, যাতে পুলিশ গ্রামে আসতে না পারে।

সাহুর গ্রেপ্তারের ফলে গ্রামবাসীরা প্রথমে একটু মনোবল হারিয়েছিলেন। কিন্তু সমিতির অন্য নেতারা লোকদের বোঝালেন যে এই গ্রেপ্তার আন্দোলনকে ভাঙার জন্য সরকারের চাল। সাহুর অবর্তমানে গ্রামবাসীরা শিশির মহাপাত্রকে সমিতির সেক্রেটারি নিয়োগ করলেন জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। "আমাদের অনুমতি না নিয়ে কাউকে আমরা গ্রামে ঢুকতে দেব না", বললেন মনোরমা খাটুয়া, ধিনকিয়ার এক নেত্রী।

১০ মাস আটক থাকার পর ২০০৯ সালের ২১ আগস্ট সাহু জেল থেকে জামিনে মুক্ত হলেন। তাঁর এই মুক্তি লোকদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ঐ তিন পঞ্চায়েতে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হলো না। রাজ্য সরকার পসকো-বিরোধী কর্মীদের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা মামলা সাজাতে লাগলেন। ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১৭৩টি কেস দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। ৮২৫টি ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে— এদের মধ্যে ৩৪০ জন নারী। ৬ জন ইতিমধ্যে জেলে।

২০১০ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনটা পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা বালিতুথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসলেন। সরকারি কর্তৃপক্ষ ও পসকো-র অফিসারদের এলাকায় ঢোকা বন্ধ করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৫ মে, ২০১০ হাজার খানেক পুলিশ মোতায়েন করা হলো ধরনার জায়গা থেকে ২০ মিটার দূরে। ধরনায় তখন ৮০০ জনের মতো। বালিতুথা থেকে সরে যাওয়ার আদেশ না মানায় বেলা দুটো নাগাদ পুলিশ হিংস্র আক্রমণ শুরু করলো। রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস শেলের ও লাঠির আঘাতে ১০০ জনের মতো আহত হলেন। রাজনৈতিক দলগুলি এটা ভালো চোখে দেখল না। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশি গুলি চালনার নিন্দা করে

বামপন্থী দলের নেতারা, গণসংগঠনগুলি ও বুদ্ধিজীবীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন।

সরকার পিপিএসএস-কে আলোচনায় ডাকল

২১ মে, ২০১০ মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় এমপি ও এমএলএ-দের একটি মিটিং ডাকলেন পসকো বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য। এই মিটিংয়ে স্থির করা হলো যে স্থানীয় এমপি-দের উপস্থিতিতে রেভিনিউ ডেভলপমেন্ট কমিশনার ও জেলা কর্তৃপক্ষ পিপিএসএস-এর সঙ্গে দেখা করবে পসকো প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য। কিন্তু ২৫ মে কর্তৃপক্ষ এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য ৬টি টিম পাঠালেন, সঙ্গে পুলিশ। বলা হলো, এটা করতে দু সপ্তাহ লাগবে।

পারাদীপ কেন্দ্রের এমপি বিভুপ্রসাদ তরাই এই সমীক্ষা বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন। তরাই বললে, "আমি চাই পিপিএসএস-এর নেতারা ও জেলা কর্তৃপক্ষ বসে আলোচনা করে একটা সমাধান বের করুন। গ্রামবাসীদের অনুমতি ছাড়াই এই সমীক্ষার সিদ্ধান্ত, তা যদি আলোচনার আগেই শুরু হয়ে যায়, তা অবস্থার আরো অবনতি ঘটাবে। ২৮ মে সমিতির কর্মীরা গোবিন্দপুরে একটি সভা করে স্থির করেন যে তারা সমীক্ষার জন্য সরকারি কর্মীদের গোবিন্দপুরে ঢুকতে দেবেন না। এই বাধার মুখোমুখি হয়ে সরকার অন্যান্য গ্রামে সমীক্ষা শুরু করে দিল— যেখানে সংগঠন নেই বা দুর্বল।

ইতিমধ্যে পিপিএসএস বিবাদের নিরসন ঘটাতে রেভিনিউ ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছে। ৩০ মে মিটিংয়ে দুইপক্ষই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখল। পিপিএসএস প্রকল্পটিকে অন্য কোনো জায়গায় সরিয়ে নেওয়া (যদিও তারা কোনও বিকল্প স্থানের কথা বলেনি), কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস তুলে নেওয়া এবং আলোচনা চলাকালীন সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার দাবি জানালো। কিন্তু আলোচনা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত বেরোলো না। দুপক্ষ ঠিক করল যে ৫ জুন আবার কথা হবে।

কিন্তু জগৎসিংহপুর জেলা কর্তৃপক্ষ খুব বিতর্কিত এক পদক্ষেপ নিলেন। তারা ৪ জুন নুয়াগাঁও-এ বিরাট এক পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বন ও হর্টিকালচার সমীক্ষা শুরু করে দিলেন। পসকো-পন্থী ইউনাইটেড অ্যাকশন কমিটি থেকে বেরিয়ে আসা একটা গোষ্ঠী 'ভিটামাটি সুরক্ষা মঞ্চ'ও সমীক্ষার বিরোধিতার করার সিদ্ধান্ত নেয়। নুয়াগাঁও গ্রামের সিদ্ধগুম্ফা মঠে একটা সভায় মঞ্চের ৫০০ জন সদস্য এই প্রকল্পের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫ জুন আলোচনার দ্বিতীয় রাউন্ড হলো, তাতেও কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো গেল না। এর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অভয় সাহুর মধ্যে বৈঠক হলো ১৩ জুন। এতে স্থির হলো: ১) মুখ্যমন্ত্রী পসকো-র এলাকা পরিদর্শন করবেন, যাতে তিনি প্রকল্পের ফলে এলাকার মানুষের জীবিকার কী সমস্যা হবে সেটা বুঝতে পারেন; ২) পিপিএসএস সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষাটিকে চলতে দেবে, তাদের সঙ্গে পুলিশ থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রী যদিও ঘোষণা করেন যে তিনি পসকো প্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করতে যাবেন অবস্থার বিচার করতে, তিনি কিন্তু কখনোই সেখানে যান নি।

ইতিমধ্যে ১৯ জুন মুখ্যমন্ত্রী পসকো-পন্থী ইউনাইটেড অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে কমিটি ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন, প্রকল্পে চাকরির সুবিধা, পরিবেশ রক্ষা ও পাশাপাশি অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে তাদের ২৯ দফা দাবিপত্র পেশ করে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য একটা ভালো পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হবে।

২০ জুন ২০১০ সমীক্ষা দলটি ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের অধীন পাতানা গ্রামে পৌঁছায়। পুলিশ ছিল না। পিপিএসএস বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার বিরোধিতা করে বলে যে সমীক্ষা হবে শুধু সরকারি জমি নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানার জমি সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। গ্রামবাসীদের বিরোধিতার মুখে সমীক্ষা দল পাতানা গ্রাম থেকে খালি হাতে ফিরে আসে।

২১ জুন রাজ্য সরকার ধিনকিয়া, নুয়াগাঁও ও গড়কুজং পঞ্চায়েত এলাকায় জিপিএস ব্যবহার করে নতুন একটা সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। কোম্পানির করা সমীক্ষায় গণ্ডগোল থাকার অভিযোগের কারণে এই সমীক্ষাটি করা হবে। কিন্তু পিপিএসএস এই সমীক্ষায় আপত্তি জানায়।

২২ জুলাই থেকে জেলার সরকারি কর্মীদের একটি দল ভুঁইয়াপাল গ্রামে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করে। দুজন গ্রামবাসীর কাছ থেকে দুটি জমি অধিগ্রহণ করে তারা তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দেয়।

এই অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলাকালীন, ২৩-২৭ জুলাই, কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের অধীন জাতীয় বনাধিকার আইন কমিটি আশিস কোঠারির নেতৃত্বে পসকো প্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করছিলেন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের এলাকায় বনাধিকার আইন ২০০৬ লাগু করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুসারে গ্রামবাসীদের দাবি

পিপিএসএস মানুষজনকে সংগঠিত করেছিল যাতে তারা বনাধিকার আইন, ২০০৬-এর আওতায় তাদের অধিকার দাবি করে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ঐ আইনের আওতায় পড়েন। আইনে বলা হয়েছে যে শুধু বনবাসী জনজাতির মানুষরাই নয়, বনের অন্যান্য সব চিরাচরিত বাসিন্দারাও, যারা বন এলাকায় অন্তত ৭৫ বছর ধরে বাস করে আসছেন, তারা সবাই অধিকার দাবি করতে পারেন। ২৩ মার্চ, ২০০৮ ধিনকিয়া পল্লীসভা একটা প্রস্তাব পাস করে বনাধিকার কমিটি নির্বাচিত

করে এবং বনাধিকার আইনের আওতায় অধিকার দাবি করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই প্রস্তাবে বনাধিকার আইনের পরিচ্ছদ ৫-এর মাধ্যমে পল্লীসভাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে এলাকার চারপাশের পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ধিনকিয়ার ৫০০টি পরিবার বনাধিকার আইনের আওতায় অধিকার দাবি করে, কিন্তু সরকার সেগুলি বাতিল করে দেয়।

বনরক্ষা আইনের অধীনে ১২৫৩ হেক্টর বনভূমি অন্য কাজে লাগানোর আবেদন করে পসকো। এর অর্থ প্রায় ২.৮ লক্ষ গাছ কাটা পড়া। জঙ্গলে বসবাসকারী অন্তত ২২৫০ টি পরিবারের জীবিকা বিপন্ন হওয়া। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক 'নীতিগতভাবে' ছাড়পত্র দিয়ে দেন ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। ২০০৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর পরিবেশ ও বন মন্ত্রক চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। ২০১০ সালের ৫ জানুয়ারি পিপিএসএস এর বিরুদ্ধে পরিবেশ ও বনমন্ত্রককে চিঠি দেয়। তারা ও নাগরিক সমাজের আরও কিছু সংগঠন অভিযোগ তোলে যে বনভূমি অন্য কাজে দেওয়াটা বনাধিকার আইন ২০০৬-এর মৌলিক ভিত্তির বিরোধী। ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের একটি সার্কুলারে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে বনভূমিকে অন্য কাজে লাগানোর চূড়ান্ত অনুমতি দিতে হলে সেখানকার প্রতিটি গ্রামসভা থেকে বনাধিকার আইনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার চিঠি লাগবে এবং সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে তাদের সম্মতি (ইনফর্মড কনসেন্ট) নিতে হবে।

পিপিএসএস দাবি করে যে পল্লীসভাগুলির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার পদলে ওড়িশা সরকার ১৬ মার্চ ২০১০-এর চিঠিতে জগৎসিংহপুরের কালেক্টারের কাছে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছে, সাথে আছে বনাধিকার আইনের সাবডিভিশনাল স্তরের কমিটির মিটিংয়ের প্রসিডিং। এটা কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের নির্দেশের বিরোধী।

সিপিআই সংসদে এই বিষয়টি তোলে। দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই ও কলকাতায় বিভিন্ন গণসংগঠন, পসকো-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক নানা গোষ্ঠী এই ছাড়পত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা দাবি করে যে বনের ব্যাপারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক যে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়েছে তাতে আইনানুগ পদ্ধতি লঙ্ঘিত হয়েছে। ৮ জানুয়ারি, ২০১০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রক জানায়, যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তার পর 'জনগণের সচেতন সম্মতি (ইনফর্মড কনসেন্ট)' প্রয়োজন।

এই আদেশের পর, ৩ ফেব্রুয়ারি নুয়াগাঁও পল্লীসভা একটি প্রস্তাব পাস করে যে এইসব জমি অন্তত ৩০০ বছর ধরে চাষের ও বসবাসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই জমি পসকো-র হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। এর পর পর ধিনকিয়া ও গোবিন্দপুর পল্লীসভাও পসকো প্রকল্প বাতিল করার প্রস্তাব নেয়।

১৬ মার্চ ওড়িশা সরকার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখা একটি চিঠিতে দাবি করে যে তারা বনাধিকার আইনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। তারা বলে, স্থানীয় লোকদের এলাকার বনভূমির ওপর কোনো অধিকার নেই, পসকো প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকার বনভূমিতে বসবাসকারী বা সেখানে চাষ করে এমন কোনো জনজাতির মানুষ নেই। চিঠিটিতে আরো বলা হয় যে কোনো চিরাচরিত বনবাসী বা তিন প্রজন্ম বা ৭৫ বছর ধরে বনে চাষবাস করা মানুষ সেখানে নেই। কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রককে এভাবে ভুলপথে চালিত করার বিরোধিতা করে পিপিএসএস, তারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রকে অভিযোগপত্র দায়ের করে।

জাতীয় বনাধিকার আইন কমিটির বক্তব্য

২০১০ সালের ২৩-২৭ জুলাই কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় বনাধিকার কমিটি পসকো প্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করেন। তিন জন সদস্যের এই কমিটি তাদের রিপোর্টে জানায় যে ওখানে বনাধিকার আইনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। তারা জানান যে ওখানকার বনভূমিতে অন্যান্য বনবাসী মানুষের বসবাসের নথিপত্র ও মৌখিক প্রমাণাদি রয়েছে, ফলে তারা বনাধিকার আইন ২০০৬-এর আওতায় অধিকার দাবি করতে পারে। কমিটি তার রিপোর্টে জানায় যে রাজ্য সরকার তাদের ৩ প্রজন্মের বেশি বনভূমিতে চাষবাস করার দাবি মানে নি। বনভূমিকে পসকো প্রকল্পের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে পল্লীসভার প্রস্তাবও রাজ্য সরকার মানে নি।

কমিটির এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ৫ আগস্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে বনভূমিতে যেখানে বনবাসীদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয় নি সেখানে কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার সমীক্ষার কাজ ও জমি অধিগ্রহণের কাজ বন্ধ করে। তার পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক প্রকল্প এলাকায় কাজ বন্ধ করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছে প্রকাশ্যে তার তীব্র বিরোধিতা করেন।

২৭ জুলাই ২০১১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রক অবসরপ্রাপ্ত পরিবেশ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মীনা গুপ্তের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি কমিটি পাঠায় ওড়িশা সরকার বনাধিকার আইন ২০০৬ ও অন্যান্য পরিবেশগত প্রক্রিয়া মেনে চলছে কিনা তা দেখার জন্য। এই কমিটির চারজন সদস্যের মধ্যে তিনজনের বক্তব্য এই যে রাজ্য সরকার পরিবেশগত আইন বিশালভাবে লঙ্ঘন করেছেন, মিথ্যা তথ্যপ্রমাণ বানিয়েছেন, তথ্য গোপন করেছেন এবং বনাধিকার ভঙ্গ করেছেন। সদস্যরা আরো বলেন যে পসকো ইচ্ছাপূর্বক উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙা সম্পর্কিত তথ্য গোপন করেছে।

দুটি রিপোর্টেই বলা হয় যে ব্যক্তির ও কৌম অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার জন্য রাজ্য সরকারের উচিত স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ২০০৬ সালের আইনের ধারাগুলি আবার খতিয়ে দেখা।

মন্ত্রকের পালটি খাওয়া

এই দুই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করার বদলে পরিবেশ মন্ত্রক ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি পসকো ইস্পাত কারখানাকে শর্তাধীন (৬০টি শর্ত) অনুমতি দিয়ে দিল। একটি শর্ত এই যে রাজ্য সরকারকে আশ্বাস দিতে হবে যে একজনও বনাধিকার আইনের সুবিধার অধিকারী নেই। সেই আশ্বাসের পরই মন্ত্রক প্রকল্পটিকে চূড়ান্ত অনুমতি দেবে। পিপিএসএস মন্ত্রকের এই কাজটির নিন্দা করে বলে যে এটি একেবারেই বেআইনি। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার একটি রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে পসকো প্রকল্প এলাকায় কোনো চিরাচরিত বনবাসী নেই, বনাধিকার আইন ২০০৬ ভাঙা হয় নি।

গ্রামবাসীরা এতে ক্ষেপে গেলেন। ২০১১ সালের ২১ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ধিনকিয়া ও গোবিন্দপুর গ্রামে পল্লীসভা বসল, তাতে গ্রামবাসীরা পসকো প্রকল্পের বিরোধিতা করে প্রস্তাব পাস করলেন। গ্রামবাসীরা ২০০৬ সালের আইন অনুযায়ী তাদের দাবি আবারও পেশ করলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের দাবিতে কর্ণপাত করলেন না।

২ মে ২০১১, পরিবেশ মন্ত্রক পসকো প্রকল্পকে চূড়ান্ত বন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র দিলেন। ১২৫৩ হেক্টর বনভূমিতে ইস্পাত কারখানা ও বন্দর গড়ার অনুমতি দিলেন। পসকোকে অবশ্য এর জন্য আবশ্যিক বনসৃজন করার দায়িত্ব নিতে হবে। ওড়িশা সরকারের স্থির করে দেওয়া জেলায় এই পরিমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়া বনভূমিতেও নতুন করে বনসৃজন করতে হবে। পিপিএসএস এই চূড়ান্ত ছাড়পত্রের বিরোধিতা করে। তারা বলে যে রাজ্য সরকারের দেওয়া ভুল রিপোর্টের ভিত্তিতে এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রকের নিজের কমিটিই যখন বলেছে যে আগের দেওয়া ছাড়পত্র বাতিল করতে হবে কারণ তা দেওয়া হয়েছিল জালিয়াতির ভিত্তিতে এবং নানা বনাধিকার অগ্রাহ্য করে।

পিপিএসএস জোরদার দাবি জানায় যে ওড়িশা সরকারকে প্রকল্পের এলাকায় বনাধিকার আইনের প্রক্রিয়াগুলি নতুন করে স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক ভাবে নতুন করে করতে হবে, এবং দেখতে হবে যে বনাধিকার আইনমতে ও তার অধীন নিয়মাবলী অনুযায়ী ব্যক্তির ও কৌম অধিকার যেন ঠিকমতো রক্ষিত হয়।

এসব দাবি অগ্রাহ্য করে ২০১১ সালের ১৮ মে ওড়িশা সরকার আবার জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় এবং মানুষজনকে তাদের নিজেদের জায়গা থেকে উৎখাত করতে শুরু করে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি খুবই উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে। পিপিএসএস পরিকল্পনা করেছে যে যতদিন না পসকো-কে এই এলাকা থেকে উৎখাত করা যায় ততদিন তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে আরো জোরদার করবে। পিপিএসএস-এর দাবিগুলি হলো:

- প্রস্তাবিত এলাকা থেকে পুলিশ সরানো;
- গ্রামবাসীদের উপর থেকে মিথ্যা অভিযোগ তুলে নেওয়া;
- বনাধিকার আইন ২০০৬ লাগু করা এবং ব্যক্তির ও কৌম অধিকার স্বীকার করা;
- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কোম্পানির যেসব কর্মী পসকো প্রকল্পের জন্য বেআইনি জমি অধিগ্রহণের জন্য দায়ী, তাদের শাস্তিদান;
- রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পসকো যাতে প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে সরে যায় সেটা নিশ্চিত করা;
- সরকার যেন এলাকার সামাজিক ও পরিবেশগত বিকাশের পরিকল্পিত ও স্থায়ী (সাসটেনেবল) কাজকর্ম হাতে নেয়, যেমন ধানচাষে ও মাছচাষে সাহায্য

সংগ্রাম চলছে...

পসকো : সংযোজন

পার্থ সারথি রায়

ভারতের গণ-আন্দোলনগুলির মধ্যে পসকো-বিরোধী লড়াই-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ এই আন্দোলন রাজনীতির বিভিন্ন ধারাকে, বিভিন্ন সংগঠনকে নয়া-উদারনৈতিক লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ মঞ্চে জড়ো করেছিল। এটি ছিল প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মানুষ, কৃষক, পান-চাষি ও জেলেদের লড়াই, যা পসকো প্রতিরোধ সমিতি (পিপিএসএস) নামে সংগঠিত হয়। অন্য দিকে পিপিএসএস-এর নেতৃত্বে ছিল সিপিআই-এর লোকজন। ঐ এলাকায় সিপিআই-এর একটা দীর্ঘদিনের উপস্থিতি আছে। পিপিএসএস-এর অবিসংবাদী নেতা ছিলেন অভয় সাহু, সিপিআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য। স্থানীয় নেতা ধিনকিয়া-র শিশির মহাপাত্র সিপিআই সদস্য। রাজ্য রাজধানী ভুবনেশ্বরে এই সমিতির মুখপাত্র প্রশান্ত পাইকরায়ও সিপিআই সদস্য। সিপিআই-এর এই জোরালো উপস্থিতির ফলে এক দিকে সমিতি সিপিআই থেকে লোকবল (যেমন সিপিআই-এর ছাত্রফ্রন্ট এআইএসএফ কর্মী ও কৃষক সংগঠন কৃষক সমিতি থেকে) ও অন্যান্য সুবিধা পেয়েছে। অন্যদিকে, আন্দোলনটি সিপিআই-এর রাজনীতির একরকম লেজুড় হয়ে পড়ে। সিপিআই যখন শাসকপার্টি বিজেডি-র সঙ্গে নির্বাচনী জোট গড়ল, যে বিজেডি পসকো-র পেছনে মূল রাজনৈতিক শক্তি, পিপিএসএস-আন্দোলন তখন সংকটে পড়ে গেল, এবং স্থানীয় লোকেরা একে আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা দেন।

ওড়িশা থেকে এবং তার বাইরে থেকেও অনেক রাজনৈতিক

শক্তি এই আন্দোলনে যোগ দেয়, কিন্তু তাদের কারোর কাছেই এটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম ছিল না। এর ফলেই হয়ত সিপিআই পিপিএসএস-এ অত বড় জায়গা করে নিতে পেরেছিল। সিপিআই থাকার ফলে অন্যান্য বামপন্থী দল সরাসরি অংশ নেয় নি। সিপিআইএমএল (লিবারেশন), সিপিআইএমএল (রেড স্টার), সিপিআইএমএল (নিউ ডেমোক্রাসি) ও এসইউসি-র চার দলের জোট কিছুদিন আন্দোলনে সমর্থন জুগিয়েছে, আন্দোলনের সমর্থনে কখনো কখনো ভুবনেশ্বরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেছে। এসইউসিআই-এর কিছু সদস্য গ্রামে এসে থেকেছেন, স্থানীয় লোকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন— বিশেষ করে আন্দোলনের শেষ দিকে। প্রথম দিকে, যখন *সেজ*-এর বিরুদ্ধে ভারত জোড়া গণ আন্দোলনগুলির এক ব্যাপক মোর্চা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল, তখন মজদুর ক্রান্তি পরিষদের মতো কিছু সংগঠন বাইরে থেকে এসে কাজ করেছিল। ওড়িশার দক্ষিণের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সিপিআই(মাওবাদী) কাজ করে, তারাও এই আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়েছে, কিন্তু তারা মনে করেছে যে এটা তাদের প্রভাবিত এলাকা থেকে বড্ড দূরে, আর এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সরাসরি কাজে নামার উপযুক্ত নয়। ফলে সংসদীয় ও অসংসদীয় বামপন্থী পার্টিরা সবাই যদিও আন্দোলনকে সমর্থন যুগিয়েছে, এইসব সংগঠনের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল সীমিত।

পসকো-বিরোধী লড়াই অন্য সংগঠনের সদস্য ও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পসকো-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। এদের অনেকেই কিষান পট্টনায়েক সংগঠিত ওড়িশার সাবেকি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের লোক। আন্দোলনের প্রথম দিকে, গণ-সংগঠন লোকপক্ষ-র এক অত্যন্ত সম্মানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি রাজেন্দ্র ষড়ঙ্গি ২০০৮ সালে তাঁর অসময়ে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে, পিপিএসএস-এর প্রতিটি গণ-কর্মসূচিতে সমাজবাদী জন পরিষদের মতো সমাজবাদী গণ-সংগঠন অংশ নিয়েছে। কিন্তু এইসব অংশগ্রহণ প্রতীকী অংশগ্রহণ হয়ে থেকেছে, সংগঠনগুলির মধ্যে কোনো গণ-ভিত্তিক মোর্চা তৈরি হয়নি। বেশ কিছু এনজিও ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব গোষ্ঠীও বিভিন্ন সময়ে পসকো-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ওড়িশা হাইকোর্টে ও দিল্লীর গ্রিন বেঞ্চে যে জটিল আইনগত প্রক্রিয়া চলেছে তাতে তারা অনেকসময় অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন বালাসোরের এনভায়রনমেন্ট সাপোর্ট গ্রুপ ব্যাঙ্গালোর থেকে এই এলাকার পরিবেশ ও সামাজিক দিক নিয়ে বড় বড় রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে হাজার হাজার ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা দিয়েছেন হিউম্যান রাইট্স ল' নেটওয়ার্ক। টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্স ও ন্যাশনাল সেন্টার অফ অ্যাডভোকেসি স্টাডিজও এই আন্দোলনে একটা ভূমিকা রেখেছে। এ নয় যে এইসব সংস্থা আন্দোলনের ক্ষতি করেছে, কিন্তু পিপিএসএস এদের সাহায্যের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল আর তার ফলে আন্দোলনের কাজে কমতি পড়েছে, আন্দোলন র‍্যাডিক্যাল হয়ে উঠতে পারে নি। আর এনজিও-দের নিয়ে একটা সমস্যা হলো তাদের অংশগ্রহণ বেশিদিন থাকে না। যখন সুবিধা তখন তারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, আর অবস্থা কঠিন হলে চলে গেছে।

পসকো-বিরোধী আন্দোলনের একটা বড় দিক হলো কোনো মতাদর্শগত দিকনির্দেশের অভাব। অবশ্য কমবেশি প্রায় সব গণ-আন্দোলনেই এটি দেখা যায়। সাধারণভাবে বাম-গণতান্ত্রিক চরিত্রের হলেও, মতাদর্শগত জোরটা পড়ে শুধু বক্তৃতায় আর বুকনিতে। এই আন্দোলনের চরিত্রই এমন। এগুলি জমি ও জীবিকা রক্ষার সংগ্রাম, আত্মরক্ষাত্মক সংগ্রাম, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার রূপান্তরের সংগ্রাম নয়। ভারতে কোথাও এই ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্বের এজেন্ডায় তা থাকে না। ফলে আন্দোলনের যারা অংশ নেন সেই জনগণের চেতনার বিকাশও হয় না। আজ গোবিন্দপুরের পসকো-বিরোধী গ্রামের এক পানচাষি দুঃখ করে বলেন যে যদিও আট বছর ধরে তিনি ও সাথী গ্রামবাসীরা ভারতের সবজেয়ে বেশি জঙ্গি আন্দোলনের অংশ, কিন্তু তাঁদের কোনো মতাদর্শগত বিকাশ ঘটে নি। তিনি বলেন যে তিনি সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের, সব গণ-আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু সংগ্রামরত মানুষদের রাজনৈতিক বোধের বিকাশের চেষ্টা কেউ করে নি। কোনো রাজনৈতিক ক্লাস হয় নি, কোনো রাজনৈতিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দেননি নেতারা। তিনি বলেন যে তাঁর পানচাষের জমি হারানোর জন্য তাঁর দুঃখ আছে, কিন্তু এই আন্দোলন যে তাঁর গ্রামে কোনো মতাদর্শগত ছাপ রেখে যাবে না সে দুঃখ আরো বেশি।

স্বল্পকালীন বিচারে লাভবান হওয়ার দিকে এই ঝোঁক, শুধু জমি আর জীবিকা বাঁচানোর এই লড়াই, তাকে সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রাম নয়, এটাই ভারতে এই গণ-আন্দোলনগুলির এক সমস্যা। এর ফলে একধরনের মতাদর্শের ভিত্তিতে সারা ভারতে এই ধরনের আন্দোলনের জোট গড়ার প্রচেষ্টা বার বার বিফল হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জঙ্গি লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে এরকম কোনো জোট তৈরি হলে তা নয়া-উদারনৈতিকদের উদারনীতিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের প্রকল্পকে রুখে দিতে পারত, সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থীদের উত্থানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত। তাই, ভারতে গণ-আন্দোলনের এক দশক (পসকোর লড়াই তারই মধ্যে বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন) তাহ সংগ্রামী জনগণের দারুণ বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ সত্ত্বেও এদেশের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজটিকে আসলে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলন : নতুন প্রবণতার ইঙ্গিত

অমিত

বিগত কয়েক দশকে দিল্লী সংলগ্ন হরিয়ানা জেলার গুড়গাঁও-মানেসর-ধারুহেরা-বাওয়াল শিল্পাঞ্চল দেশের শিল্প-মানচিত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ আর তার সাথে সাথে দেশের শ্রমিক আন্দোলন— উভয়ের নিরিখেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে হাজির হয়েছে, এই অঞ্চলের বিশেষত অটোমোবাইল শিল্পের শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠনকে কেন্দ্র করে, সম্মানজনক কাজের পরিবেশ ও মজুরি ইত্যাদির দাবিতে ও বেআইনি ঠিকাপ্রথা সহ অত্যধিক কাজের বোঝার বিরুদ্ধে কারখানা মালিকদের সাথে বিগত একটি সময়ে ধারাবাহিক সংঘর্ষ চালিয়েছে ও এখনো চালাচ্ছে। আজকের শ্রমিক আন্দোলনের তুলনামূলক এক নিথরতার সময়ে এই অঞ্চলের হোন্ডা, রিকো, মারুতি-সুজুকি সহ নানান ফ্যাক্টরি স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা, জঙ্গিপনা ও সম্ভাবনার নিরিখে গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলের এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে হাজির হওয়া সাধারণ অভিজ্ঞতাকে এবং তার সাথে এই অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়নের স্তরে বিকাশমান নতুনত্বকে বোঝার চেষ্টা করব।

বিগত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সস্তা শ্রম আর নতুন বাজারের সন্ধানে এগিয়ে থাকা পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে পণ্য উৎপাদনের কাজ এখনো পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই মূলত সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দ্বারা পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া বিশ্বজুড়ে এক 'উৎপাদন শৃঙ্খল' তৈরি করেছে। কোনো কমপিউটারের ডিজাইন হয়তো আমেরিকায় হচ্ছে, আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশ তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরে তৈরি হয়ে চীনে সেগুলো জোড়ার কাজ করা হচ্ছে, তারপর ভারতে তা বিক্রির জন্য আসছে। কোনো একটি দেশের ভেতরেও পণ্য উৎপাদনের এক আঞ্চলিক শৃঙ্খল তৈরি হচ্ছে। যেমন গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলে মারুতি সুজুকিতে যেই গাড়ি তৈরি হয়, তার আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশ এলাকার আলাদা আলাদা কয়েকশো ভেণ্ডর কোম্পানি থেকে আসে, কিছু আসে বিদেশ থেকে, কিছু আসে এমনকি ফরিদাবাদের বস্তি এলাকার 'ইনফরমাল' উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে, ফলে মারুতি সুজুকি গাড়ি তৈরির প্রায় এক লাখ শ্রমিক বাস্তবত মারুতি সুজুকির ফ্যাক্টরির বাইরে কয়েকটি ছোট বড় ফ্যাক্টরি এমনকি বস্তি এলাকার উৎপাদন ক্ষেত্র অবধি ছড়িয়ে আছে। এবং এই শ্রমিকদের সিংহভাগ হলো ঠিকা শ্রমিক সহ নানা ধরনের অসংগঠিত শ্রমিক। মারুতি কোম্পানিতে মূলত যন্ত্রাংশ 'এসেম্বলি' হয়ে ফাইনাল প্রডাক্ট তৈরি হয়। এক একটি যন্ত্রাংশের জন্য একাধিক ভেন্ডর কোম্পানির সাথে মাদার প্লান্ট অর্থাৎ মারুতির চুক্তি আছে, যাতে কোন একটি সাপ্লায়ার ভেন্ডর কোম্পানিতে উৎপাদনের গোলমাল বা শ্রমিক অসন্তোষ হলে অন্যগুলি থেকে যন্ত্রাংশ সাপ্লাই অব্যাহত থাকে। 'জাস্ট-ইন-টাইম' উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতি ঘন্টায় কয়েকবার পর্যন্ত ভেন্ডর কোম্পানিগুলি থেকে যন্ত্রাংশ মাদার প্লান্টে 'এসেম্বলি'র জন্য আসে। এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ষাট-সত্তরের দশক অবধি পণ্য উৎপাদনের যে 'ফোর্ডীয়' প্রণালী বিশ্ব জুড়ে প্রভাবশালী ছিল, তার থেকে অনেকটাই আলাদা। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দমোটরে হিন্দুস্তান মোটর্স-এর গাড়ি তৈরির ফ্যাক্টরি এই পুরানো ধাঁচের ফ্যাক্টরি ছিল, যেখানে এক ছাদের নিচে মূলত স্থায়ী শ্রমিক দিয়ে প্রায় সব আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশ তৈরি হত, ফোরজিং ও ফাউন্ড্রির কাজ হত, গাড়ির এসেম্বলি হত।

এই ধরনের পরিবর্তন ভারতে ষাট-সত্তরের দশক অবধি বেশ শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলো। প্রথমত, উৎপাদনের ব্যাপক আউটসোর্সিং আর সাব-কন্ট্রাক্টিং-এর সাথে সাথে কোনো এক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে গেল, কারণ একটি ভেন্ডর কোম্পানিতে কাজ বন্ধ থাকলেও অন্য কোম্পানি বা সেই একই কোম্পানির অন্য ইউনিট মাদার প্লান্টকে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারে। কারখানাতে কর্মরত শ্রমিকদের বেশিরভাগটাই ঠিকা-ক্যাজুয়াল-ইনফরমাল শ্রমিক হিসেবে নেওয়া হলো, যাদের স্থায়ী শ্রমিকদের সাথে ইউনিয়ন করার অধিকার নেই। ফলে মুখ্য উৎপাদনের ওপর বেশি কাজের বোঝা চাপিয়ে অতিরিক্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই, ভিআরএস ইত্যাদি দেওয়া চলতে লাগল। এর সাথে পুঁজির এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে চলাচলের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় তার বার্গেন করার শক্তি অনেক বেড়ে গেল। পুঁজির বিনিয়োগকে নিজের রাজ্যে বা দেশে ধরে রাখতে সরকারগুলিও মালিক-তোষণের নীতি বেশি বেশি করে নিতে থাকল। ফলে গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চল সহ এনসিআর গুজরাট বা তামিলনাড়ুর মতো পুঁজির বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্রগুলিতে ইউনিয়ন বানানোর অধিকার, শ্রম আইন-এর সুবিধা, শ্রমিকদের কাজের ও সামাজিক সুরক্ষা— এই বিষয়গুলি ক্রমেই অলীক হয়ে উঠতে লাগলো। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনের শক্ত ঘাটি ছিলো, সেখান থেকে পুঁজি অন্য এলাকায়, যেখানে শ্রমিক সংগঠিত নয় ও শ্রম সস্তা, সেখানে উৎপাদন সরিয়ে নিয়ে গেলো। প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, যা ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত 'ফোর্ডীয়' উৎপাদন প্রণালীতে শ্রম আইন নির্দেশিত শ্রমিক-মালিকের চুক্তির ওপর নির্ভর করে বিকশিত হয়েছিল, এই নতুন পরিস্থিতিতে আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। মালিকদের আক্রমণের মুখে দুর্বল হতে হতে বেশিরভাগ জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুকিয়ে গেলো। যেখানে ইউনিয়ন রয়ে গেলো, সেখানেও লড়াই-এর রাস্তার বদলে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে দালালি অথবা মানিয়ে চলার প্রবণতা মুখ্য ধারা হিসেবে হাজির হলো। সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক বেসরকারিকরণ, ঠিকা প্রথা, ছাঁটাই আর অন্যদিকে একটু বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের লড়াকু মানসিকতার অভাব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জঙ্গিপনাকে ক্ষয়িষ্ণু করে দিলো। মুখ্য ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আপসকামিতার বিপরীত বিপ্লবী শক্তিগুলির নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবে লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়েছে। শ্রমিকদের আর্থিক দাবিদাওয়ার পরিধিকে ছাড়িয়ে কোথাও সরাসরি বিপ্লবী বক্তব্যের আধারে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন'-এর প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। দত্ত সামন্ত, শঙ্কর গুহনিয়োগী, এ কে রায় প্রভৃতির নেতৃত্বে কিছু সময়ের জন্য স্থানীয় স্তরে অত্যন্ত প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সহ শ্রমিক আন্দোলনের বিকল্প কোনো ধারা সমাজে প্রভাবশালী হতে পারেনি। গত আড়াই-তিন দশকে পুঁজিপতিদের আক্রমণের সামনে শ্রমিকদের প্রতিরোধ আরো ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রায় শূন্যতার পাশাপাশি আজকের সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে শ্রমিকদের আন্দোলনও ষাট-সত্তরের দশকের তুলনায় এক অতি দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চল সহ আমাদের দেশে পুঁজির বিনিয়োগের নতুন নতুন এলাকাগুলিতে শ্রমিকদের লড়াইয়ের যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যাচ্ছে, তা বিশেষ মনোযোগের দাবি করে। এই ধরনের শিল্প-বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষ করে অটোমোবাইলের মতো প্রযুক্তি-নির্ভর ও পুঁজি-নির্ভর শিল্পে, একের পর এক শ্রমিক আন্দোলন শাসকের 'বিকাশ'-এর মডেলকে সরাসরি প্রশ্নের মুখে ফেলছে ও ভবিষ্যতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জন্য নতুন উৎপাদন হাজির করেছে।

দিল্লী সংলগ্ন গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চল বিগত তিন দশকে বিশেষত ১৯৮৩ সালে মারুতি ও ১৯৮৪ সালে হিরো হোন্ডা-র উৎপাদন শুরু হওয়া ও তার মাধ্যমে অসংখ্য ভেন্ডর কোম্পানি স্থাপিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে দেশ-দুনিয়ার অটোমোবাইল উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর সাথে ২০০৭ সাল থেকে চালু হয়ে নীল নকশায় ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শিল্প পরিকল্পনা 'দিল্লী মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এই গুড়গাঁও-মানেসর-ধারুহেরা-বাওয়াল শিল্পাঞ্চল। ২০০০ সালে মারুতির গুড়গাঁও প্লান্টে টানা তিন মাসের শ্রমিক ধর্মঘট এই এলাকার শ্রমিক আন্দোলনে এক বড় ঘটনা ছিল। এই আন্দোলনের পরাজয়ের পর মারুতি ম্যানেজমেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়, ব্যাপক সংখ্যায় ঠিকা শ্রমিক ভর্তি করে ও স্থানীয় শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে ভিআরএস দিয়ে দেয়। এর পরের কয়েক বছর ধরে চলা শ্রমিকদের এক নিরাশার পর্ব শেষ হয় ২০০৫ সালে মানেসরে হোন্ডা কারখানায় ব্যাপক পুলিশি দমন ও লাঠি-চার্জের মুখোমুখি হয়ে শ্রমিকদের ঐতিহাসিক লড়াই, ধর্মঘট ও ইউনিয়ন গঠনে সফলতায়। এই সংঘর্ষে স্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিক একসাথে লড়লেও ইউনিয়ন গঠনের কয়েক বছরের মধ্যে তুলনায় বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে এক দুরত্ব তৈরি হয়। তবুও এই সংঘর্ষের সফলতার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পুরো এলাকাতে পড়ে ও একের পর এক কোম্পানিতে ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। হোন্ডা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকার কারণে এলাকায় এআইটিইউসি ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ সালে রিকো কারখানাতে ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে ৪৪ দিনের শ্রমিক ধর্মঘট, কোম্পানির গুন্ডার গুলিতে অজিত যাদব নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু, তারপর চক্রান্ত করে হত্যায় দায় শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে শ্রমিক নেতাদের জেলে পাঠানো, ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়া ও আন্দোলনের পরাজয় পুরো এলাকার শ্রমিকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। শ্রমিক হত্যার পর এলাকার প্রায় এক লাখ শ্রমিকের এক দিনের ধর্মঘট হয়েছিল ও হাজারে হাজারে শ্রমিক রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু শেষ আন্দোলনের ব্যর্থতা এআইটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের উপর শ্রমিকদের একটা অংশকে সন্দিহান করে তোলে। এরপর ২০১১ সালে ঐতিহাসিক মারুতি আন্দোলন হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে তিন তিনটে ধর্মঘট, দু-দুবার প্লান্ট দখল করে ভিতরে বসে পড়া, ঠিকা শ্রমিকদের কাজ থেকে হঠানোর প্রতিবাদে স্থায়ী শ্রমিকদের তৃতীয় ধর্মঘটের সময় মারুতির শ্রমিকদের সমর্থনে এলাকার আরো অনেক কোম্পানিতে একসাথে ধর্মঘট হওয়া— এসব মিলে আন্দোলনের অভিঘাত ফ্যাক্টরি বা এলাকা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি দেশের বাইরেও পৌঁছায়। কিন্তু ২০১২ সালের ১৮ই জুলাই মানেসর প্লান্টে ম্যানেজমেন্ট ও তাদের গুন্ডাদের সাথে শ্রমিকদের সংঘর্ষ ও প্লান্টে আগুন লেগে যাওয়ার পর এক ম্যানেজারের ধোঁয়ায় দম আটকে মৃত্যু

হওয়ার পর শ্রমিকদের ভয়ানক দমনের মুখোমুখি হতে হয়। প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিকের কাজ থেকে বহিষ্কার, সমগ্র ইউনিয়ন বডি সহ ১৪৭ জন শ্রমিককে জেলে পাঠানো (যাদের আজও জামিন মেলেনি) ও পুরো মানেসর শিল্পাঞ্চল থেকে পুলিশি দমনের আবহাওয়া পুরো এলাকায় পরবর্তী এক বছরেরও বেশি সময় জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের এক ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করে। কিন্তু তারপরই শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে এলাকা জুড়ে শ্রমিকদের এক পাল্টা আন্দোলনের ঢেউ তৈরি হয়। মানেসরে মুনজাল কিরু, অটোফিট, নাপিনো, নিমরানায় ডাইকিন, গুড়গাঁও-এর নরসিংপুর এলাকায় বাজাজ মোটরস, বাওয়াল শিল্পাঞ্চলে নেরোলাক, ঘোষি ইন্ডিয়াতে লম্বা শ্রমিক আন্দোলন চলে। বর্তমানেও বিগত কয়েকমাস জুড়ে এই শিল্পক্ষেত্রের মানেসরে ব্যাক্সটার, অটোলিভ, ভিয়ারী শিল্পাঞ্চলে শ্রীরাম পিস্টন, বাওয়াল শিল্পাঞ্চলে পস্কো, মিন্ডা ফুরুকাওয়া, তালব্রোজ ইত্যাদি ফ্যাক্টরিতে ম্যানেজমেন্ট, তাদের 'বাউন্সার' অর্থাৎ ভাড়াটে গুন্ডা ও পুলিশের দমনের সামনে দাঁড়িয়েও রোদ-জল-বৃষ্টি উপেক্ষা করে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন, কোম্পানির দ্বারা লকআউট-এর মুখোমুখি হয়ে লড়াই চালিয়েছেন। পুরো শিল্পক্ষেত্র জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে মালিকী আক্রমণের মুখে শ্রমিকরা নিজেদের আধিকারের দাবিতে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে লড়াইয়ের রাস্তায় এগিয়েছেন।

গুড়গাঁও-মানেসর-ধারুহেরা-বাওয়াল শিল্পাঞ্চলে এই শ্রমিক আন্দোলনের কিছু বিশেষ প্রবণতা ও নতুনত্ব বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে চলা পুরোনো ধারার প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। প্রথমত, গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলে যেসব কারখানায় শ্রমিকরা লড়াই চালাচ্ছেন বা চালিয়েছেন, সেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন হয় স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রকৃতির, নয়তো ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য কোনো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জুড়লেও বাস্তবে ফ্যাক্টরি স্তরে স্বাধীনভাবে বা প্রায় স্বাধীনভাবে শ্রমিক নেতৃত্ব কাজ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন। এই এলাকায় তীব্র শ্রমিক-মালিক বিরোধের পটভূমিতে দালাল বা আপসকামী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি দিয়ে যে লড়াই লড়া যাবে না এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না, নিজেদের অভিজ্ঞতায় একভাবে শ্রমিকরা সেটা অনুভব করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে বেশ কিছু ফারাক এখানে লক্ষ্য করা যায়। এখানে কোনো ফ্যাক্টরিতে একটার বেশি শ্রমিক ইউনিয়ন নেই, কারণ শ্রমিকরা স্পষ্ট বোঝেন যে মালিকের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ফ্যাক্টরি স্তরে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। ফ্যাক্টরি স্তরের কোনো শ্রমিক ইউনিয়নে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক বা সেই কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক নন এমন কেউ নেই। মালিকদের সাথে দরকষাকষি, আন্দোলনের দিশা তৈরি করা ইত্যাদি শেষত কারখানার শ্রমিকদের হাতে। মারুতি শ্রমিকদের সমগ্র আন্দোলনে নানা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সাহায্য সত্ত্বেও স্বাধীন ধারার শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। শুধু মারুতি নয়, সমগ্র শিল্পাঞ্চলেই নানান জায়গায় নতুন প্রজন্মের শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই একটা আত্মবিশ্বাসী লড়াকু অংশ নেতৃত্বে উঠে এসেছে। এই প্রশ্নে মারুতি শ্রমিকদের লড়াই ছাড়াও সম্প্রতি বাওয়াল শিল্পাঞ্চলের অভিজ্ঞতাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক বছরে একের পর এক কোম্পানিতে লড়াই-আন্দোলন করে এই অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্প-এলাকার শ্রমিকরা ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এলাকার এই ইউনিয়নগুলি কোনো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন বা বাইরের কোনো সংগঠিত শক্তির উদ্যোগ বা প্রভাব ছাড়াই নিজেরা পুরো এলাকায় মালিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ার জন্য ইউনিয়নগুলির সংযুক্ত 'এসোসিয়েশন' বানিয়েছেন, যা একটি জীবন্ত প্লাটফর্ম, প্রতি মাসে অন্তত দুটি করে মিটিং হয় ও পুরো এলাকায় শ্রমিক আন্দেলনের বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকরা আন্দোলনের নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন, যা ট্রেড ইউনিয়নের আইনি পরিধির থেকে অনেক সময়ই আন্দোলনকে তার বাইরে নিয়ে যায়। এটা মাথায় রাখা দরকার যে এই পুরো এলাকায় কোনো ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন করানো খুবই কঠিন কাজ। কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের সম্মতি ছাড়া শ্রম বিভাগ রেজিস্ট্রেশন দেয় না, তা এবিষয়ে আইন যাই থাকুক আর কাগজপত্র যতই ঠিকঠাক থাকুক। ফলে তীব্র লড়াই-আন্দোলন, ধর্মঘট, নেতৃত্বের ছাঁটাই ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই মারুতি, হোন্ডা, হিরো হোন্ডা সহ বিভিন্ন কেম্পানিতে শ্রমিকদের এই অধিকার আদায় করতে হয়েছে ও হচ্ছে। ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার পরেও ডিমান্ড লেটারের ওপর সম্মানজনক সেটলমেন্ট করতেও ইউনিয়নকে বিস্তর লড়াই করতে হয়। প্রথমে শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে কারখানার বাইরে গেটের সামনে ধর্নায় বসে থাকতেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ মিটার বা ১০০০ মিটারের 'স্টে' নিয়ে নেওয়া হত, অর্থাৎ শ্রমিকরা কোম্পানির গেটের থেকে এতটা দূরত্বের মধ্যে বসতে পারবেন না। তার পর বাইরে থেকে ঠিকা শ্রমিক এনে ফ্যাক্টরি চালানোর চেষ্টা করা হত এবং অপেক্ষা করা হত যতদিন না বাইরে বসে থাকা শ্রমিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। এভাবেই ২০০০ সালে মারুতি গুড়গাঁওয়ের আন্দোলন, ২০০৯ এ রিকো-সানবীম এর আন্দোলন, ২০১০ এ ডেনসো শ্রমিকদের আন্দোলন ভাঙ্গা হয়েছিল। ২০১১ সালে জুন মাসে মারুতি মানেসরের শ্রমিক

ধর্মঘটের সময় মারুতি শ্রমিকরা যখন প্লান্ট কব্জা করে ভেতরেই বসে পড়ল, তখন থেকে একের পর এক শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা লড়াইয়ের সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, প্লান্ট দখল করে ভেতরেই বসে পড়েছে। একটা ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের লড়াইয়ের সমর্থনে বেশ কয়েকবার এই এলাকায় অন্য কোম্পানিতে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করেছে, তা সে ২০১১-র অক্টোবরে মারুতি আন্দোলনের সময় মানেসরে হোক বা সম্প্রতি ব্যাক্সটারের সমর্থনে মানেসরে বা মিন্ডা ও পস্কো-র সমর্থনে বাওয়ালে হোক। 'গুড কন্ডাক্ট বন্ড' সই করে ধর্মঘট শেষ করে কারখানার ভেতরে যাওয়ার সাতদিন বাদেই মারুতি শ্রমিক কোনো বন্ডের তোয়াক্কা না করে ফের ধর্মঘট করেছে ও প্লান্ট কব্জা করে নিয়েছে। অন্যান্য কোম্পানিতেও লাগাতার বন্ড ইত্যাদির তোয়াক্কা না করার এই ঘটনা ঘটছে। এখন কথা হলো, ডিমান্ড নোটিশ ছাড়া ধর্মঘট করা, ধর্মঘট করে প্লান্ট কব্জা করে ভেতরেই বসে যাওয়া, অন্য কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে নিজের কারখানায় কাজ বন্ধ করা, লিখিত বন্ধের তোয়াক্কা না করা— এই সবই শ্রম আইনের ভাষায় 'বে-আইনি'। কিন্তু যখন শ্রমিকরা দেখেন যে পুরো এলাকায় মালিকদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে তাদের 'বে-আইনি' কর্যকলাপ— কোনমতেই ইউনিয়ন না হতে দেওয়া, গুন্ডা দিয়ে শ্রমিক পেটানো (রিকো আন্দোলনে গুলি করে শ্রমিককে হত্যা অবধি করা), ঠিকা শ্রমিক দিয়ে মুখ্য উৎপাদনের কাজ করানো, সেটলমেন্ট প্রক্রিয়া ইচ্ছেমত ভেস্তে দেওয়া, ইচ্ছেমত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো দোষ প্রমাণের জন্য আইন অনুসার অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ছাড়াই কোনো শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে নেতৃত্বকারী শ্রমিকদের বহিষ্কার করা— এসব নিয়ে শ্রম বিভাগ অন্ধ, প্রশাসন মালিকের পক্ষে, আদালতে ১০-১৫ বছরের আগে কেস খতম হয় না, তখন শ্রম আইন দ্বারা বেঁধে দেওয়া ট্রেড ইউনিয়নের ক্রমাগত সংকুচিত পরিধিতে আন্দোলনকে বেঁধে রাখার দায় তারা নেন না, আর প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির আপসকামী অন্তঃসারশূন্য কার্যকলাপে তাদের বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, এটা সত্যি যে গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ততা এখনও ফ্যাক্টরি ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে মূলত সীমাবদ্ধ। তবুও ফ্যাক্টরি স্তরে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এই লড়াইগুলির মধ্যে আন্দোলনের পরিধি ফ্যাক্টরি স্তরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার বাস্তব-তাড়িত প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টা রয়েছে। ধারুহেরা-বাওয়াল-ভিয়ারী এলাকায় আন্দোলনের শক্তি বাড়াতে আশেপাশের গ্রামের কৃষক জনতার সাহায্য নেওয়া, পঞ্চায়েত করানো ও আন্দোলনের কমিটি তৈরি করা, বাওয়াল এলাকার 'এসোসিয়েশন' তৈরি হওয়া', মারুতি-র আন্দেলনের মধ্যে দিয়ে সুজুকি গ্রুপের চার ইউনিট একসাথে 'মারুতি সুজুকি মজদুর সংঘ' তৈরি বা নাপিনো অটো-র তিনটে ইউনিট-এর একসাথে নিজেদের নিজেদের কারখানা কব্জা করে ধর্মঘট করা, মানেসরে একসাথে ১০-১৫টা কোম্পানিতে কাজ বন্ধ করা— আন্দোলনের প্রয়োজনে একই কোম্পানি, গ্রুপ বা এলাকা স্তরে নীচে থেকে তৈরি হওয়া এই একতার চেষ্টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আনুষ্ঠানিক একতার এক বিপরীত প্রক্রিয়া।

চতুর্থত, ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে কোনো কোম্পানিতে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক একসাথে ইউনিয়ন করতে পারে না। কিন্তু গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলে ইউনিয়ন তৈরির লড়াইতে স্থায়ী-ট্রেনি-ঠিকা সমস্ত শ্রমিক বারবার একসাথে লড়েছে, কারণ 'ইউনিয়ন' প্রতীকটি সামনে রেখে এই লড়াইগুলো আসলে আলাদা আলাদা ভাবে এবং একসাথে সমস্ত শ্রমিকের সুস্থ কাজের পরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, সম্মান ইত্যাদি অসংখ্য ব্যক্ত-অব্যক্ত দাবিতে ও ম্যানেজমেন্টের শোষণ-অত্যাচার, গায়ের জোরে ও শ্রম বিরোধী প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই কারণেই বেশিরভাগ সময়েই এই লড়াইগুলো প্রথাগত ট্রেড ইউনয়নের ধারায় কোনো 'চার্টার অফ ডিমান্ড' জমা করে শুরু হয় না, এমনকি লড়াই চলাকালীন-ও এমন কিছু জমা করা হয় না। এর কারণ শুধু কারখানার শ্রমিক নেতৃত্বের ট্রেড ইউনিয়ন অজ্ঞতা ভাবলে ভুল করা হবে। যে একতার জমিতে এই লড়াইগুলো হচ্ছে, সেখানে শুধু স্থায়ী শ্রমিকদের মাইনে ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর দাবি তুললে এই জমিটাকেই অস্বীকার করা হবে। আসলে অটোমোবাইল শিল্পে পুঁজির নতুন বিনিয়োগের জায়গাগুলিতে লড়াই-আন্দোলনগুলো তৈরি হওয়ার একটা বড় কারণ ক্রমাগত পুঁজি-নিবিড় প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে কাজের অত্যাধিক বোঝা, দমনকারী ও সম্মানহীন কাজের পরিবেশ, আর তার সাথে একসাথে উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে কার্যরত শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের ম্যানেজমেন্ট-কে আঘাত করার ও দাবি আদায়ের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা। শ্রমিকদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে হাজির হয় যে তারা কাজ ক'রে হাজার হাজার কোটি টাকার কী বিপুল সম্পদ ও কোম্পানির কী বিপুল মুনাফা তারা তৈরি করছে। অথচ তারা নিজেরা এসবের ছিঁটেফোঁটারও অংশীদার নয়, বরং তীব্র শোষণ-দমনের পাত্র। সব মিলে ম্যানেজমেন্ট আর মালিকের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা তৈরি হয়, যা স্থায়ী-ট্রেনি-ঠিকা সব শ্রমিকই অনুভব করে। আর, এর বিরুদ্ধে আঘাত করে অধিকার আদায়ের ক্ষমতা তখনই সম্ভব যখন সব অংশের শ্রমিক একসাথে আসবে। ২০১০ সাল অবধি অনেকবার এমন হয়েছিল যে শুরুতে হোন্ডা সহ নানা কোম্পানিতে স্থায়ী ঠিকা শ্রমিক একসাথে লড়লেও পরবর্তীতে স্থায়ী শ্রমিক খানিক

সুবিধা পাওয়ার পরে ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলনে সহযোগিতা করেনি। কিন্তু ২০১১-র মারুতি আন্দোলনে ঠিকা শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, ইউনিয়ন গঠনের পর ঠিকাপ্রথার অবসানের দাবি ওঠে। তার পরবর্তী সময়ে পুরো এলাকায় স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের ঐক্য আরো শক্ত হয়েছে। অটোফিট কারখানায় ধর্মঘটের পর সেটলমেন্ট-এর সময় যখন মালিক বলছে যে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিককে সব সুবিধাসহ কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু ঠিকা শ্রমিকদের বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়, এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন, শ্রমিকরা দুমাস ধর্মঘটের ক্লান্তির পরেও এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ধর্মঘট জারি রাখছেন ও শেষত ইউনিয়নের দুই নেতাকে বাইরে রেখে সমস্ত ঠিকা শ্রমিকের কাজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রম আইন শ্রমিকদের যে বিভাজনকে স্বীকৃতি দেয়, এই আন্দেলনগুলির অন্তর্বস্তু মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সেই বিভাজনকে বাস্তবত চ্যালেঞ্জ করে। ফলে এই আন্দোলনগুলি ট্রেড ইউনিয়নের স্থায়ী শ্রমিকদের মাইনের দর কষাকষির বাইরে চিরন্তন শ্রমিক-মালিক অন্তর্বিরোধের রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে এক এমন তীব্রতায় উপস্থিত হয়, যা প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাঠামো অনেক সময়েই ধারণ করতে পারে না।

পঞ্চমত, প্রথাগত পার্টি-নির্ভর নেতা-নির্ভর ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ব্যাপক শ্রমিকের মতামত ও স্বতন্ত্র উদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অন্তরায় হয় এবং এক অগণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর জন্ম হয়। পাশাপাশি কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট ও ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে কথাবার্তা ও দরকষাকষির জন্য মধ্যবর্তী একটা স্তর তৈরি হয়, যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা বটে, কিন্তু কারখানার ব্যাপক শ্রমিকের জীবন ও কারখানার কাজের পরিবেশ বিষয়ে তাদের জানাবোঝা তথা জানাবোঝা-র চেষ্টা অত্যন্ত কম। গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনে যখন অপরিপক্কতা সত্ত্বেও কমবয়সী শ্রমিকরা নিজেরাই নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন, তাতে কখনো হয়তো আন্দোলনে ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ কারখানাতেই তুলনামূলক একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শ্রমিকরা জন্ম দিতে পেরেছেন। মারুতি শ্রমিকদের আন্দোলনে ইউনিয়ন বডি ছাড়াও প্রতিটি লাইনের শ্রমিকদের মতামত নিতে লাইন কো-অর্ডিনেটর ব্যবস্থা, অটোফিট আন্দোলনে ইউনিয়ন বডি ছাড়াও সাপোর্ট বডি ও অর্ধেক-অর্ধেক স্থায়ী-ঠিকা শ্রমিক প্রতিনিধি সহ লাইন কো-অর্ডিনেটর সিস্টেম, বেশির ভাগ আন্দোলনেই জেনারেল বডি-র গুরুত্ব ইত্যাদি নানা অনুশীলন গড়ে উঠেছে। যার ফলে স্থাপিত নেতৃত্বকে কোম্পানি ছাঁটাই করে দেওয়ার পরেও নতুন নেতৃত্ব উঠে এসেছে ও আন্দোলন চলেছে। মারুতির আন্দোলন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ জন্ম নেওয়ায় হরিয়ানার মতো রক্ষনশীল সমাজেও ব্যাক্সটার, মিন্ডা, অটোলিভ সহ নানা আন্দোলনে মহিলা শ্রমিকরা পুরুষ সাথীদের সাথে একসাথে লড়েছে, মাসের পর মাস কারখানার গেটে ধর্নায় থেকেছে, ফ্যাক্টরি কব্জা করে নারী-পুরুষ শ্রমিক একসাথে দিনে ও রাতে কারখানার ভেতর থেকেছে। মারুতি আন্দোলনের নেতৃত্বে মুসলিম ও দলিত শ্রমিকরা উঠে এসেছে।

আজ যখন শাসক শ্রেণী একদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও অবাধ মুনাফার জন্য দিল্লী-মুম্বাই শিল্প করিডোর, বেঙ্গালুর-মুম্বাই করিডোর, হায়দ্রাবাদ-চেন্নাই করিডোর, অমৃতসর-কলকাতা করিডোর ইত্যাদির মাধ্যমে ও বড় বড় 'ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং জোন' তৈরি করে দেশের শিল্প-মানচিত্রে ব্যাপক রদবদল ঘটাতে চাইছে এবং তার সাথে সাথে ব্যাপক জমি অধিগ্রহণ, শ্রমিক বিরোধী শ্রম আইন সংস্কার, সামাজিক সুরক্ষা ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি নীতি মোদী সরকারের মাধ্যমে সজোরে উপস্থিত করছে, তখন এটা স্পষ্ট যে আগামী একটা সময়ে আমাদের দেশে, বিশেষত এই নতুন পুঁজি বিনিয়োগের জায়গাগুলিতে, অন্তর্বিরোধ আরো তীব্র হবে— তা সে স্বতস্ফূর্ত শ্রমিক-মেহনতি জনতার বিক্ষোভ হোক বা জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন হোক। এর নানা ইঙ্গিত আজ আমরা দেখতেও পাচ্ছি। কিন্তু এটাও সত্যি যে সামগ্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সহ শ্রমিক আন্দোলন আজ এক দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এই সময়টা শুধু নিরাশার নয়। আন্দোলনের পুরোনো জমি বদলেছে, আর এই পুরোনো জমির ওপর তিন-চার দশক আগের খাড়া হওয়া আন্দোলন আর শ্রমিক সংগঠনের মডেল এই বদলকে ধারণ করতে না পেরে একদিকে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের শ্রমিকরা হাজার অজ্ঞতা সত্ত্বেও খণ্ড-বিখণ্ড ভাবে এই আক্রমণের প্রতিরোধে খাড়া হচ্ছে, আন্দোলনের ও সংগঠনের নতুন প্রয়োগের চেষ্টা করছে, যা ভবিষ্যতের নতুন ধারার আন্দোলনের জমি তৈরি করার ক্ষমতা রাখে।

এই ঘটনা শুধু গুড়গাঁও-এনসিআর নয়, তামিলনাড়ু, গুজরাত, উত্তরাখন্ড থেকে শুরু করে এমনকি ভারতের বাইরেও চীন, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা— সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনে পুঁজির বিনিয়োগের প্রতিটি নতুন এলাকায় দেখা যাচ্ছে। এই বৈপরীত্যের মাঝে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিগুলির সামনে এই চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে যে কীভাবে এই ধারাকে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের প্রতিরোধে ও ব্যবস্থা বদলের লড়াইতে সংগঠিত রূপ দেওয়া যায়। এর জন্য নতুনকে চিনতে পারার নমনীয়তা ও পুরোনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রয়োগের সাহস এই সময়ের দাবি।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি দিকদর্শন হিসেবে নিয়মগিরি সংগ্রামের গুরুত্ব

ফেলিক্স পাডেল

গত এপ্রিল মাসে সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, নিয়মগিরির এক ডজন গ্রামে (জুলাই-অগস্ট, ২০১৩) যে গ্রামসভাগুলি বসে, সেগুলিকে ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির চরম নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যায়। যদিও সমগ্র সিডিউল এলাকাতে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নীতির ফলে গণতন্ত্র বিপর্যস্ত, তবুও আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে তা এক অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য।

একটি আদিবাসী সভার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সেখানে কোনরকম অদৃশ্য চাপের মুখে— তা সে সরকারি বা মাওবাদী বা অন্য রাজনৈতিক পার্টি, যারই হোক না কেন— নতিস্বীকার না করে একান্ত খোলামেলা পরিবেশে প্রত্যেককে তার বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়।

অনেকে যেমন বলে থাকেন, এ কথা সত্যি যে, 'পঞ্চায়েতী রাজ'-এর গণতান্ত্রিক কাঠামো, যা ভারতের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত, এবং যাকে *পেসা* (পঞ্চায়েত-সিডিউল এলাকায় সংবর্ধিত, Panchyat-Extension to Scheduled Area) আইন ১৯৯৬ এবং বনাধিকার আইন দ্বারা দৃঢ় করা হয়েছে, তার ফলে উপজাতি এলাকায় এক কার্যকর গণতন্ত্র লাগু থাকা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু রকমের কারণের জন্য তা হয় না— বেশির ভাগ রাজ্য সরকার *পেসা* লাগু করার ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করেনি, বহু জায়গায় বনাধিকার আইন সামান্যই লাগু হয়েছে, এবং উপজাতি জনগণ নিজেরা প্রায়ই 'পঞ্চায়েতি রাজ' কে প্রশ্ন করে; সেই তুলনায় তারা নিজেদের সভাগুলিকে বেশি পছন্দ করে। ('উপজাতিরা পঞ্চায়েতি রাজের তুলনায় নিজেদের ঐতিহ্যবাহী শাসনতন্ত্র পছন্দ করে', বিকল্পসঙ্গম, ২০১৪, http://www.vikalpsangam.org/article/tribals-prefer-traditional-way-of-governance-over-panchayati-raj/#.U8NUwEnrbmQht)

বীরভূমের ধর্ষণ মামলায় ঐতিহ্যবাহী উপজাতি সভাগুলি প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জানুয়ারি ২০১৪-তে একটি সাঁওতাল পঞ্চায়েত সম্বন্ধে এই মর্মে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয় যে তারা একটি মেয়েকে, যার একজন বহিঃস্থ ব্যক্তির সঙ্গে প্রেম ছিল, ধর্ষণের আদেশ দেয়। এই কেসের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করে উপজাতি সভাগুলিকে বন্ধ করে দিতে। সরকারের এই চালকে বানচাল করতে হাজার হাজার সাঁওতাল কলকাতায় এসে ধর্না দেয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে কায়েমি স্বার্থ বীরভুম কেসের বাপারে ভুল-রিপোর্ট করে— হয়ত বা নিয়মগিরি আন্দোলনকে হেয় করতে ('ভারতের উপজাতি সভাগুলি গণ-ধর্ষণের পর তোপের মুখে', ভয়েস অফ আমেরিকা, ৪ ঠা এপ্রিল ২০১৪, http://www.voanews.com/content/indias-tribal-councils-under-fire-after-gang-rape/1886505.html)।

নিয়মগিরি গ্রাম সভাগুলি আদিবাসী গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপটিকে তুলে ধরে এবং বহু দিক দিয়েই এগুলি উপজাতি সভা পরিচালনার ঢংটির প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও আমি সেগুলিকে চোখে দেখিনি, তবু অতি সম্প্রতি আমি ঝাড়খণ্ডে একটি গ্রামে এক সাঁওতাল সভাতে অংশগ্রহণ করি এবং সেখানে গণতান্ত্রিক বাতাবরণটি খুবই উঁচু সুরে বাঁধা ছিল— প্রত্যেককে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছিল এবং প্রত্যেকের সম্পূর্ণ খোলামেলা, তীক্ষ্ণ মতামতের ভিত্তিতে একটি সহমতে পৌঁছতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান হচ্ছিল।

বেদান্তের মাইনিং প্ল্যান্টের ব্যাপারে নিয়মগিরির গ্রামবাসীদের নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়টি যথেষ্ট আলোকপাতকারী ('নিয়মগিরিতে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ নিয়ে উৎসব', ১৯ শে এপ্রিল ২০১৩)। যদিও অনেকে উড়িষ্যা সরকারের বিতর্কিত বক্সাইট আস্তরণের একেবারে নিকটবর্তী ১২টি মাত্র গ্রামে ভোট করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং মাওবাদীরা আহ্বান রাখেন ভোট বয়কটের, ('উপজাতি জনেরা মাওবাদী ফতোয়া অস্বীকার করল, উপস্থিত হল গ্রাম সভাতে', *দ্য হিন্দু*, ১৭ অগস্ট ২০১৩,) শেষপর্যন্ত ১২টি গ্রামেই মাইনিং-এর বিপক্ষে সহমতসম্পন্ন ভোট পড়ায় সব কিছুই ভালভাবে মিটে যায়।

এই ফলাফল মাওবাদী বা এনজিও প্রভাবিত নয়। যদিও *অ্যামনেস্টি* ও *সারভাইভাল* এবং *এ্যাকসন এইড*-এর মতো কিছু এনজিও ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারে উদ্যোগী ছিল, কিন্তু তারা ওই স্থানে উপস্থিত ছিল না এবং তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে তৃণমূল স্তরের আন্দোলনকারীরাই প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষত সমাজবাদী জন পরিষদ, যারা ডোংরিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় মানুষদের সাথে কাজ করেছেন যাতে তারা এই সমস্ত সভাতে কথা বলতে পারেন।

আর একটি নতুন শক্তি হলো 'ফয়েল বেদান্ত'; পণ্ডিত, উকিল ও সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত একটি নতুন ধরনের সংগঠন, যারা বিভিন্ন দেশের আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি সমান্তরাল যোগসূত্রের কাজ করছে, যারা নিয়মগিরি কেসের বাঁক-মোড়গুলি রিপোর্ট করেছে, এবং সাম্প্রতিককালে লন্ডনে বেদান্তের প্রধান অফিসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং

জাম্বিয়াতে কোম্পানিটির ভয়ঙ্কর লুণ্ঠনের খবর ফাঁস করে দেয় (৪ জুলাই ২০১৪)। নিয়মগিরিতে বেদান্তের পরিকল্পনার বাপারে ফয়েল বেদান্তের সিদ্ধান্ত অতি পরিষ্কার, ''যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে বেদান্ত ও উড়িষ্যা সরকারের আস্তিনে অনেক চাতুরি লুকিয়ে আছে, তবু এটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে তাদের সংঘর্ষ শেষ হয়ে গেছে এবং সময় এসেছে তাদের আত্মসমর্পণ করার ও স্বীকার করার যে অন্তত একবারের জন্যও একেবারে নীচুতলা থেকে সক্রিয় হয়ে ভারতে গণতন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তা জয়ী হয়েছে।" ('নিয়মগিরি সহমতের ভিত্তিতে বেদান্তকে খারিজ করে দিয়েছে', ফয়েল বেদান্ত, ২০ শে অগস্ট ২০১৩)

নিয়মগিরির ভোটপর্বটিতে কেবল ডোংরিয়াই নেই, বহু দলিত এবং বহুজন সমাজের সদস্যরাও আছে, যারা তাদের পাশাপাশি ভোট দিয়েছিল। উক্ত ভোটের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে ডোংরিয়া-রা বারংবার ব্যক্তিগত *পাট্টা*-কে প্রত্যাখ্যান করেছে— তার দ্বারা মার্কস-এর সাম্যবাদী সম্পত্তির উপর জোর দেওয়াটাকেই সপ্রমাণ করেছে, যা উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং একই সাথে সাম্যবাদের ভিত্তি। বন অধিকার কর্মীরা উপজাতি অধিকারের জন্য প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছে— কিন্তু এই আইনের আওতায় সাম্যবাদী সম্পত্তির অধিকার প্রয়োগ করা খুবই কঠিন এবং যদি এই লড়াইয়ের ফলে বনাঞ্চল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তাহলে কি এই আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে না, যে কালক্রমে তা ধনতন্ত্রের প্রসারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে, আদিবাসী একতা এবং জমি ও শ্রমের মূলগত বণ্টনকে বিপন্ন করবে, যা আদিবাসী সমাজের ভিত্তিস্বরূপ?

নিয়মগিরির সম্পূর্ণ কার্যাবলী দেখিয়ে দেয় যে কীভাবে ভারতীয় কোর্ট ও গণতন্ত্র এমনকি সুদূর উপজাতি এলাকাতেও কাজ করতে পারে। ডোংরিয়া এখনও স্ব-নির্ভর অর্থনীতি চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের অরণ্য ও পাহাড়ের উপর অধিকার প্রয়োগের সামগ্রিক রূপটি অন্যদেরও সাধারণ সম্পত্তি/প্রাকৃতিক উৎসের উপর অধিকার প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। ''পাহাড়গুলি সরকারের বেচে দেওয়ার জিনিয নয়", যা বহু ডোংরিয়াবাসীই বলে থাকে, বা একজন নারীর কথায়, ''পাহাড় আমাদের দরকার ও পাহাড়ের দরকার আমাদেরকে"।

পাহাড়ের চূড়ায় গাছ কাটার বিরুদ্ধে ডোংরিয়াদের যে সংস্কার আছে (পাহাড়ের পার্শ্বদেশে কাটায় তা নেই, যেখানে তারা পর্যায়ক্রমে জুম-চায করে থাকে) তা নিঃসন্দেহে ভূ-বৈচিত্র্য রক্ষার এক স্থানীয় পদ্ধতি এবং ইকোলজির নিয়মানুসারী এক অর্থনীতিকে নিঃসন্দেহে তুলে ধরে, যা নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের সংস্কারের আদি অর্থকে প্রকাশ করে, যাদের কাছে অভিধাটির মানে হল মূলগতভাবে 'পবিত্র' এবং যা মাওরি সম্পত্তি অধিকার ফিরে আসার পিছনে কাজ করছে।

তুলনায়, বেদান্ত-র লানজিগড় শোধনাগার, ছত্তিশগড় স্টীল ফ্যাক্টরি, মাহানের কয়লা খনি (মধ্যপ্রদেশ) এবং পোলভারাম বাঁধের মত বিতর্কিত ও অন্যান্য বহু বিষয় নিয়ে উপজাতি গ্রামগুলিতে সরকারি পাবলিক হিয়ারিং দেখিয়ে দেয় স্বচ্ছতার অভাব ও সংশ্লিষ্ট অত্যাচারের ফলে গণতন্ত্রের দফা-রফা, আধিকারিকদের দ্বারা পুনঃপুন নিয়মমাফিক ভুল-উপস্থাপনা, যেখানে জনগণ স্পষ্ট বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে সেখানেও তাকে 'সম্মতি' বলে চালিয়ে দেওয়া।

মাওবাদীরা উপজাতিদের বন-সম্পদের ন্যায্য মূল্যের জন্য, বেআইনি মদ ভাঁটি বন্ধ করার জন্য ও অন্যান্য বহু সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। কিন্তু মাওবাদীদের সমর্থন হচ্ছে ২০০৮-এ পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল মঞ্চের ক্ষেত্রে এবং ২০০৯-এ দক্ষিণ উড়িষ্যার নারায়নপাটনাতে পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে 'মৃত্যুর চুম্বন'। মাওবাদীরা শ্রেণীশত্রু খতম করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বস্তারে এই নীতির ফলে সালওয়া জলুমের মত শয়তানের সৃষ্টি হয়েছিল। 'নিরাপত্তা বাহিনী'-ও মাওবাদীদের মারতে চেষ্টা করে— কখনোই গণতন্ত্র সৃষ্টি করে না। যা দরকার তা হলো, আদিবাসীদের বক্তব্যের দিকে নজর রাখা এবং তাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করা। তাদের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আদিবাসী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র চাষিদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক আদর্শ, যা আমাদের শিখতে হবে।

অন্য ধারার আন্দোলন

গণ-আন্দোলনগুলি রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট উভয়েরই বিরোধিতা করে

সাক্ষাৎকার : মেধা পাটকর

অনীক *: আমার মূল উদ্দেশ্য, মোদীত্বের উত্থানের প্রেক্ষিতে গণআন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি কী, সেটা জানা। এটা সম্বন্ধে কিছু বলুন।*

মেধা : মোদীত্ব, হিন্দুত্ব, বিশ্বায়ন-উদারনীতিকরণ— এই সবকিছুই আমাদের ব্যবস্থাপনায়, সম্পদে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোতে ধাক্কা মারছে। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি কংগ্রেস ও বিজেপি-র অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ দেখিনা। কিন্তু আরএসএস-বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলিকে ধোঁয়াটে করে দিচ্ছে। মানুষের মনকে তা বিষাক্ত করে দিচ্ছে এবং প্রকৃত সমস্যা নিয়ে লড়াই করার সংগ্রামী শক্তির মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করছে। এই জাত-পাত-ধর্ম ভিত্তিক জোটের মোকাবিলা না করে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সম্ভব নয়।

অনীক *: মোদীত্বের এই অগ্রগমনে, আপনি কি '৯২ সালের কোনোরকম পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছেন?*

মেধা : হ্যাঁ। গত কয়েক বছরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেমন প্রকাশ্যে এসেছে, জাতপাত নিয়েও তেমন রাজনীতি হয়েছে। এই দুটি বিষয়ই আমাদের নির্বাচন-কেন্দ্রিক রাজনীতিকে বড় মাত্রায় বিকৃত করেছে। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হয়েছিল, অযোধ্যা কাণ্ডের পর তারা কিছুটা নমনীয় পথ ও মনোভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু এটা আর এখন সত্য নয়।

অনীক *: আপনি হিন্দুত্ববাদী সম্বন্ধে বলছেন।*

মেধা : হ্যাঁ, হিন্দুত্ববাদী। বিগত কয়েক বছরে মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম, উভয় প্রকার সন্ত্রাসবাদীরা আছে। দু'তরফেরই বিরুদ্ধে মামলা চলছে পুরোমাত্রায়। মালেগাঁও বিস্ফোরণ কিংবা অযোধ্যা পরবর্তী ঘটনার তদন্ত কখনোই সম্পূর্ণ করা হয়নি। লোকগুলো সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জশিটও পাওয়া যায় না। মূলত কিছু অর্থনৈতিক এবং কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এই সমস্ত শক্তি জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে। দ্বিতীয়ত, যাদের অবসর সময় আছে অথবা মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যা নিয়ে যারা অত্যন্ত হতাশ ও জর্জরিত, সমাজের সেই সকল অংশের মানুষের উপরেও তারা প্রভাব বিস্তার করছে। এই মানুষেরা তাদের পাল্লায় পড়ছে, বাস্তবতা থেকে বাস্তবিকই তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অস্মিতা জাতীয় প্রচারে তারা মোহাবিষ্ট হচ্ছে। সেটা মোদীর গুজরাটি ধরনের 'অস্মিতা' প্রচারই হোক বা 'ওভায়েসী' মুসলিম মৌলবাদই হোক।

অনীক *: মোদীত্ব প্রচারের সাফল্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বিশেষত যুবকদের বিচ্ছিন্নতার জন্য আপনি কি উদ্বিগ্ন?*

মেধা : সাম্প্রদায়িকতার সাথে বিশ্বায়ন-উদারনীতিকরণ, গোটা সামাজিক আলোচনায় অনেক নতুন উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছে। সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক পরিচিতির বৃত্ত, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ যুবকদের একাংশকে সমাজের পশ্চাৎপদ মানুষদের বাস্তবতার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদী নীতির সমর্থক মধ্যবিত্তরা পশ্চিমী ধাঁচের উন্নয়নের ধারণা মেনে নিচ্ছে, সহায়তা দিচ্ছে। ইতিহাসে এই শ্রেণীর যে ভূমিকা দেখতে আমরা অভ্যস্ত তাদের এখন আর সেই ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না।

অনীক *: আপনি কি মনে করেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি, সাথে সাথে গণসংগ্রামগুলি মোদীত্বের কিংবা এই ধরনের মতবাদ প্রচারের পিছনে জনসমর্থনের তল পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?*

মেধা : এ বিষয়ে আমি পরে আসছি। প্রথম কথা হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থাও, কেবল উন্নয়ন প্রশ্নে নয়, জীবন ও জীবনযাত্রা প্রসঙ্গেও পশ্চিমী ধাঁচের বা শিকড়বিহীন মডেল এবং ধাঁচায় উৎসাহ দিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক মাধ্যমগুলি যে নব্য প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটিয়েছে, তার ফলে অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এটাও বিশ্বায়ন-উদারনীতিকরণ ধাঁচার প্রতিফলন। এই সবকিছু মিলেই ঘটেছিল *প্রচার, প্রসার*— ফাঁদ ও শুঁড়ের বিস্তার। যুবকদের মধ্যে এরকম একটা গোষ্ঠী আছে। আমি বলি না যে কেবল এসব কারণে তাদের দোষারোপ করা যায়, কিন্তু তারা দলে ভিড়ছে। আদিবাসীরা যেমন নিজেদের হিন্দু বা মুসলিম না ভাবলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে তাদের দলে টানা হয়। একদিকে তারা ভোটব্যাঙ্কের অংশীদার হয়ে পড়ছে, অপরদিকে উদারনৈতিক অর্থনীতিতে তাদের গেঁথে ফেলা হচ্ছে। সুতরাং বাস্তবত এই যুবকদের অর্থনীতির প্রয়োজনে কাজে লাগানো হচ্ছে, অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির প্রসার এবং বিশিষ্ট পেশাদারদের যোগান দেওয়া। নয়া অর্থনীতিতে শুধু যে দৈহিক শ্রমের খামতি থাকে, তা নয়, বিশেষ এমন কর্মশক্তির প্রয়োজন হয়, যেখানে দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত সংযোজন হয়।

আগে নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ও এনএপিএম নেত্রী মেধা পাটকরের এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন *অনীক*-এর পক্ষে বিশ্বজিৎ রায়

গণআন্দোলনগুলির সমাজে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা যত না ছিল, এখন এসব তাকে ছাপিয়ে গেছে। আজকে আপনি সামাজিক মাধ্যমগুলির মাধ্যমে যে কোনো অংশের মানুষের মনন এবং চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারেন, হাজার হাজার মানুষের রাস্তায় নেমে সমর্থনের প্রয়োজন হয়না। বরং সংহতি অর্জনের এটা ভিন্ন ধরণের কৌশল। সুতরাং পাল্টা নতুন কৌশল এবং প্রযুক্তির প্রয়োজন। গণআন্দোলনগুলি নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছে। এটা একটা পরিবর্তনশীল সময়। আরেকটি ব্যাপার হলো, রাষ্ট্র-চরিত্রে বদল ঘটছে। রাষ্ট্রের বেসরকারিকরণ এবং কর্পোরেটায়ন ঘটছে।

সমস্ত আন্দোলন এখনও রাষ্ট্রকেই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু রাষ্ট্রের থেকে সাড়া না পেয়ে অথবা কপট প্রতিক্রিয়ায় তারা হতাশ। সামনাসামনি প্রতিক্রিয়া দেখালেও, পিছনে অন্য কিছু করে। রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতির এইরকম রঙবদলের অভিমুখেই নির্বাচনী ব্যবস্থা তাল রেখে চলছে। কারণ ভোট সমাবেশিত করার ব্যাপারে সমগ্র নির্বাচনী প্রশাসন কর্পোরেট অথবা বড়ো লগ্নিকারীর সঙ্গে সমঝোতা করে। সুতরাং তাদের ভোটদাতাদের মুখোমুখি হতে হয়না। সরাসরি যোগাযোগ করে তারা ভোট সংগ্রহ করে না, ইস্তাহার দিয়ে বা সকলের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েও নয়। প্রয়াত বিজেপি নেতা প্রমোদ মহাজন বলেছিলেন, এটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার— ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ভোট ম্যানেজমেন্ট আর মেসেজ ম্যানেজমেন্টের মতো ব্যাপার। এই প্রক্রিয়াটি নরেন্দ্র মোদীর অতি খরচ-সাপেক্ষ অভূতপূর্ব রণকৌশলের অঙ্গ। এর ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক কম দায়বদ্ধতা জন্মাচ্ছে ভোটদাতা ও রাজনীতিকদের মধ্যে। এমনকি জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও।

অনীক *: সাংগঠনিক বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন? এনএপিএম সম্পর্কিত বিশেষ কোন বিষয়ে নয়, সামগ্রিকভাবে আন্দোলনগুলির ঐক্যসমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে।*

মেধা : কোন্ সমস্যা?

অনীক *: বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণআন্দোলনে অনৈক্য। মতাদর্শগত বিষয় এবং সংগঠনিক সমস্যা নিয়ে ভিন্নতা। একই সঙ্গে, সাধারণ বিষয় এবং কর্মসূচি নিয়ে ঐক্যপ্রচেষ্টাও চলছে। যেমন, আপনি বলেছিলেন ইস্যু (issue) ভিত্তিক জাতীয় স্তরে জোট চেষ্টা চলছে। বড়ো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সাধারণ পরিসর নির্মাণের প্রয়াসও গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি যা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন। অ্যাক্টিভিস্টদের আলোচনা আহ্বানের জন্য আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি।*

মেধা : কে কাজে লাগাবে?

অনীক *: অনীক অথবা অন্য কোনো মিডিয়া, যারা একটা সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মীদের কথোপকথনের পরিসর নির্মাণের জন্য উৎসাহী।*

মেধা : এদেশে গণআন্দোলনের নিজস্ব একটা পরিসর আছে আর গণআন্দোলন মানেই বড়ো আন্দোলন নয়। নাগরিকদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এই সিস্টেমে প্রচুর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বা সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তারা এই সামগ্রিক পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত এবং যারা এই পরম্পরার সাথে যুক্ত, তারা বাস্তবিকই অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু অনেক সময়ে ঐক্য হয় ইস্যু ভিত্তিক, কারণ মানুষের ধারণা, বহুমুখী দাবি-ভিত্তিক মঞ্চে তাদের নিজস্ব বিষয়টি গুরুত্ব হারাবে। সত্যি কথা বলতে কী, ইস্যু-ভিত্তিক কর্মসূচি এবং মঞ্চও প্রয়োজন। একই সঙ্গে, প্রত্যেকের নিজস্ব দাবিদাওয়া, অগ্রাধিকার এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে, এনএপিএম-এর মতো, বৃহত্তর মঞ্চেরও সর্বদা প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় এমন এক মতাদর্শগত কাঠামো গঠন করবে, যা নিজস্ব সাংগঠনিক সীমা অতিক্রম করে হবে বিস্তৃততর।

১৯৯২ সালে এনএপিএম গঠন করার সময়ে এটাই ছিল আমাদের সুগঠিত ভাবনা। আমাদের সামনে দু'দফা চ্যালেঞ্জ ছিল। কংগ্রেস সরকারের বিশ্বায়ন বা উদারীকরণের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া এবং অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের উপর সংঘ পরিবারের আক্রমণ। সাম্প্রদায়িক আক্রমণ শুধু বিতর্কিত মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার মানুষের বৈচিত্র্য এবং মর্যাদার উপরও আক্রমণ নেমে এসেছিল। এনএপিএম গঠনের এটাই ছিল প্রাসঙ্গিকতা। আমি মনে করি, এই প্রাসঙ্গিকতা অনেক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপলব্ধ হয়েছিল, যেমন অন্ধ্রের মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে দলিত কৃষকদের আন্দোলন, কেরালা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে আদিবাসী আন্দোলন। প্রকল্প-উচ্ছিন্ন মানুষ তাদের জল-জমি-জঙ্গল বাঁচাতে যেখানেই লড়াই-সংগ্রাম শুরু করেছে, সেখানেই নর্মদা ধাঁচের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া আজাদি বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি আছে। আমার ধারণা, সেই সময় যতটা দাবি করত, আমরা তার প্রেক্ষিতে অনেকটা বেশি এগিয়ে গিয়েছিলাম। স্পষ্টত, সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন, সমস্ত দলিত বা আদিবাসী সংগঠন আমাদের সঙ্গে আসেনি। যারা মনে করেছিলেন, এই ধরনের বৃহত্তর মঞ্চ গঠন প্রয়োজনীয় এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ, তাঁরাই কেবল সামিল হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তা না হলে, সাম্প্রদায়িক এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে একযোগে লড়াই করা কারোর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সমস্ত সংগঠন এই সম্মেলনে সামিল হতে পারেনি কারণ তাৎক্ষণিক বিষয়গুলি এত বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল যে, সেগুলোই তাদের নিমজ্জিত করে রাখতো। সুতরাং এটা তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যেত। এনজিও-দের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি। আন্দোলনের মধ্যেও রয়েছে। আন্দোলন নিজেকে

এনজিও-দের থেকে পৃথক করতে পারে।

এনজিও, বিশেষত অর্থপুষ্ট এনজিও-গুলি সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। যেটা লক্ষণীয়, সময়ের দাবি হৃদয়ঙ্গম করা গিয়েছিল এবং কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দু'মাস ধরে দেশজুড়ে আমরা লম্বা ভ্রমণ করেছি। প্রতিটি দিন ও রাত্রি আমরা ঘুরেছি, সভা করেছি এবং সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। বিনা মতাদর্শে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও জোট গড়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষের সংকল্প মূর্ত হয়ে উঠল, যদিও ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো বা গঠনতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। আমরা গঠনতন্ত্র নিয়ে ভাবিত ছিলাম না। যৌথ প্রচেষ্টা আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সেটার ফলেই এনএপিএম সম্ভব হয়েছে।

এনএপিএম-এর রাজ্য সংগঠনগুলি কোথাও শক্তিশালী ছিল, কোথাও দুর্বল। পশ্চিমবঙ্গে নর্মদা আন্দোলনে আমাদের সংকট মুহূর্তে ৪৫টি সংগঠন যোগ দিয়েছিল। *এনরন* আন্দোলনেও অনেক সংগঠন অংশ নেয় এবং অনেকের জেল হয়। 'ডাঙ্কেল ড্রাফট'-এর বিরুদ্ধে আমরা প্রথম বৃহৎ সমাবেশ করি এবং কয়েক বছর বাদে, বিকল্প উন্নয়নের দাবিতে আমরা 'জন অধিকার পঞ্চায়েত' গঠন করি। এসব উদ্যোগে ফল ফলেছিল। আমার ধারণা, এর ফলে প্রত্যেকটি সংগঠন অন্যের সমর্থন পেতে শুরু করে। আমি নিজে জাতীয় আহ্বায়ক হিসাবে ক্রমাগত সফর করেছি। বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত সঙ্কটকালে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠনে এনএপিএম-এর প্রতিনিধিত্ব করেছে। সংহতিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে আন্দোলনকে উৎসাহ জোগানোর জন্য, আমরা অনেক সময়ে, বিষয়গুলি সরকারের বিভিন্ন স্তরে উত্থাপন করে সরকার এবং সংগঠনগুলির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করেছি। জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে, বাইরের লোকেরা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সংগঠনের ভিতরের মানুষেরা স্থানীয় স্তরে সমাবেশের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে।

এইরকম নানা কৌশলগত সমন্বয় ঘটিয়ে, দায়িত্ব বণ্টন করে, জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে কিছুটা পরিসর নির্মাণ করা গেছে। স্থানীয়, প্রাদেশিক এবং জাতীয় স্তরের প্রেক্ষাপটে মাঝে মাঝে সংঘাত দেখা দিয়েছে। এরকম অনেক পরিস্থিতি ও ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কর্মীদের সঙ্গে মার্কামারা দক্ষিণপন্থীদের জোট হলে, এনএপিএম-এর ধর্মনিরপেক্ষ অংশ প্রশ্ন তুলেছে। রাজ্যে রাজ্যে, অঞ্চলে অঞ্চলে বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। সোজাসাপটা পদ্ধতি চলবে না। আমাদের নমনীয় হতে হবে এবং মতপার্থক্য যদি খুব মৌলিক না হয়, তাহলে পার্থক্য থাকলেও একসাথে কাজ করতে হবে। সম্প্রতি, সরকারের নয়া-উদারনীতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অন্দোলনের জন্য সংগঠিত এবং অসংগঠিত, বড়ো এবং ছোটো স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

অনীক : *আপনি কি মনে করেন, আন্দোলনগুলির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে? কারণ আপনি বলেছিলেন, আন্দোলনগুলি রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং অবহেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এখন আমাদের কর্পোরেট লুঠ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নজর দিতে হবে।*

মেধা : আন্দোলনগুলিতে এটাই শুরু হয়েছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে আমরা বিশ্বব্যাঙ্ক এবং প্রত্যেক দ্বিপাক্ষিক এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। পসকো-বিরোধী আন্দোলনে মানুষ শুধু মনমোহন-এর বিরোধিতা করেনি, তাদের বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। পুনর্মূল্যায়ন মানে, প্রতিপক্ষের এই সম্মিলিত জোটটাকে অনুধাবন করা।

অনীক : *হ্যাঁ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তির মধ্যে যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। কিন্তু অনেকের মত হলো, রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তি ক্রমশ বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। আবার অন্যদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রের ভূমিকা উপেক্ষা করা ঠিক হবেনা। জনগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য জোর দেওয়া উচিত।*

মেধা : এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দুটি বিতর্ক দেখা দিতে পারে। একটা হলো, রাষ্ট্রের প্রতিই দৃষ্টি দিতে হবে, তার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে, আবার রাষ্ট্রকেই কিছুটা পরিসর দিতে হবে। তা না হলে, সমস্ত পরিসরটাই আমরা হারাবো। দ্বিতীয়টি সরাসরি কর্পোরেটকে চাঁদমারি করে। কিন্তু এখনও সেরকমভাবে সরাসরি কর্পোরেটকে টার্গেট করা যাচ্ছেনা, কারণ তারা খুব দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। মোদীর মাধ্যমে, তারা তাদের প্রধানমন্ত্রী এবং এমপি-দের পেয়েছে। তার জন্য তাদের আলাদা কোনো ব্যালট বাক্স দরকার হয়নি। আমার ধারণা, মানুষ সেটা বুঝতে পারছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। বিভিন্ন সংগঠন মায় এনজিওগুলো, যাদের ক্ষমতা আছে, বিদেশি অর্থপুষ্ট হোক বা না হোক— তারা এই যোগসূত্রকে উন্মোচন করছে, নথিবদ্ধ করছে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণগুলি হাজির করছে। রাষ্ট্র এখন তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। রাষ্ট্র তাদের বিপজ্জনক ভাবছে। অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেনা, এমন গণ-আন্দোলনগুলি রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট, উভয়েরই বিরোধিতা করে।

অনীক : *সম্প্রতি কয়েকজন কারারুদ্ধ বর্ষীয়ান মাওবাদী নেতা যৌথ আবেদনে জানিয়েছেন, গণআন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের পরস্পরের ভূমিকার কদর করা উচিত এবং গণ-কার্যক্রমে তাদের হাত মেলানো প্রয়োজন। আপনি কি এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন?*

মেধা : এটা মাওবাদী বনাম গণ-আন্দোলনের প্রশ্ন না। সাধারণ মানদণ্ডে বিভাগীয়করণ করতে হবে। একটা মূল বিষয় হলো, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতিগত

পার্থক্য। উদারভিত্তিক রাজনীতিতে একসাথে চলার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। কোনো এক বিষয়ে একমত হলেও, যৌথ কর্মসূচি কীভাবে সম্ভব? একদল সবসময় বন্দুক সঙ্গে রাখার কথা ভাবে, অপরদল বলবে— না, আমরা যদি নিহতও হই, আমরা হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখাবো না। গণ-আন্দোলনে জঙ্গি মনোভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আন্দোলন তো মোটের উপর ইস্যু-ভিত্তিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম নয়। কাউকে যদি অনেক দূর যেতে হয়, তবে জীবন, উদ্দেশ্য, ধাঁচা সম্বন্ধে তার মনে একটা স্বচ্ছ ভাবনা থাকতে হবে। সুতরাং সমস্যা আছে। এতে কারোর উপকার হবেনা। আমি মনে করি, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং অহিংস সংগ্রাম, পৃথকভাবে পথ চললে উভয়ের পক্ষে মঙ্গল।

আমরা বলিনা যে তারা আদর্শগত ভাবে নিবেদিত নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অথবা যারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় হিংসাও আমরা সমর্থন করিনা, এমনকি উন্নয়নের নামে হলেও। মাওবাদীদের শেষ করতে পারলেই সবকিছু ঠিকঠাক চলবে, রাষ্ট্রের এই বক্তব্যও আমরা অনুমোদন করিনা। রাষ্ট্রের অভিযোগ আমরা মানিনা। কিন্তু আমরা সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করতেও পারবো না। এনএপিএম-এর সহযোগী সংগঠনগুলি এমনটাই ভাবে। কিছু সংগঠন আছে, যারা মনে করে মাওবাদীদের হিংসা আর রাষ্ট্রীয় হিংসা এক নয়। কিন্তু সিআরপিএফ হত্যা করা, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া সশস্ত্র সংগ্রামের দীর্ঘদিনের রণনীতি। আমরা তার অংশীদার হতে পারিনা।

***অনীক** : এনএপিএম-এর আদর্শগত ভিত্তি কী?*

মেধা : এনএপিএম সদাই বিশ্বায়ন, জাতপাততন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে এসেছে। আমরা বিকল্প উন্নয়নের ধাঁচা প্রচার করছি। বিকল্প উন্নয়নের ধাঁচায় আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের গণকেন্দ্রিক ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং একই সাথে সমাজের গণতান্ত্রিক, অহিংস রূপান্তরের প্রতি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করি। এমনকি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধেও জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। সুতরাং, এই ত্রিভুজ মতাদর্শগত কাঠামোয় সকলে, জীবনের অধিকার এবং অহিংসাবোধের মূল্যবোধের ভিত্তিতে, জীবনকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করবে। গণতান্ত্রিক হতে চাইলে আপনাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

নেপালে যখন মাওবাদীরা ক্ষমতায় এলো, তখন কী ঘটেছিল? প্রচণ্ড বলতে শুরু করেন, বিদেশি অর্থলগ্নি অবশ্যপ্রয়োজনীয় আর সেই কারণে পার্টির নাম থেকে 'মাওবাদী' শব্দ বাদ দেওয়া দরকার। আমি যখন নেপালে গিয়েছিলাম, মোহন বৈদ্য গোষ্ঠী আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমরা প্রচণ্ড-র পদ্ধতি দেখেশুনে মর্মাহত হয়েছিলাম।

***অনীক** : কোন ভাবাদর্শ আপনাকে প্রেরণা জোগায়?*

মেধা- মার্কসবাদ থেকে মাওবাদ ঐতিহাসিক পরিণামবাদের (historical determinism) কথা বলে এসেছে, যার বক্তব্য হলো, নির্দিষ্ট একটা যাত্রাপথ আছে এবং আমাদের সেই পথেই চলতে হবে। এই পথে গোঁড়ামি দেখা দেয়। অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক ধরণের পরিণামবাদ বর্তমান। গান্ধীবাদীরা আছেন, অম্বেদকারপন্থীরা, পেরিয়ার-গোষ্ঠী ইত্যাদিরা আছেন। আমার মনে হয়, সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসা কষ্টকর। কিন্তু কৌশলগত প্রশ্নে (strategy) এমন কিছু ক্ষেত্র বাছাই করা যায়, যা জনগণের উপযোগী। এমনকি মাওবাদীরাও অহিংস কর্মসূচি গ্রহণ করে। মাওবাদীদের সমর্থন করে, কিন্তু সশস্ত্র কার্যকলাপে নিয়োজিত নয়, এমন ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করা যায়না। রাষ্ট্রের কাজকর্ম ন্যায়সঙ্গত নয়। 'কবীর কলা মঞ্চ' দলের প্রতি আচরণ... তাদের মাওবাদী হিসাবে দেগে দেওয়া হয়েছে... এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চয় প্রতিবাদ করবো। মাওবাদে তাদের বিশ্বাস থাকলেও কেউই তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে দেখেনি।

***অনীক** : অনেকে বলেন যে, 'আপ'-এ আপনার যোগদান এবং তাদের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, গণআন্দোলনের নিরপেক্ষ পরিচিতি এবং শক্তি লঘু হয়ে গেছে। অন্যান্যরাও, যেমন কুদানকুলামের এস পি উদয়কুমারও তাই করেছেন। কেউই নির্বাচনে জয়লাভ করেন নি।*

মেধা : বিতর্ক স্বাগত। 'আপ'-এ যোগদান এবং সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি এনএপিএম-এর বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হয়েছে। এনএপিএম ঘনিষ্ঠ 'আপ' নেতা প্রশান্তভূষণ, যোগেন্দ্র যাদব-এর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে, বিদ্যমান ভাবাদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং আন্দোলনের কণ্ঠ উত্থাপন করা প্রসঙ্গে, মন্থন চলছে। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। মার্কামারা ক্ষমতালোভী হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত হতে দিইনি। নির্বাচনে অর্থসাহায্য ও হিসাবনিকাশ সম্পর্কে পুরোদস্তুর স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বজায় রাখা হয়েছে। আমি জিততে পারিনি, অংশত ভুল কেন্দ্র নির্বাচন করার জন্য। ওখানে অনেক গুজরাটি ভোটার ছিল। যদিও কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা বিবেচ্য হওয়া উচিত নয় এবং আমি সেটা করিও নি, তথাপি নির্বাচনে এই বিষয়গুলো উপাদান। যেটা কাজ দিয়েছে, আমাদের আন্দোলনে অংশীদার নয়, এমন বৃহৎ এক জনসমাজের কাছে আমি পৌঁছতে পেরেছি। বেশ কয়েকজন তরুণ এবং শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, তাদের কাজকর্ম-পড়াশুনা ছেড়ে, নির্বাচনী প্রচারে যোগদান করেন। তাঁরা আন্দোলনে কর্মী হিসাবে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও অনেক আগেই আমি এনএপিএম ছেড়ে দিয়েছি, এখন আমি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করি, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি আমার শিকড় বিস্মৃত হইনি। 'আপ' সম্বন্ধে বলতে পারি, জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যদি নেতৃত্ব সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়।

অন্য ধারার আন্দোলন

আন্দোলন যত খণ্ডিত থাকবে তাতে লাভ পুঁজিবাদেরই

সাক্ষাৎকার : শোভনলাল দত্তগুপ্ত

অনীক : *এখন সাবেকি ধাঁচের আন্দোলন তেমন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নতুন ধাঁচের কিছু আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এগুলিতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা খুবই সামান্য, অথচ আন্দোলনগুলি যে একেবারে কিছুই অর্জন করতে পারছে না এমন নয়। বর্তমান ভারতে বা বিশ্বে এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ কী?*

শোভনলাল দত্তগুপ্ত : এই বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই দু-তিনটে কথা বলে নিলে ভালো হয়। একটা কথা হচ্ছে যে, বিশ্বায়নের ফলে কেন্দ্রিকতার যে ভাবনা, বা কেন্দ্রীয়ভাবে সব কিছু চিন্তা করার যে ভাবনা, তা বিশ্বায়নের ধাক্কায় অনেকটাই ভেঙ্গে গেছে। এটা হলো একটা কথা। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে সমাজতন্ত্রের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির পতন, তার পর অন্যান্য যে দেশগুলি পড়ে রইলো, যেমন চীন বা কিউবা, ভিয়েতনাম, তারা কোনো আন্তর্জাতিক স্তরে যে নেতৃত্ব দেবে— বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে— সেটা হয়নি। যে আন্তর্জাতিক সংহতি ছিল এই শিবিরের মধ্যে সেই সংহতি আর দেখা গেল না। সবাই মিলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়া, সেই বিষয়টি কিন্তু আর নেই। এখন এরা সবাই নিজের রাজ্যপাট সামলাতে ব্যস্ত। তাদের পক্ষে আজ আর আন্তর্জাতিক স্তরে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে— যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল, গত শতাব্দীর গোড়াতে, সেই সময় থেকে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়, ১৯৫০ বা তার পরবর্তী সময়ে, প্রায় ১৯৮০-৯০ পর্যন্ত— সারা পৃথিবীটা মোটামুটি একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ এবং অন্য দিকে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত ছিল। তখন পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যেত— কে পক্ষে আর কে বিপক্ষে। কাদের বিরুদ্ধে, কাদের নিয়ে লড়াই, সেই লড়াইয়ে শরিক কারা এগুলি সব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেত।

সেটা কিন্তু এখন আর নেই। কেন্দ্রিকতার ভাবনা নেই। সেই সময়ে বিশ্বায়ন ছিল না ঠিকই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল। পরিবেশবাদ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আসতে শুরু করেছে। তার আগে উপনিবেশবাদ এবং ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ তো বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ছোট-বড় সফল-অসফল আন্দোলনগুলি চলছিল সেগুলিকে সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল সেই সব দেশগুলির মূলত প্রগতিশীল পার্টি সংগঠনগুলির। কোথাও নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, কোথাও সোশ্যালিস্ট পার্টি। উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে এমনকি জাতীয়তাবাদী দলগুলি— যেমন ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস। এর কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক আছে।

মানুষ আন্দোলনের আধার এবং উৎস হিসেবেই তখন এইসব পার্টিগুলোকে দেখত। মানুষের কাছে এই পার্টিগুলিই ছিল লড়াইয়ের সমার্থক। পার্টিগুলি লড়াই করবে, তারা লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবে— এটাই ছিল মানুষের কাছে স্বাভাবিক। তারা পার্টিগুলির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেওয়াটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করত। তার বাইরের কিছুতে মানুষের উৎসাহ ছিল না।

বিশ্বায়নের ধাক্কায় পার্টির এই ধারণাটা অনেকাংশেই ম্লান হয়ে গেছে। এর জন্য দুটো কারণ নির্দিষ্ট করা যায়। একটা এসেছে বিশ্বায়ন থেকে। বিশ্বায়ন-উত্তর যুগে মানুষের কাছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর যে আবেদন ছিল, পার্টির দিকে তাকিয়ে থাকা— একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে।

এই ঘটনাটা ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর। একটা নতুন প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। মানুষের বিশ্বাসটাই একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রেগানের উত্থানের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মান্যতা ছিল। সোভিয়েতের পতনের আগে থেকেই, ধরুন ১৯৮০-র দশকের শেষ থেকে রেগানের এবং নয়া দক্ষিণপন্থার উত্থান, পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েতের ভাঙন ও পতনের পর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা আর একেবারেই ধরে রাখা যায়নি। বলা যায় একটা পর্বে এর সমাপ্তি ঘটে। এরপর মানুষ আর এদের ওপর বিশ্বাস রাখেনি। যারা নেতৃত্ব দিত এতদিন, তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ, তাই তাদের ওপর থেকে মানুষের ভরসা চলে গেল। এটা একটা ব্যাপার।

দ্বিতীয় আর একটা কারণ আমার মনে হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে মানুষের যে আস্থা ছিল, কমিউনিস্ট মানেই সাচ্চা মতাদর্শের মানুষ হিসেবে দেখত, তারা ধান্দাবাজ নয়, আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের মতো নয়, সেই দলগুলির মানুষদের মতো নয়, এই জিনিসটা পুরোপুরি ভেঙে গেল। মানুষের মনে হলো, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও প্রবল দুর্নীতি আছে, খেয়োখেয়ি ঝগড়াঝাঁটি রয়েছে। হয়ত বুর্জোয়া দলগুলির মতো অতটা দুর্নীতিগ্রস্ত এরা নয়, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিক্রমও নয়। যেমন ধরুন চীনের পার্টি সম্পর্কে যে

শোভনলাল দাশগুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, লেখক, চিন্তক

নানান খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে, তার সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতি বিষয়ে, এটা তো হওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তার পর ধরা যাক উত্তর কোরিয়া। সে দেশে যে পরিমাণে ব্যক্তিপূজা চলছে, তা তো আমাদের দেশের পরিবারতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ এই দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কিউবার কথা ধরলেও দেখুন, সেখানে ফিদেলের পর এলেন তাঁর ভাই রাউল। রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য বিকল্পের কথা ভাবতে পারেন না, না কি ভাবতে চান না, ভাবতে গেলে কি কোনো অসুবিধা আছে, ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন মানুষের মনে হাজির হয়। এসবের ফলে কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে আবেদন ছিল তা চলে গেছে।

এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সেই শূন্যতা পূরণের জন্য নানা নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একটা ঘটনা ঘটছে এই যে নানা ধরনের এনজিও, নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই ধরুন আমেরিকাতে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট। আমাদের দেশেও পরিবেশ নিয়ে, সামাজিক সমস্যা বা নারী সমস্যা নিয়ে এদেশেও আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এগুলি সবই খণ্ডিত। এদের মধ্যে কেন্দ্রিকতা বলে কিছুই নেই। যখন যেখানে কিছু ঘটছে, তার তাৎক্ষণিক স্থানীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে এগুলি গড়ে উঠছে। যেমন ধরা যাক এই রাজ্যের কামদুনির ঘটনাটি। সেই ঘটনা নিয়ে কলকাতায় অত বড় মিছিল হলো, একটা বেশ বড় তোলপাড় হলো। সমস্যাটা হলো, এটা কিন্তু তারপর একেবারেই থেমে গেল। এরপর কামদুনির মতো ছোটবড় আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে— কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াতে বড় মাপের আর কিছুই হয়নি।

এটা হলো একটা সমস্যা। এদের কোনো কেন্দ্রীয় ফোকাস নেই। সবই স্থানীয়, একেবারে মাইক্রো স্তরে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় ব্যাপারটা এই যে, এই জাতীয় আন্দোলনগুলিকে আমরা সামাজিক আন্দোলনের অভিধা দিতে পারি। এই আন্দোলনগুলি কিন্তু সাবেকি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চ্যালেঞ্জটা এই জায়গাতে যে আগে ধারণা ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টিই সব কিছু করবে, আর এখন এই যে বৃহৎ অর্থে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি ঘটছে, এগুলি সাবেকি অর্থে ঠিক শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন বলা যাবে না। এই আন্দোলনগুলিকে বহু শ্রেণীর বা মাল্টি-ক্লাস আন্দোলন বলা যেতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি কি এই সব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে বা নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করবে? ধরা যাক কোনও একটা জায়গায় ভয়ঙ্কর নারী নির্যাতন হলো, একটা মারাত্মক রকম অন্যায় হলো, মানবাধিকার ভঙ্গ হলো, তো সেই স্থানীয় প্রতিবাদ আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি কি পার্টি হিসাবে যোগ দেবে এবং নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করবে? তারা কি তাদের লাল পতাকা প্রদর্শন করবে? নাকি যারা এই আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে? এই জায়গায় আমার সাধারণভাবে যেটা মনে হয়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পার্টি যদি নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসত, মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করত। এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটা ভুল ধারণা আছে যে কমিউনিস্ট পার্টি বুঝি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই করেছে, তারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন কখনই করেনি। কথাটা একেবারেই ভুল। কারণ আমাদের দেশে চল্লিশের দশকে যখন দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর হয়েছিল, তখন তো কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোটা আইপিটিএ আন্দোলনটা যেখানে শিল্পীদের বৃহৎ অংশকে সামিল করতে পারা, এসব তো ছিল। হয়ত তারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে জাহির করেনি, কিন্তু সবাই জানত এর পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা। সবাই জানত যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পেছন থেকে এই সব বিষয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই যে বিষয়গুলি ছিল, কমিউনিস্টরা মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারত, বলতে পারত উনি কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক। এঁদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা সমীহ ছিল।

এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এর পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির সবাই দায়ী এমনটা তো নয়। আজও পার্টিতে অনেক ভাল, সৎ, মহৎ মানুষ আছেন, কিন্তু মান্যতা নষ্ট হওয়াটা যেন একটা প্রবণতা হয়ে উঠছে। যেমন কামদুনিতে যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে যে আপনারা কোনও পার্টির পক্ষ থেকে আসবেন না। এর অর্থ হলো, কমিউনিস্টদের আইডেন্টিটি মানুষের কাছে সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি লোকের কাছে আর পার্টি পরিচয় দিতে পারছে না। গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারছে না।

তার ফলে এই শূন্য স্থানে নানান ধরনের শক্তি এসে হাজির হচ্ছে। আগে হয়ত এতটা হতে পারত না। কিন্তু আজকের সমাজ এত জটিল, সেখানে হয়ত এটা হতেই পারে যে সাধারণ মানুষ এই পর্যায়ে আর পার্টি ও পার্টি-রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে উৎসুক নয়। হয়ত সে কারণেই মানুষ বেশি আকর্ষিত হচ্ছে অ-পার্টি এই সমস্ত সমন্বয়ের দিকে। খণ্ডিত বা স্থানীয় স্তরের আন্দোলন, স্থানীয় গোষ্ঠী এতেই তারা সীমাবদ্ধ থাকছে।

অনীক : *অর্থাৎ মানুষের মনস্তত্ত্বের একটা পরিবর্তন ঘটেছে, যার বাস্তব কারণগুলো আপনি খানিকটা ব্যাখ্যা করলেন।*

শোভনলাল : মানুষের মনস্তত্ত্বের একটা পরিবর্তন হচ্ছে, তার একটা কারণ হচ্ছে, এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে কেন্দ্রিকতার ধারণা আর মানুষকে আকর্ষণ করে না। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এই পতন, যার ফলে এই রকম একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বায়ন-পূর্ব পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় ভরকেন্দ্র ছিল, বিশ্বায়নের যুগে সেই ভরকেন্দ্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

অনীক : *এখানে একটা কথা বলব। আপনি এখানে বলছেন*

মূলত সাংস্কৃতিক-সামাজিক আন্দোলনের কথা। কিন্তু শুধু তাই কি? অর্থনৈতিক আন্দোলনও কি নেই? যেমন কর্পোরেট জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সেজ বিরোধী আন্দোলন...

শোভনলাল : অর্থনৈতিক আন্দোলন তো আছেই। কিন্তু এই অর্থনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চলছে। উদাহরণ হিসাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে বা লিঙ্গ নিয়ে যে প্রশ্নটা উঠেছে। নানা রকম বিষয় উঠে এসেছে। এই এই সংবাদপত্র পড়া চলবে না, নাটক দেখা চলবে না, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সভাসমিতির জন্য প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না, ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলি বৃহত্তর অর্থে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিষয়। এগুলি সবগুলিই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়, কিন্তু এগুলিকে ঠিক বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয় বলা যাবে না। এই আন্দোলনে সামাজিক ও অন্যান্য উপাদান যতটা প্রকট, রাজনীতি ততটা নয়। রাজনৈতিক অভিমুখ স্পষ্ট না থাকায় রাজনীতির সঙ্গে এই যোগাযোগটা ঘটছে না। তার ফলে পার্টির প্রতি মানুষের ভরসা থাকছে না। মুশকিল হলো, এই যে এই সমস্ত আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলনগুলি স্থানিক, ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত হয়েই থেকে যাবে। তার ফলে শেষ বিচারে লাভ হবে নয়া উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের, পুঁজিবাদের। তারা ঠিক এটাই চাইছে যে আন্দোলন যথাসম্ভব খণ্ডিত এবং আলাদা আলাদা থাকুক। এত বড় 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন— তারা শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প করেই বসে রইল। মার্কিন রাজনীতির কোনও মৌলিক পরিবর্তন হলো না। ওবামা এসেছেন, এরপর আর কেউ আসবেন।

অনীক *: যে সাবেকি কমিউনিস্টরা ও তাদের পার্টিগুলি যখন শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি নির্ভর আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন এই খণ্ডিত আন্দোলনগুলি মন্দের ভালো, নাকি এগুলি ক্ষতিকর?*

শোভনলাল : এখানে কয়েকটা কথা আছে। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট চৈতন্যে বা তাদের পার্টির মধ্যে তেমন গভীর আত্মদর্শনের লক্ষণ দেখা না গেলেও ইউরোপে বিষয়টিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দেশে সেই চল্লিশের দশকের সময়টুকু বাদ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এমনকি দুবার কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন আসার পরও মূল বা বিভাজিত অংশ— সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে যথোচিত গুরুত্ব দেয়নি। বড়জোর তারা পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট— সেগুলি টিম টিম করে চললেও কারোর কিছু এসে যায় না। এই সমস্ত ফ্রন্টগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। গণসংগঠনগুলিকে যে তাদের অটোনমি দেওয়া দরকার— এগুলি চেতনায় ছিল না। এর ফলে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অ্যাজেন্ডায় কখনও এই সামাজিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়নি। যার ফলে আস্তে আস্তে আইপিটিএ ইত্যাদিগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এই বিষয়ে আমাদের যা কিছু ঐতিহ্য তা সীমাবদ্ধ অতীতচারিতায়। আমরা চল্লিশে এই করেছিলাম, তাই করেছিলাম ইত্যাদি। কিন্তু এখন আমি কী করব, এই বিশ্বায়িত প্রেক্ষিতে আমার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অ্যাজেন্ডা কী হবে, তা নিয়ে আমার কর্তব্যের কোনো দিশা নেই। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়, এই বোধটাই যদি না থাকে, তাহলে তো নেতা হিসাবে এদের গ্রহণযোগ্যতা কমতে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও জটিল। এই প্রশ্নটা চল্লিশের দশকেই উঠে গিয়েছিল। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যারা সক্রিয় কর্মী, তাদের যদি আমরা বৃহত্তর অর্থে বুদ্ধিজীবী বলে থাকি, তবে তাকে তো আপনার পার্টির মানুষ হিসেবে ভাবা যাবে না। তারা আপনার পার্টির নতো পার্টির হয়ে চলবে না। না চলারই কথা। কিছুদিন চলতে পারে, তারপর কিন্তু চলবে না।

আইপিটিএ-র সময় ভারতবর্ষের একেবারে সেরা শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা পরে ভেঙে যায়। তারা কিন্তু এক এক করে সবাই সরে যান। এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে লিখেছেন যে আমাদের ওপর পার্টি লাইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমাদের পার্টির আজ্ঞাবহ দাস করে রাখা হয়েছিল। এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, সামাজিক আন্দোলনে যাঁরা আসবেন তাঁদেরকে কিন্তু একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বাড়তি পরিসর দিতেই হবে। পার্টি যদি তাঁদের পাশে দাঁড়ায়, তাঁরা মনে করবেন যে এটা আমার জোরের জায়গা, পার্টি আমার পাশে আছে। কিন্তু আমার যেটা ক্ষেত্র, সেখানে ফর্ম নিয়ে আমাকে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে দিতে হবে।

কিন্তু পার্টি যদি প্রথমেই বলে দেয় যে এই এই বিষয়গুলি অপসংস্কৃতি, এগুলো করা চলবে না, আর এগুলো পার্টির পক্ষে, তখনই প্রশ্ন উঠবে যে পার্টির যে সামগ্রিক কর্মসূচি, শিল্পী-সাহিত্যিক হিসাবে আমার কাজ কি তার বিরোধী? নাকি তার পক্ষে?

এরকম একটা কথা শোনা যায় যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেওয়া, তা গড়ে তোলা। মানুষের দৈনন্দিন লড়াই, রুটি-রুজির লড়াইয়ে মানুষের পাশে থাকা। এইবার ভাবুন, এই সামাজিক আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে, কোথাও নারী বা শিশু নির্যাতন হচ্ছে, কোথাও শ্রমিকরা সামাজিক নিপীড়নের শিকার— এখানে কমিউনিস্ট পার্টি কী করবে? আমি অনেককে বলতে শুনেছি, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন যেসব কাজ করে, এখন কমিউনিস্ট পার্টি কি তাহলে সেই সমস্ত কাজ করবে?

এই সব প্রশ্নগুলি আলোচনার সময় এগুলিকে আরও একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখার সময় এসেছে। এখন পৃথিবীটা এত জটিল হয়ে গেছে যে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি যদি শুধু

মোটাদাগের রাজনীতি করে, দৃশ্যমান রাজনীতি, যদি মনে করে যে সেই রাজনীতির বাইরে আর কোনও রাজনীতি নেই, এই চিন্তাটা ঠিক না।

আধুনিক প্রযুক্তি এবং জটিল পরিস্থিতির কারণে এমন কিছু কিছু নতুন বিষয় আসছে এবং পরিবর্তন ঘটছে, বিশেষত বিশ্বায়ন-পরবর্তী যুগে, যার ফলে শুধু কমিউনিস্ট কেন, যে কোনও বামপন্থী শক্তির পক্ষেই বড় মাত্রায় কিছু করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আজকের প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যক্তি মানুষের একান্ত নিজস্ব পরিসর গড়ে উঠেছে, যেটা ভীষণভাবে বেড়েছে। এই একান্ত পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটেছে প্রতিদিন। তথ্যপ্রযুক্তির জন্য আপনার ইন্টারনেট-ভিত্তিক এক নিজস্ব সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যাদের সঙ্গে আপনি নানা ধারণা ভাগ করে নিচ্ছেন, নানা ধারণা আহরণও করছেন। আপনার উৎসাহের খবরগুলো আপনি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, সেগুলো নিয়ে আপনি আপনার পছন্দের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারছেন। আপনার পার্টির ওপর নির্ভরশীলতা কমছে। আপনার একান্ত নিজস্ব এই পরিসরের যাকে বলে একটা sanctity আছে— আপনার কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নিজের পরিসরটা আমাদের এত exclusive হয়ে যাচ্ছে, অথচ রাজনীতি তো সমষ্টি মানুষকে ঘিরেই। কেন্দ্রিকতার ধারণা পিছু হটার সাথে সাথে এই সমষ্টির ধারণাও পিছু হটছে।

আমাদের ইদানিংকালের বৌদ্ধিক চর্চায় দেখা যাচ্ছে, সমষ্টির কথা শুনলেই এখন লোকের উষ্মা জেগে ওঠে। বলা হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি সমষ্টির নাম করে পার্টিতন্ত্র কায়েম করেছে। এভাবে আমাদের ওপর বুঝি একটা repression চাপিয়ে দেওয়া হবে। এখন পাবলিক, কালেক্টিভ যদি ভেঙে যায়, তাহলে যারা সমষ্টি নিয়ে রাজনীতি করে, তারা কী করবে? তাদের কিছুই করার নেই।

এখন অবস্থা হচ্ছে ছোট ছোট কিছু নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে একজোট হওয়া— বৃহৎ সমষ্টির ধারণার বিপরীতে হাঁটা। এই সব স্বার্থকে ঘিরে কতকগুলো গোষ্ঠী তৈরি হওয়া। এই গোষ্ঠীগুলি হয়ত কখনও হাতে হাত মেলাচ্ছে বা মেলাচ্ছে না— কোনো কেন্দ্রীয় বিষয়ে ঐক্য নেই। আমরা আগে যে কেন্দ্রীয় সমষ্টিগত বিষয়গুলির কথা বলতাম, এখনও বলি, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না। এই যে আমরা বলতাম 'জনগণ' বা 'জনসাধারণ', masses, public, collective, এই কথাগুলোর ব্যঞ্জনাই এখন হারিয়ে গেছে। এগুলি আমরা এখনও শ্লোগান হিসেবে দিচ্ছি ঠিকই, পত্রপত্রিকায় লেখাও হচ্ছে, মার্কসবাদী পার্টিগুলি এখনও এগুলি ব্যবহার করছে। কিন্তু আগে আমরা এই সমষ্টির নাম করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম। আজকে সেই জায়গাটা কিন্তু হারিয়ে গেছে।

অনীক *: এই আন্দোলনগুলি স্থানিক, কিন্তু এগুলোর অনেকগুলিরই একটা বিশ্বায়ন-বিরোধী ভূমিকা আছে। বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন বলতে তার অর্থনৈতিক দিকটার কথা বলছি। রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ত এগুলি সবসময় নয়। আমরা আলোচনা করতে চাইছি এই বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনগুলি নিয়ে। জমি নিয়ে আন্দোলন, সেজ-বিরোধী আন্দোলন, এগুলি।*

আর একটা প্রশ্ন হলো, এই যে কেন্দ্রিকতার ধারণা, সমষ্টির ধারণা, পার্টির ধারণা, এগুলি নিয়ে যে নাক শিটকানো ভাব, সেটা তো শুধু ব্যক্তিগত স্তরে নয়, তাত্ত্বিক স্তরেও। সে নিয়ে যদি কিছু বলেন।

শোভনলাল : বিশ্বায়ন-বিরোধী যে সব আন্দোলনগুলি অর্থনৈতিক স্তরে হচ্ছে, সেই আন্দোলনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। যেমন সেজ-বিরোধী আন্দোলন এবং আমাদের দেশে অন্যান্য আন্দোলনের কথাও এখানে বলা দরকার, উচিতও। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা হলো, যাঁরা এই লড়াইটা করছেন, তাঁরা এক ধরনের বিশুদ্ধ অর্থনীতিবাদ ঘেঁষা আন্দোলনই করছেন। যাকে আমরা বলি economism। আমি যদি নয়া উদারপন্থী অর্থনীতির শিকার হই, তবে আমার দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া পড়া, চাকরির নিরাপত্তা, শিক্ষা স্বাস্থ্য সব নিয়েই আমি পীড়নের শিকার হচ্ছি। আমি যে কারখানায় বা সংস্থায় কাজ করি, সেখানের কর্মী হিসেবে আমি ভুক্তভোগী। কিন্তু এই আন্দোলনকে একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবা, সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট পুঁজি-সাম্রাজ্যবাদের অংশ হিসাবে এটাকে ভাবা, এই চেতনাটা এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে কজনের আছে?

সারা পৃথিবীর কথা বলছি না। আমাদের দেশে কিছু কিছু আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা যে একদম ঘটেনি তা নয়। কোনও কোনও আন্দোলনে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি বা কিছু কিছু বামপন্থী দল সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক। মানুষ লড়াই করছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে লড়াই করাটা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছে। তাঁরা তাঁদের মতো করে লড়াই করছেন। তাঁরা যখন দেখছেন যে তাঁদের লড়াইয়ের পাশে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, তাঁদের পাশে সংগঠিত বামপন্থী দলগুলো রয়েছে, যাঁদের সরকারের সঙ্গে দরদাম করার শক্তি রয়েছে, তখন তাঁরা বলছেন যে আমরা এঁদের কাছে আমাদের কথাগুলি বলতে পারি। তাঁদের খানিকটা বল-ভরসার জায়গাটা গড়ে ওঠে।

তাই বলব যে যতক্ষণ না এই পুরোপুরি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াইটাও বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া যায়, যেটা নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলিরই— এটা আজ তাদের করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। এই রাজনৈতিক লড়াইটার সবটাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে সংসদীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হচ্ছে। বাস্তব পরিস্থিতি এটাই যে, যে সব অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আমরা বলি,

সেটা এই সংসদীয় রাজনীতি-ভিত্তিক, তার বাইরে গিয়ে নয়। যারা, এই আন্দোলনগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরাও এই সংসদীয় বৃত্তেই ঘোরাফেরা করেন। এই সীমাবদ্ধতা নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলা, দরদাম করা, সরকার যাতে নিপীড়ন না চালায়, পুলিশ দিয়ে না পেটায়।

***অনীক** : অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে আগে কেন্দ্রিকতার ধারণা নিয়ে একটা রাজনীতির বিরুদ্ধে আর একটা রাজনীতিকে দাঁড় করানোর যে অ্যাজেন্ডাটা ছিল, সেটা খানিক দুর্বল হয়ে, একটা রাজনীতির বিরুদ্ধে একটা অ্যাডভোকেসিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে?*

শোভনলাল: হ্যাঁ, আগে দুটো রাজনীতির মাঝখানে কোনো পরিসর ছিল না। দুটো রাজনীতি— একটা সরকারের আর একটা সরকার-বিরোধী দলগুলোর— তারা সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত— মধ্যবর্তী কোনো পরিসর ছিল না। এখন এই দুই বিপরীত এবং বিরোধী রাজনীতির পরিসরে একটি মধ্যবর্তী পরিসর সৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঝখানে একটা ধূসর পরিসর নির্মিত হয়েছে।

***অনীক** : এই যে অন্য ধারার আন্দোলন, এটা যে শুধু সংসদীয় পরিসরেই হয়েছে তা তো নয়। সব সময়ে তারা সংসদীয় পরিসরের শক্তি নয়।*

শোভনলাল : এটা ঠিক যে বিশ্বায়ন-বিরোধী যাবতীয় আন্দোলন যে কেবল সংসদীয় রাজনীতি-ভিত্তিক শক্তিগুলিই করছে তা নয়। উড়িষ্যাতেই তা হয়েছে। সেটা কতদূর এগোবে আমরা জানি না। এমন হতে পারে এই সব অঞ্চলে যে তারা খানিকটা সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে পারছেন তার একটা কারণ এই যে সংসদীয় বামপন্থী শক্তিগুলো সেখানে তত জোরদার নয়। তবে এই হস্তক্ষেপ কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে তা এখনও অনুধাবন করা যাচ্ছে না। সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও তো সেটা আরও কঠিন। তারপর বর্তমান সরকার যারা এখন কেন্দ্রে আছেন, তারা তো এর বিরুদ্ধে খুবই কঠোর।

আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, তত্ত্বের স্তরে।

কেন্দ্রিকতা-বিরোধী নানান প্রবণতা রয়েছে। খণ্ডীকরণ এবং ক্রমাগত খণ্ডীকরণের তত্ত্বও বিদ্যমান। উত্তর-আধুনিকতাবাদ। এই খণ্ডীকরণ থেকে আরও একটা বিষয়ও উঠে এসেছে। এখন রাজনীতি, মতাদর্শ এগুলো যেন তেমন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়— সবটাই সামাজিক বিষয়। অর্থাৎ political-এর বিকল্প হলো social agenda। রাজনৈতিক বর্গের বিরুদ্ধে সামাজিক বর্গ। লড়াইটা হবে সামাজিক স্তরে, মাইক্রো স্তরে। এগুলিকেই এখন বড় করে দেখতে হবে।

এই কথাগুলো যে বলা হচ্ছে তার একটা কারণ তো বলেছি ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্রিকতার ধারণাটা নষ্ট হয়ে যাওয়া। মানুষ এখন মনে করছে যে কেন্দ্রিকতার ফলে আমার যে স্বাধীনতা, স্বাধিকার, তা খর্বিত হচ্ছে। এর ফলে এই খণ্ডিকতার ধারণা এত জনপ্রিয় হয়েছে। আর একটি কারণ বোধহয় আমাদের সাবেকি বামপন্থী দলগুলি, সাধারণভাবে যাদের আমি কমিউনিস্ট পার্টি বলব, কী সংসদ-কেন্দ্রিক, কী সংসদ-বহির্ভূত, যাই হোক না কেন, তাদের সাংগঠনিক কাঠামো মোটামুটি একই। সেটা হলো, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নির্মাণ, শৃঙ্খলা, সংগঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণা। মার্কসবাদীরা যাকে লেনিনবাদী পার্টির ধারণা বলে বর্ণনা করে থাকেন। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোয় এই লেনিনীয় ধারণাই কাজ করছে। এখন বোধহয় এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় উপস্থিত হয়েছে। এই জাতীয় পার্টি কাঠামো আজকের দুনিয়ায় আর চলতে পারে কিনা, বিশেষত আমাদের মতো দেশে, যেখানে আপনি সংসদীয় রাজনীতি অনুশীলন করছেন, সেখানে এই পার্টি কাঠামোর ধারণা সত্যিই কতটা প্রাসঙ্গিক? কোনও কমিউনিস্ট পার্টিই কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে খুব একটা ভাবনাচিন্তা করতে চায় না।

এখানে একটা বড় প্রশ্ন আছে। কেউ কেউ বলতে পারেন, কমিউনিস্ট পার্টি কি তাহলে আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের মতো ঢিলেঢালা পার্টি হয়ে উঠবে? বা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কাঠামো গ্রহণ করবে? এখন যদি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে খোলা মনের মত বিনিময়ের সুযোগ গড়ে ওঠে, তা হলে অন্য কিছু একটাও ঘটতে পারে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কেউই খুব একটা ভালো করে ভাবেনি। কিন্তু এই সব ভাবনাগুলি করা প্রয়োজন। এটুকু স্বীকার করা যায় যে, ভারতের প্রেক্ষিতে, আমাদের যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে সংসদীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এমনটা নয়, একটা স্বৈরতান্ত্রিক বা ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান হবে, এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই, এই সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে যে কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করে, তাতে কীভাবে কাজ করা হবে সে নিয়ে বিশেষ করে ভাবা দরকার।

আমি বলব, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে একটা সীমানা বেঁধে দিয়ে, সেখানে কিন্তু একটা মত বিনিময়ের পরিসর তৈরি করা দরকার। বিশেষত যাঁরা মতামতের দিক দিয়ে সংখ্যালঘু, তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, এর একটা প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা দরকার। এটা যদি না ভাবা হয়, তার পরিবর্তে আমরা এখন যেটা দেখছি, যে সাম্প্রতিক কালে, কথা বলতে চাইলেই বহিষ্কার, এটা কিন্তু অভিপ্রেত নয়। সাধারণ মানুষের কাছে এতে করে ভুল বার্তা যাবে। ভিন্ন স্বরের কথা আপনারা শুনতেই চাইছেন না। মানুষ বলছেন যে আপনারা সংসদে গণতন্ত্র নিয়ে এত কথা বলেন, আর আপনাদের পার্টিতেই বিরুদ্ধ মতের স্থান নেই, গণতন্ত্র নেই!

উল্টোদিকে আবার এটাও মাথায় রাখা দরকার যে অনেকে যে বলেন ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর কথা মাথায় রেখেই কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামো গঠন করা দরকার— তা হলে কি পার্টির মধ্যে কোনও গোপনীয়তা থাকবে না? একথা ঠিক যে বর্তমান মুহূর্তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ঠিক

এর পর ১০৬ পৃষ্ঠায়

অন্য ধারার আন্দোলন

নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন, এনজিও এবং আরও কিছু কথা

সাক্ষাৎকার : সত্যব্রত চক্রবর্তী

সত্যব্রত : আমি ভেবেছিলাম, আলোচনাটা হবে নতুন সামাজিক আন্দোলন নিয়ে, কিন্তু প্রশ্নগুলো সবই *এনজিও*-কে কেন্দ্র করে। এ দুটো কিন্তু সমার্থক নয়। *এনজিও*-র একটা অনুসঙ্গ আছে। *এনজিও* বললেই যেসব কথা মাথায় আসে নতুন সামাজিক আন্দোলন বললে মাথায় তা আসে না। নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন বললেই মাথায় আসে পরিচিত ধারার বাইরে আন্দোলন, নতুন ইস্যু, নতুন পদ্ধতি, নতুন গোষ্ঠী এবং প্রায়শই আইডেন্টিটি পলিটিক্স-এর কথা। *এনজিও* বলতে অবধারিতভাবে এগুলো বা এর কোনো একটা এসে পড়ে, তা কিন্তু নয়।

আপনি *এনজিও*-র এজেন্ডা ঠিক করার এক্তিয়ারের কথা বলছিলেন। *এনজিও* শব্দবন্ধটিও কিন্তু বেশ সমস্যার। এর একটা সরকারি ডিসকোর্স আছে, যেমন বিশ্বব্যাংকের। সেখানে যে *এনজিও*-র কথা বলা হয়েছে, প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ বা *পিপিপি*-র কথা বলা হয়েছে বহু সংগঠন, যাদের আমরা *এনজিও* বলি, তারা এদের মধ্যে পড়ে না। বাংলাদেশের মহঃ ইউনিসের একটা জীবনী পড়ছিলাম তাতে আছে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে একটা বিশাল পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা বলছিল, যাতে শর্ত ছিল যে 'গ্রামীণ ব্যাংক'কে তার অংশীদার করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে *এনজিও*-র কথা যখন আমরা ভাবি, তখন তারা নিজেরা অ্যাজেন্ডা ঠিক করবে, এটা বিশেষ আসে না। ইদানিং আরেকটা জিনিস খুব সামনে আসছে। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি। এই কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির নামে যে খরচ করা হয়, সেটা ওরা অনেক সময়ই করে *এনজিও*-র মারফত।

একটা কথা বলা হয়, *এনজিও* হলো ননপ্রফিট অর্গানাইজেশন। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে যেভাবে মুনাফা করা হয় সেটা এখানে হয় না। কিন্তু যেভাবে প্রজেক্ট তৈরি করা হয়, তার বাজেট করা হয়, তাতে সরকারি ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় খরচের মাত্র ১৭ না ২৭ শতাংশ মাত্র লোকের কাছে পৌঁছায়, অনেকটা সেরকমই দাঁড়ায়। সরাসরি মুনাফা না করলেও যে গাড়ি তারা ব্যবহার করে, যে লাইফস্টাইল মেনটেন করে তাতে বোঝা যায় কীভাবে বাজেটিং করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের এজেন্ডার ফলে আমাদের দেশেও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

আমাদের দেশে যখন এমপি-ল্যাড চালু করা হলো তখন দেখেছি যারা যেখানে ক্ষমতা তার স্ত্রী-র *এনজিও*-ই সব কাজ করছে। উত্তরবঙ্গের কালচিনি গিয়ে দেখেছি এক এমএলএ বা পঞ্চায়েত প্রধানের স্ত্রী *এনজিও*-র ডিরেক্টর, আত্মীয়স্বজনরাই বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য। ফলে যেটা হচ্ছে, একটা সাব-এজেন্সি তৈরি হলো, যেখানে এজেন্ডা ফিক্সিং ইজ কার্বড। এইসব এনজিও-দের একটা বড় অংশ অবশ্যই নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির অংশ, তার সাব-এজেন্সি, ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি। সরকারের শাখাপ্রশাখা, অ্যাপেন্ডেজ। তার ফলে টাকা লিকেজ অনেক ক্ষেত্রেই কমছে না, শুধু লোক বদলে যাচ্ছে।

অনীক : *আপনি যেটা বলছেন সেটা হলো নানা ধরনের এনজিও আছে যাদের সঙ্গে আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই, যারা এই সোশাল অর্ডারের অংশ। আন্দোলনের সঙ্গে আছে যেসব এনজিও, তাদের ওপর যদি আলোকপাত করেন।*

সত্যব্রত : তাহলে আমরা আপনাদের দেওয়া প্রশ্ন ধরেই আলোচনা করি।

***প্রশ্ন ১** : কিছু কিছু এনজিও দেখা যাচ্ছে সরকার ও বিশ্বায়িত পুঁজির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। তারা এদের কাছ থেকেই টাকা পায়, আবার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও অংশ নেয়। এই স্ববিরোধিতাকে আপনি কীভাবে দেখবেন?*

সত্যব্রত: স্থানীয় সরকার ও বিশ্বায়িত পুঁজি আসলে একই কথা বলছে। লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু ছোট ছোট দেশ বাদ দিলে, অন্যরকম কিছু আমরা দেখতে পাই না। বিশ্বায়িত অর্থনীতি ও স্থানীয় সরকার, এদের আলাদা না করাই যেতে পারে। তার মানে স্থানীয় বা দেশীয় সরকারের সব স্বাতন্ত্র চলে গেল তা কিন্তু নয়।

ফান্ডের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন, আমাদের আপত্তিটা কোথাও? আপত্তিটা কি বিদেশি টাকা নিয়ে, নাকি বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি টাকা বা ফান্ডিং নিয়ে? বিদেশি ফান্ডিং কথাটা একটা খুব বহুব্যাপ্ত শব্দবন্ধ। আমি অনেক এনজিও জানি, যেমন বারাসত বা তার কাছাকাছি এলাকার একটি এনজিও, তারা জার্মানি থেকে টাকা পায়। জার্মানির একটা গ্রুপ, তারা বিভিন্ন জায়গায় ভারত নিয়ে প্রচার-প্রদর্শনী চালিয়ে টাকা যোগাড় করে এদের পাঠায়। এর সাথে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। হয়ত এটাও সেই একই ডেভলপমেন্ট ধারণার অংশ, কিন্তু এ সবগুলোকে একই ব্রাকেটে ফেলা যায় না। বিদেশি টাকা মানেই অচ্ছুৎ, এটা নাও হতে পারে।

ফান্ডিং আর আন্দোলন, এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা। হয়ত আছে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বটা অনেকাংশে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তারই প্রতিফলন। যেমন ধরুন, আমেরিকার শ্রমিকরা দাবি করছে আউটসোর্সিং বন্ধ করার জন্য। আবার ভারতে লোকেরা কাজ পাচ্ছে এই আউটসোর্সিং-এর জন্য। এই বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে

অধ্যাপক, লেখক, চিন্তক শ্রী চক্রবর্তীকে বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য লিখিত আকারে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্নগুলো ধরে আলোচনা চলে।

তাই বিশ্বের শ্রমিক এক হও— এটা দাঁড় করানো খুব কঠিন। যেমন ধরুন, কোনো বিদেশি পরিবেশ সংস্থা যখন এখানে কাজ করছে তাদের নিজেদের একটা এজেন্ডা আছে, যেটা পরিবেশের উন্নতি সম্পর্কিত। কিন্তু আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে তার তাৎপর্য কী? তারা যা করতে চাইছে তা করলে এই বিশ্বায়িত অর্থনীতির প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতের যে সুবিধা আছে সেটা ভারত হারাবে। এটা একটা একটা কারণ যে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বে সরে আসছে। তার কারণ, পরিবেশ আইন এখানে তুলনায় শিথিল, যা আছে তাও টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করা যায়। আমার কাছে তাহলে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে যে একটা লোক কোনো আয় করবে না, অথবা সে বিপজ্জনক (হ্যাজার্ডাস) শিল্পে কাজ করে আয় করবে। অর্থাৎ সে বেঁচে মরবে, নাকি মরতে মরতে বেঁচে থাকবে— যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে বাঁচছে, আয় করছে, তাতেই সে রোজ একটু একটু একটু করে মরছে। কিন্তু মানুষ তো প্রথমে আজকে বাঁচতে চায়। এটা আরেক ধরনের জটিলতা।

তাই ওরা যখন বিদেশি টাকা নিচ্ছে, আবার সরকারের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন সরকারের যে নীতির বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে, তার যারা প্রপাগেটর তাদের থেকেই টাকা পাচ্ছে এরকম যদি হয় তবে তার কারণটা কী? কারণ হলো প্রতিযোগিতা— কাটথ্রোট কম্পিটিশন। সিঙ্গুরে টাটা যে অভিযোগ করেছিল যে আন্দোলনের পেছনে অন্য কর্পোরেটরা আছে, সেটা একেবারে ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। বিজনেসম্যানরা এটা করে। আমেরিকা যত মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদির ওপর জোর দেবে, আমরা কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের সুবিধা হারাব। প্রতিযোগিতায় আমাদের সুবিধে, আমাদের কমপিটিটিভ এজ-টা আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে অসাম্য আর অ-ন্যায়ের (ইনজাস্টিস) ওপর। এটা একটা জটিল বিষয়। ওরা এইসব আন্দোলনকে টাকা দিচ্ছে, হয়ত ইচ্ছা করেই এগুলোকে টাকা দিচ্ছে। তাতে ওদের দেশ প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাবে। এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তার মূল কিন্তু নিহিত আছে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতার মধ্যে। ডবলিউটিও-র মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। ওরা এখন বলছে কমপ্রিহেনশিভ কভারেজ-এর কথা। শুধু কর-সংক্রান্ত বিষয় বা টারিফ নয়, সোশাল সেক্টরটাই এখন ওদের টার্গেট, লক্ষ্যবস্তু। ওরা বলবে এদেশে সরকারকে নিউট্রিশন লেবেল বাড়াতে হবে, ডিফরেস্টেশন বন্ধ করতে হবে, ইউনিফর্ম লেবার স্ট্যান্ডার্ড চালু করতে হবে, আর আমাদের সরকার বলবে 'উন্নয়ন' করতে হবে।

প্রশ্ন ২ *: ট্রাডিশনালি এনজিও-রা সার্ভিস সেক্টরে (গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) ছিল, এখন তারা আন্দোলনে আসছে, যেমন এনরেগা, আরটিআই ইত্যাদি নিয়ে, এমনকি মৃত্যুবরণও করছে। এই পরিবর্তনের উপর কিছু বলবেন?*

সত্যব্রত : প্রথমত, এটা তথ্যের দিক দিয়ে পুরো ঠিক নয়। সত্যশোধক সমাজ, বিদ্যাসাগর— এদের যে প্রচেষ্টা সেগুলোও প্রতিষ্ঠিত অথরিটির কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখো দিয়েছিল। সেগুলোও তাই আন্দোলনই ছিল। ফলে বিরাট একটা প্যারাডাইম শিফ্‌ট হয়েছে বলা যায় না। আর অন্যদিকে এটাও বলা যায় না যে এখনকার *এনজিও*-রা মূলত আন্দোলন-ভিত্তিক।

অনীক *: আপনার কথাটা একদিক থেকে ঠিকই। কিন্তু শুধু সামাজিক সমস্যা নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনেও এখন অনেক এনজিও অংশ নিচ্ছে। এটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইব।*

সত্যব্রত : *এনজিও*-রা এখনও মূলত আন্দোলনের সংস্থা নয়। কিন্তু এই আন্দোলনের বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলতে পারি। ধরুন, *এনরেগা*। এটা অর্থনৈতিক সংস্কার বা রিফর্মেরই অংশ। এই রিফর্মটা মূলত এক্সক্লুশনারি। রিফর্মের যদি কোনো *ড্রাইভিং কনশেপ্ট* থাকে সেটা হলো প্রতিযোগিতা। তার ফলে টেকনোলজি আপগ্রেডেশন, আউটসোর্সিং। রিফর্ম যে বাজারকে দেখে, যে বাজার তার লক্ষ্য, তার নিয়মিত সদস্য হলো জনসংখ্যার ১৫-২০ শতাংশ। সংখ্যাটা বিরাট, কিন্তু সবাই তো এর মধ্যে নেই। বাকিরা, একটা বড় অংশের লোক, এই বাজার-অর্থনীতির বাইরেই থেকে যাবে।

ভারতবর্ষে দ্বন্দ্বটা এই যে এখানে এই এক্সক্লুশনারি অর্থনীতি আর ইনক্লুশনারি রাজনীতির মধ্যে একটা ব্যালান্স করতে হয়। পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের সময় তো লোকগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

পাঁচ বছর পর পর যেহেতু ওদের সামনে যেতে হয়, ফলে লোকগুলোকে তো মেরে ফেলা যাবে না। কিন্তু অর্থনীতির অংশও করা যাবে না। আবার একথাও বলা যাবে না যেহেতু ওরা হেরে গেছে, ওদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। সংখ্যার দিক দিয়ে এরা যেহেতু খুব বড়, তাই এরা রাজনৈতিকভাবে অ্যাসার্টিভ হতে পারে। তার মানে, প্রণব বর্ধন যেমন বলেছেন— দুর্গের মধ্যে ভাগাভাগি চলছে, কিন্তু দুর্গের দরজায় আঘাত ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন জানালা দিয়ে কিছু রুটির টুকরো ছুড়ে ফেলা হয়; সেটা নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি চলে— কে তা পাবে আর কে পাবে না। এই খেলাটাই চলছে। একারণে বলব, *এনরেগা* বা এই ধরনের যে সমস্ত যোজনা হয়েছে হয়েছে। এগুলো রিফর্ম প্যাকেজেরই অংশ। এটা গণতন্ত্রের একটা কমপালশন। একটা এলাকাকে পুরো ফাঁকা করে দখল করে নেব, এইটা ভারতবর্ষে কঠিন। এই মানুষরাও জানে যে প্রতি পাঁচ বছরে একবার তাদের মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের চাপ উইথস্ট্যান্ড করার ক্ষমতা সামরিক শাসনের থেকে অনেক বেশি। তার কোনো দায় নেই। গণতন্ত্রের কিছু দায় আছে। ফর্মাল ডেমোক্রাসি হলেও তার স্পেসটা কম।

পাশাপাশি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, যেখানে কোনো কোনো *এনজিও*-র বেশ পজিটিভ ভূমিকা আছে। আমরা

আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নই, আমরা আমাদের সরকার নিয়ে সন্তুষ্ট নই। এই যে মাঝের পাঁচ বছর, এই সময় যদি তারা সংবিধানকে বিরাটভাবে লঙ্ঘন নাও করে— যা করার প্রয়োজনও বিশেষ পড়ে না— তা হলে কি তাদের এই পাঁচ বছরের মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন করা যাবে না?

এখন দেখা যাচ্ছে, প্রশ্ন করা যাবে। সেখানে সিভিল সোসাইটির আন্দোলনের কথা আসে। সিভিল সোসাইটির একটা জোরের জায়গা হলো তারা নন-পার্টিজান। যদিও নন-পলিটিক্যাল নয়— আমি যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করি সেটা একেবারেই একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু সেটা পার্টিজান আন্দোলন নয়। নন-পার্টিজান হওয়ার কারণে তারা পরিধি বাড়াতে পারে। বিবিধ অর্থে যে প্রান্তিকীকরণ হচ্ছে, আগেও ছিল, নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সাহায্য করে, শক্তিশালী করে। তার আর একটা প্রকাশ হলো জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম। সরকারের জবাবদিহির দায় থাকছে, সবসময় অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে।

বড় একটা ঘটনা, একটা ল্যান্ডমার্ক ফেনোমেনন তো একটা মাত্র ফল নিয়ে আসে না। সে যেমন আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে, আমার রাজনীতি হচ্ছে তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে কতদূর এগোনো যায়।

নারী আন্দোলন, হকারদের আন্দোলন, বাড়িতে বাড়িতে যারা সহায়িকার কাজ করেন, অসংগঠিত ও প্রান্তিক শ্রমজীবীদের আন্দোলন— এগুলো যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা সেটা ভুলেই গিয়েছিল। যে শ্রমিকশ্রেণীর কথা বামপন্থীরা বলে, তারা তো অস্তিত্বই হারাতে বসেছে। যারা রয়েছে, এবং যারা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি কষ্টে আছে তারা হয়ত জামাকাপড় ভালো পড়ছে, হয়ত টাই ঝোলাচ্ছে, কিন্তু মাসে মাইনে হয়ত পাচ্ছে ৩০০০-৪০০০ টাকা। কেউ হয়ত সিকিউরিটির কাজ করে, কিংবা মলে। যারা অটো চালান বা অটোর মালিক-চালক। এদের ভোটের সময় ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু বামপন্থীরা এদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে নি। কিন্তু এদের দিকে নজর না দিলে, রাজনৈতিকভাবে নজর না দিলে, বামপন্থার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। এদের সংখ্যাটা যদি বিচার করেন, সেটা বিশাল। এরা তৈরি হয়েছে মূলত বামফ্রন্ট আমলেই, কিন্তু এদের প্রতি কেউ নজর দেননি।

এখানে একটা কথা বলব। মমতার বিজয় আসলে একভাবে বামপন্থার বিজয়। সাধারণ অর্থে এটা যেভাবে বলা হয় আমি ঠিক সে অর্থে বলছি না। মমতার বিজয়টা বামপন্থার বিজয় আমি এই অর্থে বলছি যে পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের একটা অবদান তো অস্বীকার করা যাবে না। আমরা যারা কংগ্রেস আমলের শেষ অংশটা দেখেছি এবং যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, আমরা দেখেছি একটা বিশাল অংশ লোক মুষ্টিমেয় লোকের পকেটে ভরা ছিল। পশ্চিমবঙ্গেরও চিত্রটা এই ছিল, জমিদারি চলে যাওয়ার পরও জমিদারবাবু এলে আল থেকে তাদের নেমে যেতে হবে, মাথায় ছাতি দিতে পারবে না, তিনি চায়ের দোকানের পাশের বেঞ্চিটায় এসে বসলে অন্যরা সেখানে বসতে পারবে না।। মূলত বাম আন্দোলন এবং অন্তত প্রথম দুটি বামফ্রন্ট সরকারের একটা অবদান এই যে এ অবস্থা পাল্টে গেছে। ওরা এখন চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু, এখানে একটা প্যারাডক্স দেখা দিল। তারা যখন এটা শিখল, বামপন্থীরাই শেখাল, ততদিনে শাসকের পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাদের সামনে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকার।

আমার মনে হয়, বিহার-উত্তরপ্রদেশের জয়প্রকাশের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেটা হয়েছিল, সেটা পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তের আধিপত্য রয়ে গেছে, কিন্তু তলা দিয়ে সেটার ক্ষয় হয়েছে। লালুপ্রসাদের যে আচার-আচরণ, সেটা খুব পরিকল্পিত। তিনি আসলে তথাকথিত ভদ্রসমাজের, ভদ্রলোকের সংস্কৃতির একটা ক্যারিকেচার করে যান। তার মধ্য দিয়ে এই নিম্নবর্গ একটা জায়গা পায়। পশ্চিমবঙ্গে এটা হয় নি। সিপিএম-এর সেক্রেটারিয়েটে তপসিলি জাতি, উপজাতি বা মুসলিমদের কোনো প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই। বামপন্থীদের যে মতাদর্শ ছিল সাম্যের জন্য লড়াই করা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সে কি আমার সাথে ডাইনিং টেবিলে খায়?

অর্থনৈতিক সংস্কার বা রিফর্ম করতে গেলে ওদের মানবাধিকার, গণতন্ত্রের কথা বলতে হচ্ছে, সেটা সবসময় কিন্তু ওদের টার্মসে হচ্ছে না। কয়লা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় দেখুন। ১৯৯৩ থেকে সব বাতিল।

কিছু রিলিফ দেওয়া থেকে *এনরেগা*— এগুলো রিফর্মেরই অংশ। কিন্তু তার সমস্ত ফলাফল, সব *র‍্যামিফিকেশন* ওদের কাম্য নয়।

প্রশ্ন* ৩ *: সামাজিক ক্ষেত্রে এনজিও-দের সাফল্য কী, ব্যর্থতাই বা কী? তাদের কি কোনো কমপ্রিহেনশিভ সামাজিক চিন্তা আছে, বা তাদের চিন্তা কি একই ধরনের?

সত্যব্রত: খুব বড় পরিসরের (ব্রড) একটা প্রশ্ন। এখানে একটা আদর্শ অবস্থা ধরে নেওয়া হয়েছে, যা স্ববিরোধী। পার্টির সঙ্গে নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলনের একটা পার্থক্য আছে। পার্টি অনেক বেশি ইনক্লুসিভ। নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন অনেক বেশি একটি ইস্যু কেন্দ্রিক, তাদের সাথে থাকেও সমাজের একটা অংশ মাত্র। তাদের কাছে কমপ্রিহেনসিভ সামাজিক ভাবনা আশা করা যায় না। সেটা র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ।

প্রশ্নের মধ্যে আমি দুটো দিক পাচ্ছি। নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলনের অ-সমসত্ত্বতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব।

ধরুন বায়ু দূষণ বিরোধী একটা ব্রড মঞ্চ হতে পারে। কিন্তু এটা আটকানোর জন্য যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে

অনেকের রুজিরোজগার চলে যেতে পারে। এর মধ্যে যে প্যারাডক্স আছে, সে কারণে নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলনগুলি স্থায়ী হয় না।

আজকে একটা বিতর্ক উঠেছে। ১৬ বছরের বাচ্চা কোনো অপরাধ করলে তার জুভেনাইল হিসাবে বিচার হবে, নাকি সে ধর্ষণ করলে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখা হবে— এটা আবার সবাই মানছেন না। মনস্তত্ত্ববিদরাও এ নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করছেন।

বা ধরুন, 'সেক্স ওয়ার্কার'-দের বিষয়টা। সেক্স ওয়ার্কার কথাটা ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা সেটা নিয়েই বিতর্ক আছে। নারী শরীর যে বাণিজ্যিক পণ্য— এই বাস্তবতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এই সেক্স ওয়ার্কার কথাটার মধ্যে।

সাফল্য, না হার?

নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলনের একটা বড় সাফল্যের জায়গা হলো, যেগুলোর আগে ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতিই ছিল না, সেগুলো এখন আলাপ আলোচনায় আসছে, ইস্যু হয়ে উঠেছে। এর অর্থ এক ধরনের গণতন্ত্রীকরণ। দুর্বার-এর কথাটাই ধরা যাক। যারা আগে আলাপ আলোচনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল, তারা এখন একটা ইস্যু। তারা এখন সভায় দাপিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে।

কিন্তু নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন বা *এনজিও* কোনোটাই যেহেতু সমসত্ত্ব কিছু নয়, তাই এক কথায় সাফল্য নাকি হার সেটা বলা যাবে না। সমাজে বিভিন্ন স্পেস (পরিসর) আছে। সেটাকে কতটা ব্যবহার করা যাবে। রাইট টু ইনফর্মেশন যেমন। সেটা হয়ত এখনো পর্যন্ত তেমন ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু অথরিটির জায়গায় যারা আছেন তাদের মাথায় এটা এসে গেছে। আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখেই বুঝছি। সবাই সতর্ক হয়ে উঠেছেন।

ক্ষতির দিক নিয়ে দুটো কথা বলব।

এনজিও এই শব্দবন্ধটাই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, বর্তমান মোদি সরকারের আমলে তাদের গণশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হতে পারে। যেমন *গ্রিন পিস*-কে এখন করা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য আবার শুধু সরকারকে দায়ী করা যায় না। এখন *এনজিও*-র কাজটা হয়ে উঠেছে একটা দারুন পেশা। যেকোনো পেশার মতোই সেখানে ওপরে ওঠার ব্যাপার আছে। *এনজিও*-র কাজ করতে করতে অনেকে এমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে যারা মাসে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করে। প্রথাগতভাবে যেগুলোকে বলা হতো লোকের কাজ করা, জনসেবা, চ্যারিটি, মানবহিতৈষণা— সেগুলো এখন বাতিল কথা।

এনজিও বলতে একটা সেল্‌ফলেস সার্ভিস বোঝাত সেটা আর নেই। তবে বাস্তবে এটা বোঝা উচিত যে সেল্‌ফলেস সার্ভিস দিয়ে সে বাঁচবে কী করে? আমরা ধরে নিচ্ছি, আমি একটা চাকরি করব, তারপর কিছু সময় হয়ত দেব সামাজিক কাজকর্মে। আর এনজিও-র কর্মী কাজ করবে সামান্য কিছু হাতখরচ নিয়ে— তাদের সবাইকে এত মহান ভাবার অধিকার আমায় কেউ দেয়নি। এটা আমাদের দিক থেকে বোঝার ক্ষেত্রে একটা সমস্যার দিক।

ক্ষতির দিকে, *লেজিটিমেসি*-র একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাতে *এনজিও*-র একটা ভূমিকা আছে, সরকারের একটা ভূমিকা আছে— সরকারের দুরকম ভূমিকা আছে। আর আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে।

আমি ধরে নেব *এনজিও*-রা পেশাদার (প্রফেশনাল) হবে। কিন্তু প্রফেশনাল হওয়া মানে তো ধনী হওয়া নয়। এখন *এনজিও*-রা সেইসব কাজে আগ্রহী, যাতে পয়সা আছে। সে কাজটার এখানে কতটা প্রয়োজন সেটা দিয়ে নয়। যেমন নারী বিষয়ক ক্ষেত্রে পয়সা আছে। তাই সেখানে *এনজিও*-রা আগ্রহী। সত্যিই এইড্‌স আসলে আমাদের দেশে কতটা ভয়াবহ? সব দেশে কি তা সমান ভয়াবহ? অথচ *এনজিও*-রা এইড্‌স নিয়ে কাজ করছে বেশি। আমাদের দেশের ৪০ শতাংশ অসুখ জলবাহিত, সেখানে পয়সা নেই, *এনজিও*-দের কাজও বিশেষ দেখা যায় না। তবে আমাদের দেখার মানদণ্ডটাও আদৌ প্র্যাকটিক্যাল নয়। মানুষে দেবত্ব আরোপ করতে চাইছি আমরা।

অন্যদিকে সরকারের দিক থেকে দুটো ব্যাপার আছে। একদিকে সরকার এদের কো-অপ্ট করছে, এদের এজেন্সিতে পরিণত করেছে। ফলে এদের অটোনমি অনেকাংশে চলে যাচ্ছে। আবার আর একটা দিক হচ্ছে, যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন সরকার এদের সমাজ-বিরোধী বলে, উন্নয়ন-বিরোধী বলে চিহ্নিত করছে।

প্রশ্ন ৪ : এনজিও-রা কি স্বাধীন, অর্থাৎ তারা কি অন্যদের স্থির করে দেওয়া এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে, নাকি কাজের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা, অটোনমি আছে?

সত্যব্রত: এই প্রশ্নের জবাবটা আগের আলোচনা থেকেই অনেকটা চলে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই এনজিও-রা বিশ্বায়িত অর্থনীতির অ্যাজেন্ডা মেনে চলে। তারা কি স্বনিয়ন্ত্রিত? আমি বলব, যেটাকে অটোনমাস বলে আমরা মনে করছি, সেটাও বস্তুগত দিক থেকে অটোনমাস, কিন্তু ধারণাগত দিক থেকে, কনসেপচুয়াল দিক দিয়ে কতটা অটোনমাস— সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

একটা উদাহরণ দেব। যেহেতু আমরা বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের বন্ধু, তাই তাদের সমালোচনা করার অধিকারও আমাদের আছে। হাসপাতাল চালানোর ব্যাপারে সফল হলেও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ক্ষয়ে এসেছে। ওদের যে কর্মসূচি ছিল 'চলো যাই রোগীর বাড়ি'— তাতে ওরা কি সফল? অথচ বেলুড় শ্রমজীবী যারা চালান তাদের ডেডিকেশন নেই, তা নয়। তারা যে ব্যাপারটা আমার থেকে ভালো বোঝেন না, তাও নয়। তারা খুব ভালো করে জানেন, রোগ প্রতিরোধ রোগ সারানোর চেয়ে অনেক ভালো। প্রিভেনশন ইজ মাচ বেটার দ্যান কিওর। হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তাই কমে যায়। কিন্তু এই কাজটার, জনস্বাস্থ্যের কাজটার, কোনো ডেমোনোস্ট্রেটিভ ভ্যালু নেই। ধরুন একটা স্কুলের সেক্রেটারি স্কুলের শুরুর আগে থেকে গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন, দৃষ্টি রাখেন ছাত্র শিক্ষকদের ওপর,

আস্তে আস্তে একটা উন্নতিও দেখা দেয়— পাঁচ বছর পর হয়ত রেজাল্টও ভালো হয়, কিন্তু তার জন্য কেউ পাঁচ বছর অপেক্ষা করবে না। অন্য একজন সেক্রেটারি এলেন, বিকাশ ভবন থেকে একটা গ্রান্ট এনে একটা নতুন বিল্ডিং বানালেন— তখন সবাই বলবে, হ্যাঁ, উন্নতি হয়েছে।

সমস্যাটা কার, কোথায়? আমার মনে হয়, আমাদের সামনে কোনো আয়না নেই। কিন্তু বেলুড়ের পরিবর্তনটা আমার কাছে একটা আই-ওপেনার। তাই বলতে পারি, অটোনমির প্রশ্নটা অনেক জটিল। বেলুড় অটোনমাস, আবার অটোনমাস নয়।

হাসপাতালেরও দরকার আছে। বিনায়ক সেনের সঙ্গে শঙ্কর গুহনিয়োগীর একটা বিতর্ক হয়েছিল। শঙ্কর গুহনিয়োগী যখন হাসপাতালটা করেন, বিনায়করা তাতে সায় দিতে পারছিলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল, তাহলে আমরা তো মূলধারার চিন্তাতেই ফিরে যাচ্ছি। গুহনিয়োগীর বক্তব্য ছিল, তুমি বা আমি লোকের কাছে যাচ্ছি তাদের কী প্রয়োজন তা ধরে নিয়ে (জনস্বাস্থ্য)। কিন্তু তারা তাদের কী প্রয়োজন মনে করে সেটাও জানতে হবে, সেটার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে (হাসপাতাল)।

আমি একটা পঞ্চায়েতের ওপর একটা সমীক্ষা করেছিলাম। ৮ টা জেলা, ৩২টা গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২০০ স্যাম্পল। তাতে একটা প্রশ্ন ছিল, আপনাদের এখানে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কী করা দরকার? প্রায় প্রতিটি প্রধান বলেছেন, একটা হাসপাতাল চাই। ভাবুন, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে হাসপাতাল। এটা একটা ভাবনা, আমি ভালো বা মন্দ কিছু বলছি না। অন্যদিকে রাণাঘাটের কাছে একটি গ্রামে এক মহিলা বললেন, রাস্তাটা পাকা করা দরকার। ভ্যানে করে নিয়ে যেতে যেতে মাঝপথে প্রসব হয়ে যাচ্ছে। এটা জীবন থেকে শেখা, ঘা খেয়ে শেখা। যেখানে প্রধানের মাথায় কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি মানে ডাক্তার, হাসপাতাল। এরা আমাদের ডিসকোর্সে, উন্নয়নের ডিসকোর্সে ঢুকে গেছেন। আর এই ভদ্রমহিলাও চাইছেন অ্যাকসেস টু হসপিটাল। হাসপাতাল তো মানুষের দরকার ঠিকই। প্রিভেনশনের কথা বলব মানে কিউরেটিভ-এর কথা বলব না— তা তো নয়। হাসপাতালে প্রসব আসলে তো রোগ প্রতিরোধেরই অংশ। এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে ৯০ শতাংশ প্রসব হয় বাড়িতে। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি আর হাসপাতাল তৈরি দুটো সমার্থক নয়। স্বাস্থ্যকে তাই হাসপাতালে বেঁধে ফেলা ঠিক নয়।

আর একটা কথা। অটোনমির জন্য অটোনমির কি কোনো দাম আছে? বেলুড়ের কথাটা যদি ধরেন, অটোনমি তো বর্তমান ব্যবস্থাটিকেই জোরদার করতে পারে। যেখানে সেটা বর্তমান ব্যবস্থার অন্তর্ঘাতের (সাবভার্সানের) কাজে লাগানো উচিত ছিল। তাই অটোনমি কোনো ভ্যালু-নিউট্রাল বিষয় নয়। কীসের জন্য অটোনমি? সেটাই বড় কথা।

আসলে আমরা অটোনমাস নয়, বাইরে থেকে দেখতে অটোনমাস। সত্যি বলতে কি, গ্রামে বড় জমির মালিকই রাষ্ট্র। সে কিন্তু কোনো অটোনমাস সংস্থার দারুণ বিরোধী— অন্তর্ঘাতের ভয়।

আমার এক বন্ধু বিহারে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে, পর পর গ্রামে প্রচুর স্কুলে পড়ার বয়সী ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। জমির মালিকরা বলছে, ছেলে স্কুলে গেলে কাজ দেব না। লেখাপড়া জানা খেতমজুর তারা চায় না। তারা চায় অশিক্ষিত খেতমজুর। শিক্ষার প্রসার প্রতিরোধ করা তার নিজের স্বার্থ।

রাষ্ট্র বা উঁচু শ্রেণীরা প্রতিরোধ করবে কিনা সেটা নির্ভর করছে এজেন্ডার ওপর। যদি এজেন্ডাটাকে তেমন ভীতিপ্রদ মনে না হয় তবে সেটা করতে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন *৫: অর্থাৎ এনজিও-দের যেখানে সফল মনে হচ্ছে সেটাই হয়ত তার ব্যর্থতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ব্যর্থতা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য....*

সত্যব্রত : অনেকগুলো জিনিসের ওপর সেটা নির্ভর করবে। একটা বৃহৎ অর্থে সফল *এনজিও*-র সাফল্যটাই ব্যর্থতা হতে পারে।

ধরুন, একটা এনজিও, তারা দেখছে, মেয়েরা স্কুলে আসে না, কারণ স্কুলটা সমশিক্ষার, কো-এডুকেশনাল। তখন তারা মনে করল, স্কুলকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। তারা সেটা করল। মেয়েরা লেখাপড়া করল। অর্থাৎ সাফল্য। আবার এক অর্থে তারা একটা পুরনো সনাতনপন্থী ধারণাকে জোরদার করে তুলল। মেয়েদের ঘরে থাকা উচিত। তাদের আলাদা করে রাখা উচিত।

প্রশ্ন *৬: সামাজিক শক্তি হিসাবে তাদের শক্তির দিক কোনটা, আর দুর্বলতার দিক কী?*

সত্যব্রত : এনজিও-রা প্রায়ই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যেমন আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ফণিবাবু চলে গেলে বেলুড় শ্রমজীবী— কী দাঁড়াবে?

নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন ও *এনজিও*— এরা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ব্যর্থ। আবার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে গেলে এদের প্রাণশক্তি কমতে থাকে। প্রতিষ্ঠানের অনেক দাবি থাকে। সেই দাবি পূরণ করতে করতেই অনেকটা শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ না হলে, একটা মানুষের ওপর নির্ভরতা চলে আসে, যে মুহূর্তে সেই মানুষটা নেই, একটা শূন্যতা দেখা দেয়। কোন্ পথে যাওয়া যায়?

আমি সুন্দরবন সরবেরিয়া শ্রমজীবী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। ওখানে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় মিটিং হয়। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই থাকেন। পরের দিনের কাজ বণ্টন হয়। সবাই সেখানে সব কাজ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আজ যার রান্নাঘরের কাজ, কাল হয়ত সে আউটডোরে কাজ করবে, এরকম। এভাবে একটা গণতন্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা চলে। এখান থেকে একটা মডেল বেরোতে পারে, নাও পারে।

সেখানে আমরা অন্য একটা সমস্যার মুখোমুখি। প্রত্যন্ত গ্রামে হাসপাতাল, ভালো রাস্তা নেই, তাও সেখানে প্রতিদিন ১৫০-২০০ রোগী হয়। হাসপাতালের সুবিধা নেন তারা। কিন্তু তাদের সামান্য কিছুটা সময় দিতে বললে খুব কম লোকই তাতে রাজি হন। মাঝে

মাঝে মনে হয়, আমরা কি কোনো জড়তাপ্রাপ্ত জনগণের সঙ্গে, ইনার্ট মাসের সঙ্গে কাজ করছি, নাকি তাদের যেভাবে জাগানো যায় সেটা আমরা জানি না? সাধারণভাবে *এনজিও* বা নতুন ধারার সামাজিক আন্দোলন সেটা জানে না। ধরুন, মেধা যে জায়গা থেকে আন্দোলনে অংশ নেন আর ডুবতে চলা গ্রামগুলোর বাসিন্দারা যে জায়গা থেকে আসেন— এদুটো প্রায়শ এক জায়গায় মেলে না। চিপ্‌কো-র ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব অনেক স্পষ্ট।

এই সমস্যাটার মূল অনেক গভীরে, আমরা যা ভাবি তার চেয়ে অনেক গভীরে।

ওদের কাজে নামানোর রহস্য— সেই প্রকল্প, সেই ভাষা, সেই কর্মপদ্ধতি— আমাদের জানা নেই। ফলে ব্যাপারটা একটা এলিটিস্ট চ্যারিটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা-ওরার ব্যাপারটা থেকে মুক্তি কীভাবে আমি জানি না।

প্রশ্ন* ৭ *: এনজিও ও অন্যান্য অ-পার্টি গণআন্দোলনের সঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের— যেমন শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেডইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলন, ব্যাংক কর্মীদের আন্দোলন— এদের মধ্যে কথাবার্তা, ডায়ালগ, এক ধরনের সমন্বয় কি সম্ভব?

সত্যব্রত : গণ প্রচেষ্টা বা পিপল্‌স ইনিসিয়েটিভ অন্যত্র নকল করা যায় না। তবে পার্টি ও গণপ্রচেষ্টার মধ্যে কথাবার্তা, আদানপ্রদান হওয়া দরকার। তা হওয়ার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে। কিন্তু তা বাগযুদ্ধে শেষ হয়।

আমাদের র‍্যাডিক্যালিজম-এ বলা হয় যে সিস্টেম বা ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেই সব পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তা হলে পোল্যান্ডের এত লোক চার্চে ফিরে যেত না। এ ব্যাপারটা বুঝতে হবে, শিখতে হবে। কমিউনিস্টদের বাইরে সামাজিক বিষয়ে যে চিন্তাভাবনা আছে, যেমন এদেশে গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের যে সামাজিক ভাবনা ছিল, সেটা আমরা জানি না। পশ্চিমের রাষ্ট্র-ভিত্তিক সংস্কৃতি নেব, নাকি মানুষ কেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভাবব?

প্রথমটা নিলে জনগণ বড়জোর টার্গেট বা লক্ষ্য। একাজে বহু এনজিও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এধরনের *এনজিও* যে গণ-অংশগ্রহণ ঘটায়— যদি আদৌ ঘটায়, তা মূলত পাওয়া-কেন্দ্রিক। এবং খানিকটা রিচিউয়ালিস্টিক। অন্যদিকে গভীর বা প্রকৃত অর্থে গণ-উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সময়েও ছিল, এখনও আছে।

কিন্তু এসবের ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা খুব আশা জাগায় না। গণপ্রয়াস-সৃষ্ট উদ্যোগও নির্ভর করে থাকে মুষ্টিমেয় সংগঠকের উপর। তার বাইরে সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা ও স্থায়ী অংশগ্রহণের নজির বিরল। সংকটকালীন অবস্থায় হয়ত তাদের আনাগোনা খানিকটা বাড়ে। কিন্তু তাকে ভাবানো, নিজের থেকে ভাবানো— তার চেষ্টা থাকলেও সাফল্য বিশেষ নেই। একটা রূঢ় বাস্তব হলো, না-দিয়ে পাওয়ার মানসিকতা পরিবর্তনে গণ-উদ্যোগের সাফল্য আমার নজরে খুব পড়ে নি। কেন এমন— তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে কোনো সদুত্তর নেই। তবে প্রশ্নটা আছে, এবং সেটা গুরুত্বহীন নয়।

আন্দোলন যত খণ্ডিত থাকবে তাতে লাভ পুঁজিবাদেরই

১০০ পৃষ্ঠার পর

সেরকম কোনও আশু বিপদ নেই। কিন্তু এখন বিপদ নেই বলে আগামী দিনে বিপদ আসবে না এটাও কিন্তু আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি না। এই বিপদ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির ক্ষেত্রে আকছার ঘটেছে। আমাদের নিজেদের দেশেও দেখেছি জরুরি অবস্থার সময়। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কিন্তু এই ভাবনাটাও থাকা প্রয়োজন। সংসদীয় রাজনীতির কারণে আপনার খোলামেলা হওয়া দরকার, আবার সেই সঙ্গে আপনার সেই প্রস্তুতিও রাখা দরকার যে হুমকি আসতে পারে।

লেনিন ১৯০২ সালে পার্টি গঠনের যে ফরমুলা দিয়েছিলেন, তার পেছনে ছিল জারের রাশিয়ার প্রবল নিপীড়ন। তার পরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মোটামুটি এই ফরমুলা অনুসৃত হতে থাকল। লেনিন কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে তাঁর ফরমুলাটিকে একট সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য ফরমুলা কখনও বলেননি। আমাদের লেনিন অধ্যয়নে মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাব রয়েছে। মার্কসের চিন্তায় তো বটেই, লেনিনের চিন্তায়ও একটা আশ্চর্য নমনীয়তা ছিল। ধরা যাক, ১৯১৭-র এপ্রিল থেকে নভেম্বর সময়কালে লেনিনের লেখা পড়লেই দেখা যাবে যে যেমন পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে লেনিনের লেখাও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাচ্ছে। ক্রমাগত তিনি নিজেকে পাল্টাচ্ছেন। আমাদের এই নমনীয়তার জায়গাগুলি ভাবা দরকার।

সংসদীয় গণতন্ত্রে আপনাকে মানুষের কাছে অনেক কিছু খুলে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে বামফ্রন্টের আমলে সর্বত্র রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়ার ভেতরে নীতিগতভাবে অন্যায় বা খারাপ কিছু নেই। কিন্তু মুশকিল হলো, রাজনীতির নাম করে যা হয়েছিল তা এক ধরনের পার্টিতন্ত্র, এবং পরে পার্টিতন্ত্রের নাম করে দাদাগিরি। এর ফলে একটা হুকুমদারির ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। এটা তো কোনও সত্যিকারের বামপন্থী রাজনীতি নয়।

রাজনীতি ঢুকলো ঠিকই, কিন্তু এর ফলে মানুষের কাছে রাজনীতির একটি বিকৃত অর্থ হয়ে গেল। এই স্থানীয় দাদাগিরিকেই তারা কেন্দ্রীয় রাজনীতির সমার্থক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। স্থানীয় স্তরে সব পার্টিরই দাদাগিরি রয়েছে। তাই মানুষ বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে এক পার্টি থেকে অন্য পার্টির রাজনীতি পৃথক করতে ভুলে গেল— রাজনীতি-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করল।

বুর্জোয়ারা তো ঠিক এটাই চায়। যত অরাজনীতিকরণ হয়— তাতে তাদেরই ভালো।

ভারতবর্ষে এই প্রথম সব ট্রেড ইউনিয়নগুলো এক হয়েছে

সাক্ষাৎকার : গুরুদাস দাশগুপ্ত

অনীক *: ১৯৯০ সালে উদারীকরণ চালু হবার পর সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে তার কী প্রভাব পরে?*

গুরুদাস : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বারবার হয়েছে, স্ট্রাইক হয়েছে, বিক্ষোভ হয়েছে, দিল্লীতে মিছিল হয়েছে। এই পিরিয়ডে (সময়পর্বে) বহুবার স্ট্রাইক হয়েছে।

অনীক *: আমাদের দেশে সব ধরণের শিল্পেই ঠিকা শ্রমিকরা ছিলেন এবং আছেন। বলা যায় ১৯৯০ পরবর্তী পর্বে সমস্ত শিল্পেই ঠিকা শ্রমিকরা সংখ্যায় বেড়েছেন উল্লেখযোগ্য হারে। উদারীকরণ পরবর্তী পর্বে ঠিকা শ্রমিকদের ওপর কী ধরনের আক্রমণ নেমে এসেছে?*

গুরুদাস : সবরকমের আক্রমণ। নিম্নতম মজুরি দেওয়া হয় না। প্রভিডেন্ট ফান্ড দেওয়া হয় না। গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয় না। কোথাও দেওয়া হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। ঠিকা শ্রমিকের ওপরে সব ধরনের জুলুম সারা ভারতবর্ষে বেড়েছে।

অনীক *: ২০০৮-এ হোন্ডা আন্দোলন ও সাম্প্রতিক কালে IMT মানেসরে মারুতি শ্রমিক আন্দোলন ও Automobile শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন। কারণ এই শ্রমিক আন্দোলন স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে একধরনের প্রাথমিক ঐক্য মালিক-ম্যানেজমেন্টকে অনেক ক্ষেত্রেই বেকায়দায় ফেলেছে বলে মনে হয়।*

গুরুদাস : আপনাদের এই অ্যাসেসমেন্ট ঠিক নয়। হোন্ডায় আন্দোলন হয়েছিল। হোন্ডার শ্রমিকরা মিছিল বার করেছিলেন। আমি সেই পর্বে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি সেই ঘটনাটা পার্লামেন্টে তুলেছিলাম, তারপরে বিভিন্ন প্রতিবাদ হয়েছিল। তারপরে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়। তাতে যাদের ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকে চাকরি ফিরে পায়। মানেসরের ঘটনাটা খুবই জটিল। অনেক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই চলছে।

অনীক *: NCR অঞ্চলে শ্রমিকরা (স্থায়ী ও ঠিকা) বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলিত হচ্ছেন। এই আন্দোলনগুলিকে দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভের সূচনা হিসাবে কি দেখা যেতে পারে?*

গুরুদাস : না। এটা এইভাবে বললে অত্যুক্তি হয়, অতিশয়োক্তি বলা হয়। ফ্লিকারিং প্রোটেস্ট হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। কিন্তু এটা একটা দেশজোড়া আন্দোলনের রূপ এখনো নেয় নি। সময় লাগবে এবং কীভাবে হবে সেটা নির্ভর করবে ভবিষ্যতের পরিস্থিতির ওপর।

অনীক *: বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে উদারীকরণের বিরুদ্ধে প্রধানত— আন্দোলিত হয়েছেন উচ্ছেদ হওয়া মানুষজন। মহারাষ্ট্রের রায়গড়া, উড়িষ্যায় নিয়মগিরি ও জগৎসিংপুর (পস্কো), কুদামকুলামের জেলেরা এবং সমুদ্র তীরবর্তী মানুষজন— উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের বামপন্থী শক্তি ও NGO-রা এই আন্দোলনগুলি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছেন। এই আন্দোলনগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন।*

গুরুদাস : এই আন্দোলনগুলো হচ্ছে এটা ভালো। NGO-গুলো শুধু কেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলোও রয়েছে। আন্দোলন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন। কোথাও আন্দোলনের জয় হয়েছে, কোথাও আন্দোলনের জয় হয়নি। কিন্তু এ আন্দোলন দেখে আমাদের শিক্ষা যেটা নেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে বিক্ষোভ এত প্রবল যে সেটা কখনো কখনো ফেটে পড়ছে। কিন্তু সেটা এখন কোনো সংগঠিত রূপ নিচ্ছে এমনটা না।

অনীক *: শ্রমিক আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনগুলির যোগসূত্র স্থাপন কি সম্ভব?*

গুরুদাস : সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যোগসূত্র সম্ভব।

অনীক *: বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন (কারখানাভিত্তিক বা শিল্প ভিত্তিক) গড়ে উঠেছে। এই ইউনিয়নগুলি শ্রমিক আন্দোলনে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বা আদৌ ভূমিকা রাখতে পারে কি?*

গুরুদাস : ভারতবর্ষে এই প্রথম সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো এক হয়েছে, ১১টা ট্রেড ইউনিয়ন। এর বাইরে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এবং তাদের নেতৃত্বে ২ দিনের ধর্মঘট হয়েছে। এটা ভারতবর্ষে কোনোদিনও হয়নি। এবং দিল্লীতে যে মিছিল হয়েছে সেটাও সর্বকালের মধ্যে সুবৃহৎ। এর বাইরে কোথাও কোথাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারে। তাদের উচিত এই কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে নিজেদের গলা মেলানো। এটাই ভারতের মূল ধারার ট্রেড ইউনিয়ন, এর বাইরে কিছুই নেই। উদারীকরণের কথাটি ঠিক নয়। '৯০ সালের পর যে নীতি নেওয়া হয়েছে— বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ফল দেখছি। শুধু উদারীকরণ নয়। শ্রমিকদের উপর পীড়ন বেড়েছে। শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। শ্রমিকরা লড়াই না করলে

গুরুদাস দাশগুপ্ত এআইটিইউসি-র সর্বভারতীয় নেতা

দিল্লীতে দুই দিনের এত বড় সমাবেশ হলো কী করে?

অনীক : *গত ২৪ বছরে সরকারি (PSU সহ) কর্মচারী, ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলন— '৬০, '৭০ বা '৮০র দশকের মত সর্বব্যাপী চেহারা নিচ্ছে না। এর কারণ কী?*

গুরুদাস : ঠিক না। ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটা ঠিক না। ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারা ১১ বার ধর্মঘট করেছে। বিক্ষোভ হয়েছে, মিছিল হয়েছে পর পর। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা দেখা যাচ্ছে। খুঁজে বের করতে হবে কেন হল। মধ্যবিত্ত ট্রেড ইউনিয়ন বলতে এখন প্রধানত ব্যাংক— LIC নয়, GIC নয়।

উদারীকরণ কথাটা ঠিক নয়। উদারীকরণ ছাড়াও প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন। আমাদের দেশে ১৯৯০ সাল থেকে যে নীতির বদল হয়েছে সেই নীতির বদলের ফলে শ্রমিকদের ওপর জুলুম বেড়েছে, শুধু উদারীকরণ নয়। সেই জুলুম বাড়ার জন্য শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে আন্দোলন করছে। তা না হলে দুদিনের ধর্মঘট, কোনোদিন ভারতবর্ষে হয়নি, তা না হলে ভারতবর্ষে কোনোদিন যা হয়নি এইসব ট্রেড ইউনিয়ন একত্রিত হয়েছে কী করে? তা না হলে অতবড় ট্রেড ইউনিয়ন বিক্ষোভ বিশেষত দিল্লীতে হল কী করে?

অনীক : *শ্রমিক আন্দোলনে দলগত বিভেদ কি আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর?*

গুরুদাস : নিশ্চই। সেই ক্ষতিটা বন্ধ করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে আমরা একত্রিত করেছি।

অনীক : *পশ্চিমবঙ্গে পাট, চা, কারিগরি শিল্পে ক্রমাগত হামলা, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, PF-Gratuity মেরে দেওয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ না থাকার কারণ কী?*

গুরুদাস : প্রতিরোধ নেই আমি এটা বলব না কিন্তু আরো জোরালো প্রতিরোধ হওয়া উচিত। প্রতিবন্ধকতা হল অনৈক্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে অনৈক্য। আর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

অনীক : *এই যে ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত আন্দোলন হচ্ছে আমাদের রাজ্যে তার ছাপগুলো কী? কী ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে?*

গুরুদাস : ছাপ পড়ছে। ২ দিনের ধর্মঘট আমাদের পশ্চিমবাংলায় ১ দিন হয়েছে। দিল্লীতে মিছিলে পশ্চিমবঙ্গের থেকে লোক গেছে। পশ্চিমবাংলায় চটকল শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন হয়েছে। রাজ্যের আন্দোলন এখনও চলছে। হরিয়ানায় বাস শ্রমিকদের আন্দোলন চলছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চলছে। আমরা এই সমস্ত আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক আন্দোলন করতে চাই। মিটিং-মিছিল চলছে।

এই জায়গাগুলিতে অনীক পাওয়া যায়

কলেজ স্ট্রিট

পিবিএস/পাতিরাম/বুকমার্ক/
বই-চিত্র/ধ্যানবিন্দু/এনবিএ (সূর্য সেন স্ট্রিট)

কলকাতার অন্যত্র

প্রগ্রেসিভ বুক স্টল (রাসবিহারী)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর)
যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গেট
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দে বুক স্টল (গোলপার্ক)
শ্যামবাজার বুক
পালবাবু (শ্যামবাজার পাঁচমাথা)
সুনীলবাবুর স্টল (উল্টোডাঙা, সোনি-র কাছে)
পিএনবি, সল্ট লেক

শহরতলি

দমদম (স্টেশনের বাইরের স্টল)
বেলঘরিয়া রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
সোদপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
খড়দহ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
ব্যারাকপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
কল্যাণী রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
সোনারপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম

কলকাতার বাইরে

ডানকুনি হাউসিং (লালটু-র স্টল)
দে বুক স্টোর, শান্তিনিকেতন (রতনপল্লী)
মিতালী টি হাউস (আলিপুরদুয়ার রেল বাজার)
বিয়ন্ড হরাইজন (আলিপুরদুয়ার কোর্ট)
আংড়াভাষা (শিলিগুড়ি, কলেজপাড়া)
পার্থ সেন (শিবডাঙি পাড়া, ইসলামপুর)
পার্থসারথি চৌধুরী-৯৪৭৪৬২৬৪৫৮ (জলপাইগুড়ি)
পরশ বরুয়া (গোলাঘাট, আসাম)

পাঠকদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের এলাকার পত্রপত্রিকার স্টলে *অনীক* রাখার উদ্যোগ নিন

সমাজতন্ত্র তৈরির প্রত্যয় ক্রমাগত বাড়ছে

সাক্ষাৎকার : দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

অনীক : *সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে। কখনো জমি-কেন্দ্রিক, কখনো মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্ব বা উপস্থিতি ব্যতিরেকেই এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠছে। এই ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী? আন্দোলনগুলোর মধ্যে নানান শক্তি নানান মতাদর্শ কাজ করছে। তাদের ব্যাপারে আপনাদের ভাবনা চিন্তা কী? এই আন্দোলনগুলির শক্তির দিক বা দুর্বলতার দিকগুলোই বা কী কী?*

দেবাঞ্জন : আমাদের দেশের উদারনীতির সম্পর্কে অনেকে বলেন ১৯৯১ সালে প্রবর্তন হয়েছে, কিন্তু আসলে ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিলেন শুরুটা তখনই, কেননা সেই ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু শর্ত চাপানো হয়, যে শর্তগুলো উদারনীতির সূচক। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: (১) সরকার আর ব্যবসা করবে না, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আর রাজ্যের অধীন পাবলিক সেক্টরগুলো ক্রমে তুলে দেবে; (২) স্থায়ী শ্রমিক কমাতে হবে ও ঠিকা শ্রমিক বাড়াতে হবে; (৩) ভর্তুকি তুলে দিতে হবে। সেই সময় *হিন্দু* পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এন রাম বেশ কিছু লেখা লেখেন, বামফ্রন্ট সরকারও অসীম দাশগুপ্তের নোট সহ একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই চুক্তির পরে পরেই, ১৯৮১ সালেই পাবলিক সেক্টর সম্পর্কে অর্জুন সেনগুপ্তর একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। *সিটু* সেটারও বিরোধিতা করেছিল।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা— এই দেশগুলোর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সব রাজনৈতিক দলের একটা করে ট্রেড ইউনিয়ন আছে— অন্য দেশে এমনটা নেই। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটু দ্বিধাবিভক্ত। ১৯৭০ সালে *সিটু*-র জন্মের পর থেকেই একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়— শ্রমিকদের আন্দোলন হবে সংযুক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। তারপর থেকে নানা মঞ্চ তৈরি হয়েছে; কেউ থেকেছে, কেউ চলে গিয়েছে; কিন্তু ভাবনাটা থেকে গেছে; যাতায়াতটা ছিল। এখন যেটা আছে তার নাম সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশন। CITU, INTUC, BMS, HMS, AITUC, AICCTU, TUCC, UTUC, AIUTUC, LPF (DMK), SEWA (গুজরাটের, এরা এনজিও আগে ছিল), ব্যাঙ্গালোর আর হায়দ্রাবাদ থেকে কেন্দ্রীয় দুটো স্বাধীন সংগঠন, সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর কো-অপারেটিভ, আর সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, বিএসএনএল, ডিফেন্স— সবাই। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ন্যূনতম মজুরি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা করা, বোনাসের সিলিং তুলে দেওয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটার পরিমাণ ৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার করা, ন্যূনতম পেনশন একহাজার টাকা করার দাবি করে আসছে এই মঞ্চ। এর মধ্যে অনেক দাবি আগের সরকারই মেনে নিয়েছিল। নতুন সরকার বিজ্ঞপ্তিও করেছে সবে সবে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড স্কীম করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্জুন সেনগুপ্তর রিপোর্টেই বলা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা করে ছ'টা বাজেটে যদি সরকার তিরিশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে তাহলে হয় ৩০-৩২ কোটি টাকা। তা থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বেনিফিট অর্থাৎ স্বাস্থ্য, পেনসন ইত্যাদির সুরাহা করা সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিল না। যথারীতি বলল, টাকা নেই। অথচ চার লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দিল কর্পোরেট সেক্টরকে। যেকোনো বাজেট দেখলেই এটা বোঝা যাবে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন হচ্ছে। সবচেয়ে বড় জায়গাটা তিরিশ কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন। সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো মোটামুটি একসাথে লড়ছে। দলগুলো সরকারে আসীন থাকলেও ট্রেড ইউনিয়নগুলো লড়ছে, কোনোরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর অধীনস্থ সংস্থা যেমন তেল, গ্যাস ইত্যাদি সেক্টরে। এখানকার আন্দোলনে অতি দক্ষিণপন্থী দল শিবসেনার শ্রমিক সংগঠনও অংশগ্রহণ করেছে। গত দশ বছরে সরকার অধীনস্থ সংস্থার সংখ্যা ২৪২ থেকে কমে ২১২টা হয়ে গেছে। আমাদের এখন একটা দেশজোড়া প্রচার আন্দোলন চলছে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে। তার মূল স্লোগানটা হবে 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও, ভারত বাঁচাও'। ONGC-র শেয়ার বিক্রি হবে আর তাতে RIL মানে রিলায়েন্স ইন্ডিয়া ঢুকবে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ONGC ড্রিল করেছে গ্যাস তুলবে বলে, কিন্তু তোলার কাজ শুরু করতে একটু দেরি হয়েছে। রিলায়েন্স বেনিয়ম করে প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পাম্প করে নিয়ে চলে গেছে। ONGC সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে। আমাদের এমপি তপন দাস, CITU-র সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে চিঠি লিখেছে এই রাষ্ট্রের সম্পত্তি লুঠ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী সিটু-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

অন্য দাবিটা হচ্ছে ICDS, আশা, প্যারা শিক্ষক, সাক্ষরতা প্রসারের কর্মী (BSPS), Child Labour Education ইত্যাদি স্কীমের ওয়ার্কারদের নিয়ে। মিড ডে মিলের বরাত কিছু কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা এক একটা অঞ্চলে বড় রান্নাঘরে রান্না করে স্কুলগুলোতে পাঠাবে— এতে লক্ষ লক্ষ ICDS কর্মীদের চাকরি যাবে। এখনো এদের পরিচয় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। এরা শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে না। দাবিটা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক নয়, শ্রমিক হিসেবে এদের আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। শুধু বামেরা নয়, সবাই এ দাবি করছে। আমাদের রাজ্যেও পৌর-স্বাস্থ্যকর্মীদের ষাট বছর বয়সে, ICDS কর্মীদের পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অবসর করানো হল কিন্তু কোনো ফাইনাল বেনিফিট দিল না। এ নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু রাজ্য সরকার ভ্রুক্ষেপ করল না।

নতুন করে একটা ঘটনা ঘটছে। এটা আগে ছিল না। মালিক ঠিক করে দিচ্ছে ইউনিয়ন করবে কি না, কিংবা কাদের ইউনিয়ন করবে। দেশের আইন বলে, শ্রমিকরা ঠিক করবে তারা কাদের ইউনিয়ন করবে। গুরগাঁও-এর মারুতি কারখানায় যে শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে সেটা এই ইউনিয়ন করার দাবি নিয়েই। ১২ মাসের বেশি হয়ে গেল ২০০ শ্রমিক জেলে আছে; তাদের অপরাধটা হল যে তারা ইউনিয়ন করতে চেয়েছিল। কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারগুলো মালিকের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। আমরা ILO -র কনভেনশন ৮৭ আর ৯৮ নিয়ে সবাই মিলে প্রচার করতে নেমেছি। এই ধারাদুটো যৌথ দরকষাকষি আর ইউনিয়ন করার অধিকার নিয়ে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার মানবাধিকারের অঙ্গ। সেই অধিকারকে আগের সরকার, নতুন সরকার ন্যায্যতা দিচ্ছে না। রাজ্যে তো কোনো কথাই নেই।

আগে গ্রামে কৃষকদের জন্য জল, সার, বিদ্যুৎ, বীজ, হিমঘর, বাজার আর পরিকাঠামো এই সাতটা ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য নানারকমের আর্থিক সহায়তা ও ভর্তুকি দিত। যাতে ফসল ফলাতে পারে, ফসল উঠলে বাজারে আনতে পারে। কিন্তু তাও কমাচ্ছে। কোথাও কোথাও প্রায় শূন্য। ফলে কৃষি উৎপাদনে যে লাভ পাওয়া যেত তা শূন্য, এমনকি নেগেটিভও হয়ে যাচ্ছে। ফলে চাষবাস অলাভজনক হয়ে যাচ্ছে। পাট, তুলো ইত্যাদি চাষ কমে যাচ্ছে। কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও বাড়ছে। ফলে এরা গ্রামে, গ্রামের বাইরে ভিড় করছে অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে— জরির কাজ, মোমবাতি তৈরি, শোলা ইত্যাদি কুটির শিল্প, বিড়ি বাঁধাই, জামার কলার বা বোতাম লাগানো, গ্রামের হিমঘরের শ্রমিক, রিক্সা-ভ্যান চালক, রিপেয়ারিং ইত্যাদি কাজে। যন্ত্র দিয়ে যতই উৎপাদন হোক না কেন এর হাত ধরে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। মনস্যান্টো বীজ যেটা একটা টারমিনেটর বীজ, অর্থাৎ যা থেকে ফলন হবে কিন্তু বীজ হবে না। প্রতি বছর বীজ কিনতে হবে আমেরিকা থেকে। বারোটা সরকারি সার কারখানা ছিল—সবকটা বন্ধ করে দিয়েছে। বিদেশ থেকে সার কিনতে হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

দুর্বলতা রয়ে গেছে। ট্রেড ইউনিয়নরা এই ৩৬ কোটি গ্রামের কৃষিমজুরদের আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি আর সামাজিক সুরক্ষার বলয়ে আনার যে চেষ্টা করছে তা কিছুই পারা যাচ্ছে না। এটাই আমাদের সীমাবদ্ধতা, অকপটে স্বীকার করা ভালো। ৬ কোটির মতো, তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যদি তবুও মেরে কেটে ১০ কোটি শ্রমিক ইউনিয়নের অংশভুক্ত। আর ২৬ কোটি মানুষ এর বাইরে, তাদের আমরা সংগঠিত করতে পারিনি। IT সেক্টরের বড়বাবুরাও এই ইউনিয়নের অধিকারের বাইরে। এরা অনেক টাকা রোজগার করে হয়তো কিন্তু এদের কাজের চাপ এত বেশি যে এদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই, মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ছে এই সেক্টরের কর্মীরা।

আমাদের দেশের আন্দোলনের প্রভাব শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এমনকি সুদূর গ্রিস, পর্তুগালের ওপরও আছে। আমাদের যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চের যে বৈশিষ্ট্য তা এই দেশগুলোর শ্রমিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। এসব দেশের শ্রমিকরাও যুক্ত মঞ্চ গড়ে লড়ছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানির মতো দেশে ট্রেড ইউনিয়নরা নয়, NGO-রা শ্রমিকদের সংগঠিত করছে। Standard of living-এর দাবি নিয়ে লড়াইও করছে। এই স্লোগান নিয়ে লড়ছে। ট্রেড ইউনিয়নরা কিন্তু সেভাবে সংগঠিত হতে পারেনি, আমরা পারছি না। NGO-রা ভূমিকা পালন করছে অথচ ট্রেড ইউনিয়নরা পারছে না— এটা একটা আলোচনার বিষয়।

এই যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে, কেউ কেউ ভাবছে এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই কিংবা এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল নেই, তা না। প্রতি বছর সারা পৃথিবীর ৪০-৪৫টা কম্যুনিস্ট পার্টি, ওয়াকার্স পার্টিগুলো একবার করে আলোচনায় বসে, হয় গ্রিসে, নয় পর্তুগালে, নয় সাইপ্রাসে। তারা রিভিয়ু করে এক বছরে কী কী আন্দোলন হল, কিংবা কী কী আন্দোলন হতে পারে। আমাদের দেশে যেমন সব রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন আছে, ইউরোপে তা নয়। একটাই ট্রেড ইউনিয়ন। তাতে বামপন্থীরাও আছে, দক্ষিণপন্থীরাও আছে। বামপন্থীদের চেষ্টা হল শ্রমিক আন্দোলনের অভিমুখ তাদের মতো করে সঠিক দিশায় নিয়ে যাওয়া। কখনো সফল হই, কখনো হই না। কিন্তু ব্যাপার হলো, ইউরোপে পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা সংখ্যায় বাড়ছে। শ্রমিক আন্দোলনগুলোতে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়ছে তাই এমনটা হচ্ছে। তাই বলে কি প্রচুর বাড়ছে? দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে যাচ্ছে? এমনটা নয়। কোথাও দুটো কোথাও পাঁচটা— এমনটাই।

লাতিন আমেরিকা—হুগো চাভেজরা যখন আমাদের দেশে এলেন, আমাদের পঞ্চায়েত দেখলেন, ভূমি সংস্কার সম্পর্কে

জেনে গেলেন। এইসব জিনিস ওদের দেশে কাজে লাগিয়েছেন। এককথায় Power to the people । মানুষের হাতে ক্ষমতা। বলিভিয়াতেও করছে। তারা যেভাবে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সেটা বিরাট ব্যাপার। এর পেছনে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা ব্যাপক। সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে বলিভিয়া প্রচুর কাজ করছে। এই যে সরকার তেলের খনি বাজেয়াপ্ত করছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রত্যক্ষ সাহায্য না থাকলে এগুলো করতে পারত না। ব্রাজিলে এই যে বিশ্বকাপটা হল, পরে অলিম্পিক হবে। অনেক আন্দোলন হয়েছে যাতে বিশ্বকাপটা না হয়। ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বাইরে অনেক জায়গায় ডেমনস্ট্রেশনও হয়েছে। বিশ্বকাপের পরে আমি ওখানে ট্রেড ইউনিয়নের একটা কাজে গিয়েছিলাম, দেখেছি। ওখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে, অনেকটাই বেড়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের চাহিদা মতো বাড়েনি। বাজারে জিনিসের যা দাম সেই মতো বাড়েনি, কিন্তু বেড়েছে। সামনেই একটা ভোট আসছে। ব্রাজিলে কম্যুনিস্টদের আসন কিছু বাড়বে। ওখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন বলছে দিলমা রুসেফ আবার ক্ষমতায় আসবে কারণ সে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে। ব্রাজিলে একটা নিয়ম আছে, যেকোনো ক্ষেত্রে অন্তত ৩ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাকরিতে নিতে হবে। কোথাও কোথাও দেখা গেছে সংখ্যাটা ৫ শতাংশ। কারখানাগুলোর ওয়ার্কশপে দেখলাম একটা দেওয়ালে যারা কাজ করে তাদের পরিবারের কারো কারো ছবি আটকানো, কখনো বাবা-মা, কখনো সন্তান, কারো বা স্ত্রী। আর কিছু বলা নেই। কিন্তু অনেক কিছু বলা আছে। সেফটি কনসাসনেস। তোমার বাড়িতে এরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। দারুণ ব্যাপার। প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের subsidised খাবার দেওয়া হয়। subsidised প্যাকেজ্ড ফুড তারা কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। এটা সংগঠিত ক্ষেত্রে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাপারটা একটু আলাদা। ন্যূনতম মজুরি এদের থেকে কম, তবে আমাদের দেশের মত নয়। ঐ দেশগুলোয় একটা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আছে, আমাদের দেশে প্রতি রাজ্যে আলাদা। ন্যূনতম মজুরি থাকলেও আমাদের দেশে তা লাগু হয় না। এখানে একজন সিকিউরিটি গার্ডের ন্যূনতম মজুরি হওয়ার কথা প্রায় দশ হাজার টাকা। কিন্তু ৫-৬ হাজার টাকার বেশি পায় না। যেখানে সংগঠিত করা যাচ্ছে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করছে। আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণীকে দিতে বাধ্য করছে। এই যে একটা rigid ব্যাপার ছিল কিচ্ছু দেব না, তা থেকে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কোথাও বেশি কোথাও কম। আন্দোলন এখন এই গতিতে এই অভিমুখে চলছে যে 'ওদের মুনাফার জন্য আমরা শ্রম দিয়েছি, ওদের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা শ্রম দেব না'। বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনে শ্রমজীবীরা দেখিয়ে দিতে পারছে। আন্দোলন-গুলোর মধ্যে অন্যান্য নানান শক্তি আছে, NGO-রাও আছে। একটা pro-left অবস্থান আছে, বিশ্বায়ন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, গরিব মানুষের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে। এদের নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিছু কিছু NGO এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন আছে যারা কর্পোরেটদের দালালি করছে। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। সোভিয়েতের পতনের পর কি ভাবা গিয়েছিল আজ এত কিছু করা যাবে? কিন্তু সেই সময় থেকে আজ সমাজতন্ত্র তৈরির প্রত্যয় ক্রমাগত বাড়ছে।

ভারতে ভূমি-বিদ্রোহ— বিস্তার এবং সীমাবদ্ধতা

৬৬ পৃষ্ঠার পর

শ্রেণী দর্শন বা মতাদর্শ সম্বন্ধে লেনিনের কথা দিয়েই শেষ করি—

> আন্দোলনের সূত্রে শ্রমজীবী বাহিনীর স্বতন্ত্র কোনো মতাদর্শ গঠন সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হতে পারেনা। একটাই বেছে নিতে হবে— হয় বুর্জোয়া আর না হয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। মাঝামাঝি কোনো পথ নেই (কারণ মানবজাতি 'তৃতীয়' কোনো মতাদর্শ উদ্ভাবন করেনি এবং অপিচ, শ্রেণীদ্বন্দ্বে আকীর্ণ সমাজে শ্রেণীবিহীন অথবা শ্রেণী-উর্ধ্ব কোনো মতাদর্শ থাকতে পারেনা।)[১১]

পুঁজিবাদ এই রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের ভয়েই সর্বদা শঙ্কিত।

সূত্র-সাহায্য

১। পুঁজির উদ্ভব (*পুঁজি*, খণ্ড ১), কার্ল মার্কস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

২। ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল, কার্ল মার্কস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

৩। The Law of War and Peace (Original book- De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres-Hugo Grotius translated by Francis W. Kelsey)

৪। *Development-Induced Displacement: The Class and Gender Perspective*, Walter Fernandez, November 2007

৫। 'Chronicle of a Struggle: Kashipur-Orissa', Achyut Das & Vidya Das, Sanhati

৬। Frontline, 19 January 2001

৭। *Police firing at Kalinganagar*, PUCL Report

৮। PUCL Report, পূর্বোক্ত

৯। Undemocratic and Arbitrary: Control, Regulation and Expropriation of India's Forest and Common Lands , Shankar Gopalakrishnan

১০। What is to be done? V I Lenin

১১। লেনিন, পূর্বোক্ত

গল্প

পিতৃতন্ত্র

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুল করে, টাইমপাস বা অন্য কোনো আলফাল কারণে বুদ্ধিজীবীরা কিস্‌সুটি করেন না। বুদ্ধিই তাঁদের জীবিকার অস্ত্র, হাতিয়ার হওয়ায়, সব কাজেই বিবেচনা, যাচাইয়ের একটা ভিত্তি থাকবেই। যদি কেউ ফটাফট যুক্তি আর তথ্য পেশ করে নিজের একটা মতকে দাঁড় করাতে বা অন্যের মতকে শুইয়ে দিতে পারে, বুঝতে হবে এ মাল বুদ্ধিজীবী না হয়ে যায় না। খুন, ধর্ষণ আর তোলাবাজির কথাই ধরা যাক, বুর্জোয়া কাগজ আর চ্যানেল মারফত চব্বিশ ঘণ্টা এই-ই তো সাপ্লাই হচ্ছে, বাঙালির এই এখন ত্রিফলা আলো, দেখা যাবে গোলা মাথা, দলের হাঁড়িকাঠে যে-মাথা ঢোকানো সম্ভব হয়নি, শুধু সেইসব লোক এই ত্রিফলায় অন্ধকার, অন্যায় দেখতে পাবে। তাদের একবারও মনে হবে না জবলেস গ্রোথ, প্যারালাল ইকনমি, এই দুই জাদুকাঠিই এসবের হোতা। মনে হবে না বলেই যে শুধু তারা বুদ্ধিজীবী নয় তা বলা যাবে না। সুখ, অর্থ আর ক্ষমতার অন্ধিসন্ধি বুঝতে হবে। সেই বোঝাটা নিজের জীবনে যে সুদে-আসলে খাটাতে জানে, সেই তো বুদ্ধিজীবী। ব্যাকগ্রাউন্ড, ফোরগ্রাউন্ড, সব বিচার করে দেখতে হবে— সবটা চুপ করে শুনে গেলেন পাল স্যার। পাল স্যার নিজে একজন বিশাল বুদ্ধিজীবী হয়েও তাঁর ফ্ল্যাটে এসে এক কেরানি তুবড়ি ফোটাচ্ছে কমিটির জোরে, অথচ তিনি ঠোঁটে আঙুলটা প্লেস করলেন একটা দাড়ি চিহ্নের মতো, খাড়া, লম্বা। যেন পাঁচিল। পাড়া সৌন্দর্যায়ন কমিটির সম্পাদক বলে চলেছেন— দেখুন স্যার যে নিজের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থাই করে উঠতে পারে না, সে দেশের ভালো কী করে করবে? এইসব নানারকম তর্ক শোনার টানে সুব্রত চলে আসত। চ্যানেলের তর্ক এর কাছে কিস্‌সু না। এই ঘটনা টাটকা নয়, অনেক আগের এবং অনেকবারই গভীর চিন্তার সহজ বিচরণ প্রত্যক্ষ করেছে স্যারের দৌলতে। তিনি সব জানেন। সুব্রতকে স্নেহ করেন। সুতরাং যেতে হবে তাঁর কাছেই। বিপদে পড়লে, জট ছাড়াতে না পারলে— তিনিই ভরসা।

টুয়েলভ অবধি পড়ে, পাস দিয়ে থমকে গিয়েছিল সাত নম্বর বস্তির পেটো নস্কর। বোর্ডের কাগজে অবশ্য ওর নাম সুব্রত নস্কর। পাড়ায় পেটো। ব্যাখ্যায় যাওয়ার দরকার নেই, বস্তি এবং পেটো এই দুটো শব্দই কাফি। পয়সা নেই, গরিবগুর্বো তাই থমকাবে। অ্যাদ্দুর যে এসেছে তাই যথেষ্ট। ছেলে মোটেই বোকা নয়, বখাটেও নয়। এক ওড়িয়া ওস্তাদ ভক্তিভূষণ দাসের চেলাগিরি করে কলের মিস্তিরি হয়েছে। রোজগার মন্দ নয়। চেষ্টায় ছিল কোনো প্রোমোটারের সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করতে। কিন্তু ট্যাংরা, জয়হিন্দ বাজার, ক্রিস্টোফার রোড, হিউজেস্‌ রোডে, যেখানে যতটুকু জমি ফাঁকা ছিল, সবটার কবর দেওয়া হয়ে গেছে। এটা সুব্রতর ভাষা, তার চিত্রকল্প; ওইসব জমিতে যে বিল্ডিং উঠেছে সুব্রতর নজরে সে সবই মৃত জমির উপর তোলা মঠ বা কংক্রিটে গড়ে তোলা খাড়া কফিন। খুবই কষ্টকল্পিত এক চিত্রকল্প। সে এখন কী করা যাবে, ও তো আর কবি নয়, যদিও যখন জেনেছিল ওর থেকে কম পাশ দিয়ে একালেও একজন এক নম্বর কবি হয়েছে, তাকে তারিফ করেছে প্রাণখুলে : যুগ যুগ জিও। বলেছিল, খাও পিও যুগ যুগ জিও।

২

সুব্রত মহা সমস্যায় পড়েছে এখন। সে তার বিদ্যেবুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারছে না, যে পদ্য লেখে, যে নৌটঙ্কী করে, যে পটুয়া— এরা হঠাৎ বুদ্ধিজীবী হল কবে থেকে? বুদ্ধিজীবী কে? কেন? ইত্যাদি হাজার কিসিমের প্রশ্ন নয়— তার হাতে এখন আগুন, বিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত। সুব্রত এখন বসে আছে পাড়ার নমস্য মানুষ, অধ্যাপক প্রবোধ পালের সামনে। দু'জনের মাঝখানে সেগুন কাঠের একটা সেন্ট্রাল টেবিল, টেবিলে ইংরেজি-বাংলা গোটা কতক বই আর দুটো চায়ের কাপ। এবং ধোঁয়া।

এই দেখাসাক্ষাৎ আগে থেকে ঠিক করা। স্যারের কাছে এসে বিনে পয়সায় কেমিস্ট্রি বুঝে গেছে, প্রবোধ স্যার তাকে ভালোই-বাসেন। তাই বলে হুট করে চলে আসা যায় না, বিশেষ করে সে যখন একটা জটিল ব্যাপার, মগজ সংক্রান্ত একটা প্রশ্নে জেরবার— প্রশ্ন তো ওর অনেক, তাই বলেকয়ে রোববারের এই বিকেলটা ঠিক হয়েছে। স্যারের ফ্যামিলির সব্বাই, দুই মেয়ে আর বউ শপিং করতে বেরিয়েছে। তারা চিনে পাড়ায় খেয়ে ফিরবে। কাজের মেয়ে রঙ্গিতা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। মাসের শেষ রোববারটায় প্রবোধ স্যার কোনো কমিটির মিটিং রাখেন না। দু-সপ্তাহ আগে এসে সুব্রত বলেছিল, 'স্যার, একদিন একটু টাইম দেবেন?'

ব্যাপারটা কী বলবি তো?

বুদ্ধিজীবী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

অ্যাঁ, বুদ্ধি নিবি বললেও বুঝতুম।

না, মানে এনারা কী, কেন, একটু বুঝতে চাই।

আচ্ছা, আচ্ছা।

এমন নয় যে তখনই অধ্যাপক পাল সমস্যাটা ধরে ফেলেছেন। সুব্রত খুব বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল, মনে আছে একদিন বলেছিল, 'স্যার এই সাবজেক্টটায় বুদ্ধির চেয়ে গাধার খাটনি বেশি'। পাল খচে গিয়েও চেপে যায়। কৌতূহল তাঁরও কম নয়, ভাবলেন, 'দেখি কী বলে?' এইভাবে শুরু। আগাম সতর্কতা জারি থাকুক : আলোচনা প্রশ্নোত্তরের রীতিতেই যে চলবে এমন নাও হতে পারে, বরং গড়াতে পারে এমন একটা বহেসের দিকে যা রীতি-রেওয়াজের অ্যায়সি কি ত্যায়সি করে দিতে পারে। খুলে যেতে পারে যুদ্ধের অনেকগুলো ফ্রন্ট। প্রবীণ অধ্যাপক জেরায় জেরায় জেরবার হতে পারেন। হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

মোদ্দা কথা যা খুশি, যা ইচ্ছে তাই, যাচ্ছেতাই ঘটতে পারে। প্রফেসর পালকে চিনতে-বুঝতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কিন্তু পেটো তথা সুব্রত সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে রাখা ভালো।

সুব্রতর আঙুল পনেরোশো স্কো.ফু. একটি বদ্ধ আয়তক্ষেত্রের দেয়ালের সাদা বোতাম ছুঁই-ছুঁই, ঘণ্টি বাজল বলে। ঘণ্টা বাজা, দরজা খোলা, হাসি, আপ্যায়ন, সুব্রতর বিনয়ী প্রবেশ ইত্যাদি পেরিয়ে সেন্ট্রাল টেবিলের দু-পাশে দু-জন মুখোমুখি হতে-হতে সামান্য গুটিকয় তথ্য বলা হয়ে যাবে।

৩

সাত নম্বর বস্তির এই ছেলেটার জীবন ছুঁয়ে দিয়েছিল উন্নতির খোয়াইশ, যা সে অবশ্য চিহ্নিত করবে স্বপ্ন শব্দেই। খোয়াইশ হল মিশ্র ভাষাভাষী এই বস্তির বেশিরভাগ গরিবের পছন্দের শব্দ। যা থেকে সহজেই বোঝা সম্ভব হিন্দি-উর্দু-বাংলা মেশানো একটা ভাষাই এই বস্তির মাতৃভাষা। ইংরেজি শব্দও দু'চারটে যে নেই তা নয়। ভবিষ্যতে হয়তো ভাষা দিয়ে জায়গা চেনাটাই উঠে যাবে, যখন আরও ইংরেজি শব্দ মিশবে।

কলেজে নাম না লেখানোয় খোয়াইশ যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, উড়ে গেছে অন্য কোথাও এমনও নয়। কলের কাজ, জলের কাজে যখন সুব্রত হাত পাকাচ্ছে তখন একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে স্যার বলেছিলেন, 'কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়র হচ্ছিস তাহলে?' সুব্রতর ভালো লাগেনি কথাটা, সে এর মানে করেছিল— কলের মিস্তিরির বেশি আর কী হবি? এই যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে সুব্রতর বাবা যেদিন মারা যায় সেইদিনই ও জন্মেছে, ওর ডাক নাম পেটো হওয়ার রহস্যও ওখানেই। ভোটাভুটির সঙ্গে, সরকার ওলটানো, সরকার বানানোর সঙ্গে সাত নম্বর বস্তির লোকদের বাঁচা-মরা জড়িয়ে পেঁচিয়ে একসা। সে এমন মারাত্মক জট যে কারো বাপের সাধ্যি নয় ছাড়ানো। ভোটের টাইমে যে যত ভদ্দরলোক লোক, পেটোবাজি বাদ দিতে পারবে না— লাল, সাদা, সবুজ সব পার্টির পেটো চাই। সুব্রতর বাবা আগেও কারিগরই ছিল, বাচ্চাদের জন্য দোলনা বানাত, কেন সেই কাজ ছাড়তে হল তার সবটা জানা যায় না, তবে পেটো মানে লাল-সাদার কারবারে রোজগার অনেক বেশি। আগে যেমন সে ঠিকা মজুর ছিল পেটোর কারবারেও তাই। পার্টির কাছ থেকে বরাত নিয়ে কেউ এসে হয় মশলা দিয়ে যাবে, না হলে দাম ধরে দিয়ে বলবে, ক'টা দড়ির মাল, ক'টা কৌটো মাল বা সকেট লাগবে। মাল পিছু রেট ভোট আর হুজ্জোতের সময়ে বেশি, শান্তির মানে মন্দার সময়ে কম। ভোম্বল, সুব্রতর বাবা নিজের পরিচয় মজা করে দিত, আমি পেটো-মজুর হয়ে বিন্দাস আছি। এই তল্লাটে কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল আছে কিন্তু মজুরের এই নতুন পরিচয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। যেজন্য এত কথা, এখন তার দোড়গোড়ায়— দড়ির মাল বাঁধতে-বাঁধতে ভোম্বল বিড়ি জ্বালিয়েছিল। বাপ মরল যেদিন ও যেভাবে, সেইদিন জন্মানোয় ডাকনাম যে পেটো হবে তা একরকম অবধারিত। এর মধ্যে খোদাই হয়ে গেল পিতৃনাম। পঞ্চাশ বছর আগে হলে অবশ্য অন্যরকম নামও হতে পারত, যেমন বোম বা ব্যোমকেশ। কেননা,তখন সাত নম্বর বস্তিতে এক গাদা রিফিউজি ছিল, যাদের অনেকেই হেভি স্ট্রাগল করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়েছে, ভদ্র পাড়ায় পাকা বাড়িতে উঠে গেছে। তারা তৎসম শব্দ এমনকি দু-চারটে সংস্কৃত শব্দও উচ্চারণ করত যখন তখন।

সুব্রতর মা পাঁচবাড়ি কাজ করে সংসার সামলেছে, ছেলেটাকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করিয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা বেশি থাকলে এতটা পারত না। নেহাত একটা ছেলে তাই। বাপের সম্পর্কে ছেলেকে সে একটুও দুর্বল হতে দেয়নি, বলেছে 'মৃত্যুর মজুরগিরি, কেউ করে? বল। তুই-ই বল।' ভোম্বল কেন, কী জন্য এই রাস্তা বেছে নেয় তার সবটা লক্ষ্মী জানত না, সে শুধু গাল দিয়েছে, শোক করেছে, দগ্ধেছে, 'মানুষ মারার কল, লোক মরবে আর ওর খাওয়া-পরা-সংসার চলবে। হায় লাগবে হায়।' ভোম্বল মরে যাওয়ার পরও এই বিলাপ থামেনি শুধু অতীত যোগ করত— 'মরা মানুষের অভিশাপ যাবে কোথায়? সংসার তো নয়, উনুন নয়, চিতায় ভাত ফুটিয়ে খেয়েছি, কক্ষনো বাপের নাম মুখে আনবি না, কক্ষনো না।'

সুব্রত মায়ের সঙ্গে বাবাকে নিয়ে আলোচনা, তর্ক কিছুই করেনি, কিন্তু সে মনে মনে ভেবেছে, তার বাবার নিশ্চয়ই আরো অনেক পরিচয় আছে। যে দোলনার কারিগর ছিল সে কী করে বোমা-মজুর হয়? সুব্রত কিছুটা তত্ত্বতলাশ করেছে বড়ো হয়ে, তাতে রহস্য বেড়েছে বই কমেনি। সে জানতে পারে তার বাবা মায়ের গায়ে কোনোদিন হাত তোলেনি, খুব চুপচাপ থাকত, পাড়ার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিত যে দেখে লক্ষ্মীরই তাক লেগে যেত। এইরকম অনেক তথ্য থেকে সুব্রত ওই চুপচাপ থাকার অভ্যাসটাতেই আটকে যায় এবং ভাবতে থাকে, ভেবে চলেছে—যা কিছু গোলমাল সব লুকিয়ে আছে এই নীরবতায়। সে তার মাকে জাপটে ধরে বলে 'কিন্তু আমিও তো কারিগর, কারিগরের বংশেই জন্মেছি?' লক্ষ্মীর তখন গর্ব, তখন হাসি 'তুই জলদান করিস, জলের কারিগর, ছোটোবেলায় পড়িসনি— জলই জীবন।'

রূপকথা এক কোণে সরে যায়। গুটিয়ে যায়, হার মানে। এমনই গল্প সুব্রতর। মৃত্যু, অঙ্গহানি, রক্তপাতের ভবিষ্যৎ যে লাল-সাদা গুঁড়োয় গড়ে তুলত ভোম্বল, যার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকত বিস্ফোরণ, সেই মিশ্রণই পুড়িয়ে খাক করে তাকে। যদি সেইদিন বা তারই আশপাশে সুব্রত না জন্মাত তাহলে ভোম্বলের লাশ নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে হাজার কিসিমের ঝামেলায় লক্ষ্মীর প্রাণ বেরিয়ে যেত। বিস্ফোরণ ও তার কালোছায়া থেকে লক্ষ্মীকে রক্ষা করল একটি জন্ম, নাড়ি ছিঁড়ে রক্ত মেখে সুব্রত আলোয় আসা।

গলির প্যাঁচে, ধোঁয়া-ফাঁসে আটক বস্তিতে গুচ্ছের নৌটঙ্কি, সেক্স ভায়োলেন্স তো আছেই, নগদের খেলা বা ক্যাশ-কিস্সারও কমতি নেই। সুব্রত এই ক্যাওড়া-কিচানের মধ্যেই বড়ো হয়েছে, অথচ মউজমস্তি, হিরোগিরি থেকে শুধু যে দূরেই থেকেছে তাই নয়, তার মুখে শোকের দুশ্চিন্তার, উদ্বেগের নীল একটা আভা,

যা উঠে এসেছে হাড়, মজ্জা নিংড়ে। এসবের মনস্তাত্ত্বিক দিক আদৌ উন্মোচিত নয়, আবার চামড়ার তলা থেকে উঠে আসা ওই আভা যে সব্বাই দেখতে পায় এমনও নয়। এরকম হতে পারে, স্বচ্ছ বুদ্ধির এই ছেলেটার পক্ষে লেখাপড়ায় অনেকদূর যাওয়া সম্ভব ছিল; হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই তার চিন্তাশক্তিও প্রখর হওয়ায় অনেক বুজরুকি, মিথ্যের চাষ, লোভ-হিংসা ইত্যাদিকে উদার বা মহৎ কোনো মোড়কে হাজির করলে সে চটপট ধরে ফেলতে পারে, অথচ হাত কামড়ানো ছাড়া তার কিছুই করার নেই— সুব্রত এই পরিস্থিতিটাকে জুড়ে নিয়েছিল তার বাবার নীরবতার সঙ্গে। যেন বংশ পরম্পরায় তারা হয়ে চলেছে এই ভূত-ভাষা। বাবার নাম ভোম্বল, তার নাম পেটো, পটলা— এইসব নামও কিছু বলতে চায়। কর্পোরেশন স্কুলের অংকের স্যার বলেছিল, 'ছেলেটার ভবিষ্যৎ আছে না একটা, ও পটলা চলবে না, আজ থেকে ওর নাম সুব্রত।' যদি এটুকুতেই ধ্বনিমাহাত্ম্যে, নাদ-ব্রহ্ম, যেমন বলা হয়, মন্তরের গুণ এবং তাতেই পটলা সুব্রত হয়ে উঠতে পারত!

যখন শিক্ষিত, ভদ্র সমাজের ছেলেমেয়েরা এই সত্য বুঝে, যে কেতাব জঞ্জাল ছাড়া কিছু নয়, বইমুখো হওয়া ছেড়ে দিল— জেরক্স মেশিন, সিলেবাসটুকু আর ইন্টারনেটে ঘেঁটে, নোট সামলে হই হই করে ছাত্রজীবন ফৌত করে, বাপের অন্ন বা কর্পোরেটের পরমান্নে টাইমপাস করার মহাজীবনে গ্যাঁট হয়ে বসল— তখন বস্তির এই ছেলেটা, যার মনে অনেক প্রশ্ন, সে তার রোজগারের টাকায় বই কিনে চলল। অনেকে আক্ষেপ করে বলেন, বাংলা ভাষায় ভালো, উঁচুমানের বই নেই। কথাটা আলস্যে বলা, অবহেলায় বলা। ঠেলায় পড়লে মাতৃভাষাই সম্বল। সুব্রত ইংরেজি ভাষাটা ভালো আয়ত্ব করতে পারেনি, সে বাধ্য হয় বই খুঁজতে এবং আশ্চর্য হয়ে যায় দেখে যে বাংলা ভাষায় এত সব জরুরি বই আছে যা পড়তে একজনের সারা জীবন কেটে যেতে পারে।

বাংলা বই প্রসঙ্গ দুটো কারণে আনা হল, ১) নিজের সাধ্যে যতটা সম্ভব সে চেষ্টা করে শোনা কথা, চালু কথা যাচাই করতে, যেমন বাংলা বই নিয়ে এই চালু কথাটা, ২) নিজের মনের মধ্যে গোপনে পাতা মেলা প্রশ্নগুলো, তাদের অঙ্কুরের জন্য সে গভীর আগ্রহ ও তৃষ্ণায় অপেক্ষা করত এবং হাত বাড়াত বইয়ের তাকে।

বিষণ্ণতা তার রক্ষাকবচ। নীরবতা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সে নিজেই তা কবুল করেছে। না হলে এরকম তৈরি ছেলেকে টানতে মিছিল নিয়ে পার্টি চলে আসত। পাড়ায়, সমবয়সীদের মধ্যে সে তো মুখই খোলে না। স্যার ওকে একটা কথা বলেছিলেন, 'অপেক্ষায় থাকা, সরে থাকা, গা ঢাকা দেওয়াটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ।' আর সুব্রতর উন্নতির খোয়াইশের যতটুকু আন্দাজ পাওয়া গেল তাতে তার গল্পের কোনো শ্রোতা পাওয়াই এখন অসম্ভব। একা হও— বললেই মাথায় রড মারবে। একা আর বোকা সমান— ছুটে আসবে এই আপ্তবাক্য। স্যারের উপদেশটা ওর দরকার ছিল না। কিন্তু তিনি তো স্যার, শেষ কথাটা, সেরা কথাটা তিনি জানেন। গত বাহান্ন বছর ধরে জ্ঞান দিচ্ছেন এবং কেউ কখনো, এমনকি এই জমানাতেও উজিয়ে গিয়ে বলে আসেনি :

—জ্ঞান দেবেন না

—যত সব ফোতো কথা

সুব্রতকে অনেক কিছু সামলে-সুমলে বাঁচতে হয়। তার এই বাঁচাটা যেমন মিথ্যে নয় তেমনই তার মরা বাপ, লড়াকু মা, বস্তির পাঁচটা মানুষ, তাদের চিন্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অসহায়তা, দুঃখ- কষ্ট, ফূর্তি, মজা, ভয়, আতঙ্ক, স্বপ্ন, সংস্কার সেসবও তো সত্যি। সে একটু মাথা ঝাড়া দিতেই লক্ষ্মী ছুটেছিল পুরুতের কাছে, 'ঠাকুরমশাই আমি গরিব মানুষ যতটুকু সাধ্যি দেব, আপনি এই বাপমরা ছেলেটার কপালে কী আছে বলেন।' বামুন ঠাকুরের গণনায় জানা গেল:

> জাতকের জন্মলগ্নে ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল, দশমে শনি, রবি শুভ গ্রহদৃষ্ট নয় এবং তিনটি পাপগ্রহ গোচরীভূত অর্থাৎ পিতৃরিষ্টি যোগ। তোর এই ছেলে জন্মেই বাপকে খাবে এবং পিতার ছায়া এর সারা জীবনের সঙ্গী হবে।

বাবার ছায়াসঙ্গী সে, না তার বাবার ছায়া তার সঙ্গী? সে কি ছায়া? নাকি পিতৃলোক থেকে নেমে এসেছে এক অতি দীর্ঘকায় ছায়া, যা তাকে ঢেকে ফেলছে । বড়ো হতে-হতে এই প্রশ্ন, ধাঁধা একটু-একটু করে খসে পড়েছে আর বিজ্ঞান এবং যুক্তি দু-দিক থেকে এসে তার হাত ধরেছে। সুব্রত বুঝতে পেরেছে সে গোলাম নয়, তার জীবনে বাবা-মার জৈব ভূমিকা কখনোই তাকে তাদেরই একটা কপি বানাতে পারে না, সে স্বাধীন, নিজের জীবন রচনা করার স্বাধীনতা নিয়েই সে জন্মেছে। যার মানে এরকমও দাঁড়িয়ে যায় যে, সে নিজেই নিজের বাপ। কেননা সে-ই তো তার নতুন জন্ম দেবে। এভাবে ভাবায় তার মনে এরকম একটা প্রশ্নও উঁকি মেরেছিল ঝড় বাদলের এক সন্ধ্যায়, যখন ঘরের টিনের চাল প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— বাবার চুপচাপ থাকা, ওই সলিড নীরবতার মধ্যেও কি এরকম একটা প্রশ্ন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল? কেন আমি মৃত্যুর কারিগরই থেকে যাব? এই অন্ধচক্র থেকে মুক্তি পেতেও কি বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে? এসবই সুব্রতর অনুমান, কল্পনা। নীরবতা, স্তব্ধতা এমনই মাল যে তার গায়ে যে কোনো ছেঁদো কথা লটকে দিলেই হল। সুব্রতর মাথাটা নানা দিকেই খাটে কিন্তু উদ্ভটের জন্য কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখায় এবং সাধ্যে কুলোক আর নাই কুলোক গোটা সিচুয়েশন (এই তালগোল) বোঝার চেষ্টাটা তাকে এমনই মাতিয়ে রাখে যা সাত নম্বর বস্তির কাছে খোলসা হলে, জলপড়া, ধুলোপড়ার নিদান অনিবার্য ছিল।

লক্ষ্মীর ঘরে পূর্বপুরুষ দূরের কথা, ভোম্বলেরও ছবি নেই। কিন্তু কালী, মহাদেব, দুর্গা, কৃষ্ণ ক্যালেন্ডারের তেলতেলে ছাপা ফ্রেমবন্দী হয়ে ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে। সুব্রত তার মাকে এদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে। কথাও খুব ভূতুড়ে, লোকে যেমন ঠাকুরের কাছে এটা-সেটা চায় তেমন নয়। একটা কথা তো সুব্রতর মনে গেঁথে আছে, 'তোমার পদে যেন মতি থাকে' বা 'তুমি তো সবই দেখছ ঠাকুর'। পরে সে বুঝেছে এর মানে সে

ঠাকুরের পায়ে নিজের মাথাটা কেটে নিবেদন করছে বা করার কথা ভাবছে তা নয়। লক্ষ্মী এত ঝামেলায় বিপদেও অবিচলিত থাকতে চাইছে। দমকা বাতাস, হঠাৎ বৃষ্টির দাপট থেকে আলোর শিখা বাঁচিয়ে রাখাই তার জীবনের ব্রত। ওই শিখা যে সে নিজে একথা যেদিন বুঝতে পারে সুব্রত কেঁদে ফেলেছিল।

৪

ওদের এই মা-ব্যাটার পরিবারে জ্যান্ত মানুষের ছবি প্রথম উঠল ভোটার কার্ডে। একটুখানি ছবি, গলা কাটা, কাটা মাছের মুড়োর মতো। আর একটা কার্ডের জন্য রেশন দোকানের সামনে নোটিশ ঝোলানো হয়। তাতে লেখা ছিল ফলানা ফলানা তারিখে ফলানা ফলানা পাড়ার 'আঁধার কার্ডের' ছবি তোলা হবে। সেই ছবি ওরা তোলায়নি, আঁধারের মাথায় ওই ঈদের চাঁদই এর কারণ। ভোটার কার্ড যাকে বলা হচ্ছে তা ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিচয় পত্র অথচ সেই পত্রে সুব্রত নিজের পরিচয় বলতে যা দেখতে পাচ্ছে তা হল :

নাম :
বাপের নাম :
লিঙ্গ :
বয়স :
ঠিকানা :

ব্যাস, খতম। এই তার পরিচয় যা নাম দিয়ে শুরু হলেও লেখা আছে 'নির্বাচকের নাম'। বামুন ঠাকুর যেমন তার কোষ্ঠী বানিয়েছিল এও কি সেইরকম অতি সংক্ষিপ্ত একটা কোষ্ঠী বা অশোক স্তম্ভ বা ভারত সরকার তার জন্য বানিয়ে দিয়েছে? একটা তফাত থাকলেও থাকতে পারে, যদিও জন্মক্ষণ, স্থান সব এক হলে গ্রহরাও একই মেজাজে এবং সম্পর্কে থাকার কথা—তখন এই কোষ্ঠী একা তারই নাও হতে পারে। অশোক স্তম্ভ সেই গলতি করেনি। তবে এ তার একটা অধিকারপত্র মাত্র। এরকম সব তাজ্জব করা প্রশ্নের হাত থেকে সুব্রতর রেহাই নেই। তার জীবনের পটভূমিতেই রয়ে গেছে এর কারণ। সুব্রতর জন্মের কয়েকঘণ্টা আগের সেই বিস্ফোরণ। একটু পরে দেখা যাবে বিচিত্র এই প্রশ্ন আসলে একটা সূত্র যা তাকে ঠেলে দেবে অন্য এক আজব ভাবনার দিকে। গলায় সোনার মোটা চেন সমেত বাইক বাহনে তার সামনে এসে একটু টাল্লা খেয়ে ঘ্যাঁচ শব্দে ব্রেক এবং সেই মধুর স্বর।

'তুই তো বোমফাটা ছেলে?'

'———'

'তোকে ল্যাংড়া জাপান কিছু বলেনি?'

'———'

এ হল প্রথম দফা। তারপর দফায়-দফায়।

'লালপার্টির হয়ে তোর বাপ বোমা বাঁধত।'

'———'

'বদলা নিয়েছি? মেরেছি? তোর ঘরে আগুন দিয়েছি?'

'———'

'তোর তো রোজগার ভালোই কোনোদিন চাঁদা নিয়েছি?'

'———'

'বাপে ঋণ তো শুধতে হবে মনা।'

'———'

'তুই শালা বহুত জ্ঞানী, তোকে মারদাঙ্গা করতে হবে না।'

'———'

'তুই জ্ঞান মারাবি।'

'———'

'পাড়ায় তুই ছাড়া কেউ নেই যে সাজিয়ে গুছিয়ে জ্ঞানের মশলা মাখিয়ে বলতে পারে— তুই জ্ঞানের পটকা ফাটাবি। তোকে নেতা বানাব। দেখছিস তো ঝাণ্ডা বওয়ার গাদা গাদা লোক। কিন্তু সরকারি পার্টি জ্ঞানী না হলে চলে না।'

'———'

'কাল পার্টি অফিসে আয়। না হলে এমন কেলাব, চিনিস তো আমায়?'

'———'

তার বাবা নাকি ওই ভোটার কার্ড? নাকি গরিব তাই? বস্তিতে বাস, তাই জোটে আর ভোটে থাকতেই হবে। মরা বাপের মুখ সে ছবিতেও দেখেনি। শুনেছে তার চুপচাপ থাকার কথা। সেই চুপকথার রহস্যভেদ হয়নি। এখন তার পালা। সে তো ইগনুতে নাম লিখিয়েছে, আজাদ দেশে তো সব্বার অধিকার আছে নিজের স্বপ্নের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাওয়ার।

গরিবের ভালো সে খুব বেশি করেই চায় এবং বিশ্বাস করে লেখাপড়াই একমাত্র হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার খুঁটিয়ে দেখেছে, চালানো শিখেছে, আর তো কিছু সে জানে না। যা সে বিশ্বাস করে না তার পক্ষে সওয়াল করার কথা ভাবতেই পারে না।

আবার সেই সোনার চেন, সেই বাইক এবং ঘ্যাঁচ—

'লাস্ট চান্স।'

'———'

'তোকে পার্টির বাইরে রাখা যাবে না।'

'———'

'বোমার থেকে ডেঞ্জারাস।'

'———'

'তুই খুদ একটা ডিনামাইট কিন্তু ফাটাব আমরা।'

এই যখন অবস্থা, যখন নিজের মাথার উপর তার নিজের দখল যেতে বসেছে, তখন একান্ত নিরুপায় সুব্রতর পাল স্যারের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পাল স্যার একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী। তিনি নিশ্চয়ই একটা রাস্তা বাতলে দিতে পারবেন। আলোচনা করে একটা দিশা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

বোতাম টিপতেই বেজে উঠল সেতারের ধ্বনি, রুচিশীল মানুষের ১৫০০ স্কো. ফু.— এমনই হওয়ার কথা। দরজা খুলে গেল। খুলে দিল রঙ্গিতা, স্যারের পরিচারিকা। ফ্ল্যাটটি হাঁ খুলল, যেন বিশাল দুটো ঠোঁট, অস্ত্রের মতো দু-সারি দাঁত সমেত ফাঁক হল। স্যারের মুখোমুখি সোনার চেন। দুজনেই হাসছে, হাসতে-হাসতেই স্যার বললেন—'আয়'।

গল্প

বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি

মীনাক্ষী সেন

আমার বাবার একটা জমি ছিল।

ঠাকুর্দার বাড়িতে যৌথ পরিবারে আমরা বড়ো হয়েছি। তখনকার রীতি অনুসারে বড়ো এবং রোজগেরে ছেলে হিসেবে আমার বাবাই ঠাকুর্দার কেনা জমিতে বাড়িটি বানান। সেটাই ঠাকুর্দার বাড়ি, যেখানে আমরা সবাই ছিলাম। কাকা, পিসি, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, মা, বাবা আর আমরা। বাবার জমিটা ছিল ঠাকুর্দার বাড়ির পাশেই।

একদিন, যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন ক্লাস সেভেনে, ছোটো ভাই ফোরে, মেজদা নাইন আর দাদা ইলেভেন পাশ করেছে, বড়ো কাকার বিয়ে হয়ে গেছে, ছোটো পিসিরও, বাবা বেশ ভারমুক্ত, বাকি দুভাই তো চাকরি করেই, বড়ো পিসিরও বিয়ে হয়ে গেছে কবেই, কাজেই ভারমুক্ত বাবা একদিন, রাত হবে সাতটা-আটটা, মাকে বললো— তোমার রান্নবান্না শেষ হলে একবার এসে বসো তো, কথা আছে। মা ইস্কুলের চাকরি থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে উর্ধ্বশ্বাসেই চৌদ্দ পনের জনের রান্না সেরেছে তখন, বললো— রান্না তো শেষ কিন্তু খেতে তো দিতে হবে।

—আরে তার জন্য সময় পাবে, বসো এখন...

মা বসলো, আমরাও চৌকিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে।

বাবা বললো— আমার জমিতে একটা বাড়ি তুলবো ঠিক করলাম।

—ওমা, সে কী কথা!

মা গালে হাত দিলো।

— এ বাড়ির কী হবে?

—এ বাড়ি থাকবে। আমার বাড়িটা হবে পাকা, দোতলা।

— আর মা-বাবা?

মা বিহুল-বিস্ময়ে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কথা জিজ্ঞেস করলো।

— মা, বাবা আমাদের সঙ্গেই থাকবে। পাকা বাড়ি থাকতে বেড়ার ঘরে কেন থাকবে?

— আর মন্টা, শান্ত, কান্ত?

মা কাকাদের কথা জিজ্ঞেস করলো।

মন্টা তো বউ নিয়ে দূরে থাকে। আসবে যখন থাকবে ও বাড়িতে। শান্ত, কান্ত সবাই তো যার যার কাজের জায়গায়। যখন আসবে এবাড়ি ওবাড়ি, যখন যেমন সুবিধা থাকবে।

বাবা এত সহজে জটিল সমস্যার সমাধান করে দিলে আমরা বাড়ির নকশা ছকতে বসলাম।

—তোর কেমন বাড়ি চাই বুবুন?

বাবা বড়দাকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বড়দা কিছু বললো না। বড়দা কখনো কিছু বলে না। কিছু চায় না। ও হলো ভালো ছেলে। পড়াশুনায় ব্রিলিয়ান্ট। এত ব্রিলিয়ান্ট আমরা ক্লাসে ফার্স্ট হলে ঠাকুর্দা বলে— ওদের স্কুলটা বিলো-স্ট্যান্ডার্ড তাই ফার্স্ট হয়েছে। আমার নাতনি অত ভালো নয় পড়াশুনায়, ভালো আমার বড় নাতি...। দাদা আমাদের পরিবারের নয়নমণি। যাকে বলে 'গিফটেড বয়'। শান্ত শিষ্ট, খেতে বসে ভাত দিলে তরকারি পর্যন্ত চায় না— যেখানে আমরা চেয়েচিন্তে না পেলে হট্টগোল জুড়ে দিই। তাই দাদাকে সবাই দেখেশুনে ভাত তরকারি দেয়। আমরা চেয়ে বকা খাই।

তা এহেন শান্ত শিষ্ট দাদারও ল্যাজ ছিল, যে ল্যাজ ধরে লম্ফ দিয়ে আমরা বিপ্লব-পারাবার পার হবার পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তবে সেসব পরের কথা। সে সময়, দাদা বাড়ির কথা যথারীতি চুপ করে, মা-ই দাদার হয়ে বললো— অনেক হট্টগোলের মধ্যে, অনেক কষ্ট করে ও এইচএস এমন ভালোভাবে পাস করেছে, বুবুন বলেই— এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র, এবার ওর জন্য আলাদা একটা পড়ার ঘর লাগবে নতুন বাড়িতে।

—সে বেশ, আর শুভ তোর কী চাহিদা?

মেজদা শুভঙ্কর বললো— আমি কী বলবো? কেবল খেলার মাঠটা আর পুকুরটা যেন নষ্ট না হয় বাড়ি বানাতে গিয়ে।

—জমি পড়ে আছে বলে মাঠ। বাড়ি তুললে মাঠ কী করে আগের মতো থাকবে? তাহলে বাড়ি কোথায় উঠবে?

বাবা আপত্তি করলো। আসলে মেজদা পড়াশুনাটা তেমন ভালবাসে না। পুকুরে ডুবানো, ডাংগুলি আর হাডুডু, ফুটবল ক্রিকেট আর আড্ডায় তার উৎসাহ। যদিও পড়ায় মাথা আছে কিন্তু পড়ে না। সে তার বিচরণক্ষেত্র অটুট রাখতে চাইছিলো। বাবার জমির পরিমাণ পনের কাঠা। কম তো নয়। সেখানে পুকুর আছে একটা, ছোটো। একদিকের সীমানা পাহারা দেয় এক মস্ত বড়ো কদম গাছ। বর্ষাকালে কদম ফুলের গন্ধে জলকণা ভরা বাতাস আকুল হয়ে ওঠে, ফেরিওয়ালারা গাছের তলায় বসে দুদণ্ড বিশ্রাম নেয়। জমির অন্যপাশে মস্ত মোটাসোটা বেঁটেখাটো এক বেলেতেঁতুলের গাছ। তেঁতুল যে টকের বদলে মিষ্টি হয়, তা ও গাছের তেঁতুল না খেলে কেউ জানবে না। পুকুরপাড়ে আছে এক মস্ত জামগাছ। তাতে উঠে বসে পা ঝুলিয়ে আমি জাম খাই। আম, কুল, পেয়ারা, নারকেল এসব গাছও আছে, তবে সেসব ঠাকুর্দার জমিতে। পুকুর আর মাঠ আমারও প্রিয়। আমি বললাম— বাবা, পুকুরের ওধারের জমিটায় বাড়ি বানিয়ে ফেল, পুকুর আর এধারের মাঠটা যেমন আছে তেমন থাক— কেবল মাঠের বাড়িটা থেকে একটা সাঁকো বানাবে, যে সাঁকো দিয়ে এসে পুকুরের ওপরে তৈরি একটা জলঘরে এসে ওঠা যাবে। সেই জলঘর থেকে আর একটা সাঁকো এপারে এসে এ মাঠের কাছে শেষ হবে। বানাবে তো বাবা পুকুরের ওপরে একটা জলঘর?

—পাগল মেয়ে।

বাবা সস্নেহেই হাসলেন। আমার কথার উত্তর পেলাম না। বাকি ছিলো ছোট ভাই। সে তখন ক্লাস ফোরে পড়ে। গেদা ছোট। তবু বাবা গণতান্ত্রিক। বাবার প্রশ্নের উত্তরে সে বললো— তালে বড়ো ছাদ বানিও। বাড়িটাতে। ছাদে ফুটবল খেলবো, ঘুড়িও ওড়াবো। বোঝা গেল আমাদের মামাদের ভাড়াবাড়ির ছাদটা তার মনশ্চক্ষে ভাসছে। ভাইবোনদের মতামত শোনার পর বাবা মাকে একটা প্ল্যান নিয়ে বোঝাতে বসলো। দেখলাম উৎসাহে, আনন্দে মায়ের চোখমুখ ঝলমল করছে। সকাল-সন্ধ্যা ঘরে-বাইরে পরিশ্রম ক্লান্ত মুখে খুশির রক্তাভা।

—বাড়ি হবে, আমাদের, পাকা বাড়ি, কী মজা।

ভাই হাততালি দিয়ে হাসলো। ওপাশের ঘর থেকে ঠাকুমার ঘুম জড়ানো বিরক্ত গলা শোনা গেল

— ইরা, আজ রাত্তিরে খাইতে দিবানা কাউরে? নাকি?

মা শশব্যস্তে রাতের খাবার পরিবেশন করতে উঠে গেলেন।

আমাদের বাড়িটা কিন্তু হলোনা।

বাড়ির প্ল্যান ইত্যাদি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অনুমোদনের প্রক্রিয়া যখন চলছে, তখন বাবার ডাক এলো ইংল্যান্ড থেকে। পিএইচডি করার জন্য।

বাবা ছাত্র ছিলো ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু তখনকার দিনের রীতি, মা-বাবার বহু সন্তান, বড়ো ছেলেকে বা ওপরের ছেলেদের কেবল নিজের পরিবার নয়, মা-বাবার সন্তানদেরও প্রতিপালন করতে হতো। বাবা তাই এমএসসি পাশ করেই নানান চাকরি করে ঠাকুর্দাকে সাহায্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত সরকারি কলেজের চাকরিতে থিতু। পিএইচডি করতে পারেন নি। কাকারা সবাই যখন চাকরি করছে, পিসিরা বিবাহিত, মা চাকরি করছে, বাবা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে ইংল্যান্ডে চলে গেলেন।

দাদা তখন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে স্কুলের গন্ডি ডিঙিয়ে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ভাই ক্লাস ফাইভ, আমি এইট আর মেজদা টেন। বাবা বিলেতে গেলেন ডক্টরেট করতে।

মা মেজদার জন্যই চিন্তিত। মেজদার পড়ালেখার কী হবে! হায়ার সেকেন্ডারি তখন ক্লাস ইলেভেনে হতো।

—এমনিতেই পড়েনা। তুমি চলে গেলে তো ফেল হবে। আগামীতে হায়ার সেকেন্ডারি।

— বুবুন দেখবে।

বাবা মায়ের ওপর আর্থিক দায়িত্ব আর দাদার ওপর আমাদের গার্জিয়ানের দায়িত্ব দিয়ে বিলেত গেলেন। দাদা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বর্ষ।

বাবা ঠিক আড়াই বছরের মাথায় পিএইচডি করে ফিরে এলেন। কিন্তু তখন আর বাবার হাতের মধ্যে আমরা নেই। বাবার কথা আমাদের কাছে বেদবাক্য ছিলো। বাবার আদেশ আমাদের কাছে অলঙঘনীয়। কিন্তু তখন আমাদের নতুন গার্জিয়ান দাদা তার লুকানো যে লেজটি মা-বাবা-বাড়ির লোক কখনো দেখতে পেত না, সেটি বের করেছে।

ভারতের আকাশে তখন বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেছে। নকশালবাড়ি ঘটে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগ হয়েছে আগেই, এখন তিনভাগ। দাদা তার কলেজ থেকে নিয়ে এসেছে বিপ্লবের স্বপ্ন, ঝড়ো হাওয়ার গন্ধ। উপরন্তু আমাদের ছোটকাকা, যে জ্যোতি বসুর অন্ধ ভক্ত ও পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের জনপ্রিয় কর্মী— সেও নকশালবাড়িকে সাপোর্ট করছে।

বাবা যৌবনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলো। বলত, 'আমি মনেপ্রাণে সোসালিস্ট'।

কমিউনিজম কী, সোসালিজম কাকে বলে, এসব বাবাই শিখিয়েছিলো। সঙ্গে শুনিয়েছিলো ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও স্ট্যালিনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার গল্প।

অন্যদিকে স্বাধীনতা তখনো তো অলীক গল্প হয়ে যায়নি। আমার ঠাকুমার ছোটভাই স্বাধীনতা সংগ্রামী, হিজলী জেলে কারারক্ষীদের গুলিতে মারা গেছিলেন। মায়ের মামারা সব সক্রিয় কমিউনিস্ট। ঠাকুর্দা আর বাড়িভর্তি বই বলতো স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, যতীন দাস আর টেগরা বলের বীরত্বগাথা।

সঙ্গে শিখেছিলাম গান— ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, দেশ আভি তক ভুখা হ্যায়।

তাই দেশের সমস্ত মানুষ খেতে পড়তে পাবে, কেউ আর ভুখা থাকবে না বিপ্লব হলে, এই স্বপ্নে বিশ্বাস করে আমরা সবাই বিপ্লব আর নকশালবাড়ির সমর্থক হয়ে গেলাম, দাদার দেখানো পথে। বাবা চেষ্টা করেছিলেন বালির বাঁধ দিয়ে এই যৌবন জলতরঙ্গ আটকাতে।

আমি তখন ষোল বছরে পা দেবো দেবো করছি, পরীক্ষা দিচ্ছি হায়ার সেকেন্ডারি। বাবা রোজ পরীক্ষা হলে নিয়ে যেত, দু বেলা পরীক্ষা, টিফিন নিয়ে বসে থাকত আর উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখাতো। মেজদা, দাদার তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন নম্বর কম ফার্স্ট ডিভিসন পেয়ে কলেজে পড়ছে, ভাই সেভেনে, দাদা থার্ড ইয়ারে উঠেছে— ছোটকা তার নিজের প্রাণপ্রিয় পার্টির কাছ থেকে নকশাল সাপোর্টার হবার কারণে প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে এলাকা ছেড়ে কর্মস্থলে চলে গেছে। দাদা যা করার রাজনীতি করছে কলেজে, মেজদা এলাকাতেই, আর আমি ভাবছি ভালোভাবে পাশ করে ডাক্তারিতে চান্স পেলে ডাক্তার হয়ে বিপ্লবের সেবা করবো— এমন সময় প্রথম আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হলো।

বাবা কিন্তু তখন বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে লোনের জন্য রাইটার্সে দলিল সহ দরখাস্ত জমা দিয়েছে, তৈরি হতে চলেছে মা-বাবার স্বপ্নের বাড়ি। এমন সময় কাকার হাতে তৈরি যে ক্যাডাররা এক বছর আগেও মায়ের হাতের চা-জলখাবার খেয়েছে, আড্ডা দিয়েছে চুটিয়ে, তাদের অনেককে হাতে ড্যাগার ও পকেটে পিস্তল নিয়ে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে পাঠালো যে নেতা, সে

আমার বাবার বন্ধু, তাঁর স্ত্রী মায়ের সহকর্মী ও বান্ধবী। বাবার সে বন্ধুকে অভাবের সময় টুকটাক কাজকর্ম জোগাড় করে দিতো বাবাই। বলতো, ওর ট্যালেন্ট আছে, পার্টি করে বলে গরিব, ওকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য...

সেই নেতাই পাঠালো তার বাহিনী, যাদের নেতা পঞ্চানন আকণ্ঠ মদ গিলে এসেছিলো— হয়তো এজন্য যে কয়েকমাস আগেও সে ওই বাড়িতে চা খেয়ে ও আড্ডা দিয়ে গেছে।

—আপনার মেজ ছেলেকে বের করুন। সে এই এলাকাকে পলিউট করছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আপনার বড়োটি সম্পর্কেও রিপোর্ট ভালো না।

এসব কিছু ওরা বলেছিলো। বড়দা-মেজদা তখন ভাত খেতে বসেছিলো। বাবা বললো— ওরা বাড়ি নেই।

পঞ্চানন বললো— মিথ্যে কথা।

বাবা বললো— তবে ঘরে ঢুকে সার্চ করো। তবে মাতালদের ঢুকিয়ো না, ঘরে মেয়েরা আছে। আর সার্চ করে যাবার সময় বৌদির হাতে চা খেয়ে যেয়ো... এ বাড়ি তো কদিন আগে তোমারও বাড়ি ছিলো।

পঞ্চানন একথা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেলো মাতাল অবস্থাতেও। তারপর তার বাহিনীকে হুকুম দিলো— ফিরে চলো। পরের দিন একজনও ড্রিংক করে আসবি না, লাস্ট ওয়ার্নিং। এটা তড়িদার বাড়ি। শেষের কথাগুলো বলার সময় পঞ্চাননের জিভ জড়িয়ে যায়।

ওদের নেতা অসন্তুষ্ট হয়েছিলো এই অসফল অভিযানে। এরপর ওদের মিছিল আসে। বাবার জমিতে বাবা একটা সবজি বাগান বানিয়েছিলেন। ওরা তার বেড়া উপড়ে ফেলে, খেত ও সবজি দলে-পিষে-মাড়িয়ে বলে যায়, এ বাড়িতে একটি নকশালও যদি আর বাস করে, তবে বাড়ির সবাইকে এভাবে দলে-পিষে মেরে ফেলা হবে।

ঠাকুর্দা এরপর সাতদিন কথা বলেন নি। বলতে পারেন নি। তিনি এলাকায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। আজীবন কংগ্রেস সমর্থক হলেও ওদের পার্টির তরফে মিউনিসিপাল কমিশনার হয়েছিলেন এক সময়।

ঠাকুর্দা যখন স্তম্ভিত বসে আছেন, এই সময়ে বাবা কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ঠিক করে এলেন।

—ছেলেদের তো বাঁচাতে হবে। এখানে থাকলে ওরা মেজকে তো খুনই করবে, বড়োজনকেও... কে জানে।

আপন যখন পর হয়ে যায়, ঘর ভেঙে যায় দুটুকরো, তখন পরস্পর পরস্পরের এত অজানা যে বাবা আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরপর বাবা কলকাতার বাড়িতে উঠে গেলেন।

আমি হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিলাম, কিন্তু কলকাতায় নয়, বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে সিট পেয়েছিলাম ডাক্তারি পড়ার জন্য। বাবা বললেন— না, বাইরে পড়তে পাঠাবো না। আগে হলে কাঁদতাম, জিদ ধরতাম, অনশন ধর্মঘট করতাম। এখন ভাবলাম, বেশ তো, তবে বিপ্লব করেই বিপ্লবের সেবা করা যাক। ডাক্তার হয়ে যখন করা গেল না।

বাবা কলকাতার বাড়িতে উঠে এলেন দুই দাদা আর মাকে নিয়ে। মা সহকর্মীর সাহায্যে রাইটার্স থেকে বাড়ির লোনের দরখাস্ত তুলে নিয়ে এলেন। বাবার জমিতে আমাদের বাড়ি আর উঠলো না।

দুই

এর পরের ইতিহাস এত বড়ো যে তা বলতে গেলে মহাভারত। সংক্ষেপে এই। পুলিশ, মানে মার্ডার স্কোয়াড, ডিডি, কলকাতার ভাড়াবাড়িতে রেইড করলো একদিন মধ্যরাতে। তারা জানত না, তারা কাকে খুঁজছে। কেবল জানত এটা নকশাল ডেরা। মিথ্যে জানতো না। মা-বাবা সারাদিন চাকরিস্থলে থাকতো। মেজদা প্রথমে চারজনকে এনেছিলো, নিরাপদে শেলটারে থাকা-খাওয়ার জন্য। সেই চারজন আরও চারজনকে আনলো। তারা মিটিং করতে আরও দশজনকে, কলকাতায় তখন 'নকশাল' সন্দেহে কাউকে দেখলেই গুলি করে খুন, সংঘর্ষের মিথ্যা গল্প ফাঁদা অথবা গ্রেপ্তার ও নির্মম অত্যাচার। ফলে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে লোকের পর লোক আসতে আসতে একদিন যে লোকটা মার্ডার স্কোয়াডের ডান হাত হয়ে একশো শেল্টারের সঙ্গে আমাদের বাড়িতেও পুলিশ আনলো, সে জানতো না এ বাড়িটা কাদের।

রেইড করতে এসে তারা ভাবলো 'বিগ ক্যাচ', বিলেত ফেরত পিএইচডি নকশাল, সঙ্গে নিরীহ কাকিমা, রাজনীতি কাকে বলে তাও জানতো না।

বাবার পায়ের সাতখানা হাড় ভেঙে দিলো মার্ডার স্কোয়াডের রণো গুহ ও তার সাকরেদরা। কাকিমার গায়ের সোনার গয়না সব ওদের গর্ভে গেল। ভয়ে কাকিমার মানসিক স্থিতি নষ্ট হয়ে গেল।

ভাগ্যিস বাবার মামাতো ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু তখন চিফ সেক্রেটারি। ঠাকুমার কান্না দেখে বাবার মামা ছেলেকে বললেন— এমন রাজ্যের তুই চিফ সেক্রেটারি? খোকন নকশাল? আজ তোর ছেলে নকশাল হলে তো তোকেও জেলে ঢোকাতো।

বাবা চিফ সেক্রেটারির হস্তক্ষেপে ছাড়া পেলেন। কাকিমাও। চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাও ফেরত পেলেন। কিন্তু এখন বাসস্থান সংকট। ছোটমামাও নকশাল হয়েছিল। ছেড়েও দিয়েছিল তাড়াতাড়ি। দাদু-দিদিমা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেন বাবা ও মা এবং অবশ্যই আমাদের।

আবার ভাড়াবাড়ি।

আমি তখনও আমাদের বাড়ি যেতাম। ঠাকুর্দার বাড়ি। পাশেই পড়েছিলো বাবার পনের কাঠা জমি, সেখানে গজিয়ে উঠেছিলো আগাছার জঙ্গল।

দ্বিতীয় ভাড়াবাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিলো বড়দাকে। তখন বাহাত্তর সাল। বড়দা রাজনীতি প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, আর মেজদা

তার মাথার ভেতর গড়ে তুলেছে এক আশ্চর্য রেডার। বাড়ি আসত, থাকত, খেত। কিন্তু বিপদের গন্ধ পেত আগেই। আর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত।

এবার বিপদের গন্ধ আমি আর দাদাও পেয়েছিলাম। দাদারই পরিচিত এক কমরেড দিনদুপুরে পায়ে চুনহলুদ মেখে, পুলিশ নিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিলো, আমি বুঝেছিলাম। তবু আমরা বাড়ি ছেড়ে গেলাম না। আবার যদি আমাদের না পেয়ে বাবাকে কিছু করে, এই ভয়ে।

পুলিশ দাদাকে ধরে নিয়ে গেলে বাবা পাগল হয়ে গেলেন। নিজের গ্রেপ্তারে বাবা এত বিচলিত হননি হয়ত। এবার ঠাকুর্দা, আবার চিফ সেক্রেটারি। দাদাও ছিলো তাত্ত্বিক বিপ্লবী। তাও রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে। দেড়মাস পর দাদা ছাড়া পেল।

আবার বাড়ি বদল। নতুন ভাড়াবাড়ি।

আমি অবশ্য বাড়ি থেকে নয়, অন্য জায়গা থেকে পুলিশের হাতে পড়লাম। আমি নিজে, পুলিশের খাতায় রেকর্ড থাকবে এমন কোনো মামলায় জড়িত ছিলাম না, নেহাতই নিরামিষভোজী বিপ্লবী বলা যায়। তার ওপর তখন চারু মজুমদার পুলিশ কাস্টডিতে নিহত, আন্দোলন ছত্রভঙ্গ। কিন্তু পুলিশ যত অত্যাচার করতে লাগলো, যত আমার ভয় করতে লাগলো, তত আমি একগুঁয়ে হয়ে উঠলাম।

—তোমরা ভয় দেখিয়ে নত করতে পারো, আমাকে জয় করতে পারবে না।

একথা একদিন মরিয়া হয়ে বলেছিলাম বলে একমাসের পরও পুলিশ কাস্টডি দেড়মাসের হলো।

—তোর বাবাকে বলবি, ছত্রিশটা কোর্ট আছে পশ্চিমবঙ্গে। এবার তোকে ছাড়ানের চেষ্টা করলে ছত্রিশটা কেস দিয়ে দেবো ছত্রিশটা কোর্টে।

রণো গুহ ভয় দেখালো। এবার চিফ সেক্রেটারির কাছে গেলে তারই হয়ত চাকরি চলে যাবে। এবার আর তার কাছে কেউ গেলনা।

অবশ্য বাড়ির লোক জানতও না আমি কোথায়। কারণ বাড়িতে যে মেজদা আসে। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে। দাদাও বাড়িতে।

ছোট ভাই বড়ো হয়ে উঠেছে। পুলিশ মেজদাকে ধরলে মেরেও ফেলতে পারে। আন্দোলন স্তিমিত হলেও পুলিশ তখন আরও উগ্রভাবে হিংস্র। দেশে এমারজেন্সির পদধ্বনি শোনা যাবার আগেই ইমার্জেন্সির স্বৈরাচার দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ।

সরোজ দত্তের মতো নেতাকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। চারু মজুমদারের মতো সর্বোচ্চ নেতাকেও রেয়াত করেনি সিধু রায়ের মানসপুত্র রণো গুহ ও পশ্চিমবঙ্গের স্বৈরশাসন।

আমি তাই বাড়ির ঠিকানাও বলতে পারিনি, চুপ করেছিলাম। আমাকে বাঁচালেন চিফ সেক্রেটারি নয়, মায়ের মামা, সিপিআই নেতা। মাকে তিনি ভালোবাসতেন, আমাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে।

প্রায় দেড়মাস পুলিশ কাস্টডিতে থাকার পর মায়ের সঙ্গে তিনি এলেন। সিপিআই তখন শাসকদের মিত্র। আমাকে দেখে রাগে পাগল হয়ে তিনি পুলিশ কমিশনারকে বললেন— এই অবস্থা করেছেন আপনি ওর? আমি দেখে নেব আপনাদের!

পুলিশ কমিশনার বললেন, আপনার নাতনি জানলে এসব হতো না।

এমন চমৎকার উক্তি ও বিচারের পর আমার ওপর অত্যাচার বন্ধ হলো। আমি জেল কাস্টডিতে গেলাম। কিন্তু ছাড়া পেলাম না।

তবে আমার দীর্ঘ জেলবাস কালে বাবাকে আর বাড়ি বদল করতে হয়নি। আমি সাতাত্তরে মুক্তি পেয়ে ওই ভাড়া বাড়িতেই ফেরত এলাম।

মেজদা তখন বাড়িতেই। রাজনীতি করেনা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার হ্যাঙওভার থেকে বেরোতে পারছে না। নিজের কাছেই নিজে স্বীকার করতে পারছে না যে ও আর রাজনীতি করছে না। বিপ্লবের স্বপ্ন দূরে সরে গেছে। তার ওপরে আছে আত্মগোপন।

দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে, রাজনীতিও যখন ছেড়ে দিয়েছে, আত্মগোপন তো ওকে করতে হয়েছে। কখনো পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, কখনো পশ্চিমবঙ্গেই।

ওর মাথার ওই আশ্চর্য রাডার ওকে সবসময় রক্ষা করেছে। ওর পাশের কমরেডকে পুলিশ ধরেছে, ও বেঁচে গিয়েছে। যে বাড়িতে ও আগের দিনও থেকেছে, পরদিন পুলিশ রেইডের সময় ও থাকেনি।

তাছাড়া, অনেক বিপদের সামনে ও ঝুঁকি না নিয়ে নির্দ্বিধায় পিছু হটেছে— এসব কথাও আমি জানি, অন্য কেউ না জানলেও।

এত সবের পর যখন বাড়ি ফিরে এসেছে, তখন ওকে গোপন রাখতে মা-বাবাকে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে নিজের বাড়িতেই। বন্ধু-বান্ধব-স্বজন কেউ জানেনি মা-বাবা কোথায় আছেন, দুচারজন একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া।

আমি জেল থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম, জেল ফেরত তাও মেয়ে, মা-বাবা আমাকে নিয়ে বড়ই বিব্রত।

দাদা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে বড়ো চাকরি করছে বাইরে। আমি বাবাকে বললাম— আমি পড়াশুনা করতে চাই।

বাবা বললেন— হ্যাঁ, পাশ কোর্সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে নে। আর তোর মেজদাকে বল, এভাবে জীবনটা অনর্থক ব্যয় না করে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে ডাক্তারি পড়ে আসতে।

মেজদাকেই বললেই মেজদা চেঁচিয়ে উঠলো— সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করার আগে নিজেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে মারবো।

বুঝলাম ওর হ্যাঙওভার কাটেনি। আমার অনেক বন্ধুরা তখন বিপ্লবের সন্ধানে ঘরছাড়া, নানা দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবের পথ খুঁজছে। ও এসব কিচ্ছু করছে না। আমার অন্তত বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ও নিজের সামনে নিজে দাঁড়াতে

পারছিল না, তাই অত ক্রোধ।

আমি অবশ্য পাশ কোর্স নয়, অনার্স কোর্সেই ভর্তি হলাম। বাবাই নিয়ে গেল ভর্তি করাতে।

কদিন পরে আমি বাবাকে বললাম— এখন তো সব শান্ত। ছোটকাও বাড়ি ফিরে গেছে। তোমরাও ফিরে যাও। এভাবে ভাড়াবাড়িতে আর কতদিন?

মায়ের দুবার ট্রেন বদলে কর্মস্থলে যেতে হয়, অথচ বাড়ির পাশে মায়ের স্কুল। বয়স বাড়ছে, মা আর কত পারবে?

বাবা বললেন— আর তোর মেজদা, ও তো বাড়ি যেতে পারবে না। ওর নামে কেস আছে হয়ত, এলাকায়। সব কেস তুলে নিয়ে তোকে মুক্তি দিয়েছে সরকার, ওকে তো গ্রেপ্তারই করেনি, কেসও ওঠেনি নিশ্চয়ই। ও কী করে বাড়ি ফিরবে?

অতএব বাবার আর বাড়ি ফেরা হলো না। আর বাবার কথা শুনে আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মেজদা কেন আমাদের ভালোবাসার দীর্ঘ সম্পর্কের গভীরতাকে ভুলে আমার প্রতি তীব্র হিংসার ঝলকে ঝলকে উঠছে মাঝে মাঝে। ও প্রায়ই আজকাল আমায় বলছিল— বোকারা ধরা পড়ে, আর জেলে যায়, বাইরে আত্মগোপনে থাকাটাই আসল ক্রেডিট।

কখনো অন্যমনস্কভাবে পুলিশ ওকে ধরিয়ে দেবার জন্য কত চাপ দিয়েছে, কী কী করেছে গল্প করে ফেললে হিংস্রতর হয়ে বলতো— চেষ্টা করে দেখতি, ধরিয়ে দিতে পারিস কিনা।

বুঝতে পারছিলাম গ্রেপ্তার ও বিনাশর্তে মুক্তি আমাকে যে স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ দিয়েছে, দাদাকেও, সেখানে ফিরতে না পেরে ও অস্থির হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে আমি বিয়েও করেছি। চাকরিও করছি পড়াশুনা শেষ করে। এতে ওর ঈর্ষা আর অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠেছে। দাদা চিরকালই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই দাদার বড়ো চাকরি, সুখের জীবন ওকে ঈর্ষান্বিত করলেও ও মেনে নিয়েছে। আমাকে ও সহ্য করতে পারছে না কিছুতেই।

—আমার ছেলেমেয়েরা সোস্যালিজম আনবে দেশের জন্য, তাই ও পথে গিয়েছিলো। ওরা ভুল যদি করেও থাকে দোষ করেনি কোনো। ওদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য— বাবা বলত। তখন যেন বাবা মা তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আমাদের চাইতে ওকেই বেশি ভালোবাসত। মা বাবা তো বিশ্বাস করতো ও তখনও বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। ব্যবসাটা ওর ক্যামোফ্লেজ।

আমিও কী কতকটা এমনই ভাবতাম না? কে জানে। সত্যটা বুঝেও ও যেমন মেনে নিতে পারছিল না, আমি ওর অবস্থাটা বুঝেও ভাবছিলাম হয়তো আমি ভুল ভাবছি।

এসময় ও একদিন আমাকে কতগুলো লেখা পড়তে দিল। অখাদ্য, হাবিজাবি কথায় ভরা আত্মকথন। প্রায় সবই মিথ্যে বা কাল্পনিক, তবুও সেখানে লেখক তো থাকে। কৌতূহল নিয়ে পড়তে পড়তে দেখলাম, মেজদা একজায়গায় লিখেছে— মেয়েটাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি। রাজনীতি বোঝে না। সাধারণ মেয়ে। কিন্তু আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি যা বলবো, ও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কোনো প্রশ্ন করবে না। এমন মেয়েই আমার বউ হবার উপযুক্ত। যে আমার প্রতিটি আদেশ নির্বিচারে পালন করবে।

আমি খাতা বন্ধ করে রাখলাম। স্বৈরাচারীর আত্মকথন পড়তে হলে কত কুখ্যাত স্বৈরাচারী আছে। একজন অনামা স্বৈরাচারীর জীবনকাহিনী পড়ে কী হবে?

বিপ্লবীর কত ধরনের বিনাশ হয়, তাও সেদিন জানলাম।

তিন

গল্প এবার শেষ। আমাদের বাবা গত বছর মারা গেলেন। সেই দুঃখের স্মৃতি, সেই ক্রোধের স্মৃতি মনে করতে চাইনা। যা একান্ত ব্যক্তিগত।

এটুকু বলাই যথেষ্ট, দাদা বিয়ে করেছে, ছেলে আমেরিকায় সেট্‌ল করে দাদাকে গর্বিত করেছে। আমি ছেলেকে সুশিক্ষিত করার চেষ্টায় প্রাণপাত করছি। মেজদা বিয়ে করে সংসারে থিতু হয়েছে। ওর সন্তানাদি না থাকায় ঝাড়া হাত-পা, ও সুখী ব্যক্তি। ভালো রোজগারও করে, তবে এখনও আত্মগোপনে আছে। কারণ আমার কথা বা কোনো প্রাক্তন কমরেডের কথা, কোনো গণ-আন্দোলন প্রসঙ্গে, যেমন বন্দিমুক্তি কী কোনো মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যু উঠে পড়লে বলে— ও তো চিরকেলে নকশাল, গেছে নকশালি করতে।

হয়তো ও সেই গল্পের নানাসাহেবের মতো। নকশাল করার জন্যই ওর আত্মগোপনের জীবন সে কথাটা ভুলে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে আত্মগোপন করে আছে। বাবার স্মরণসভায় আমি বাবা আমাদের রাষ্ট্রীয় অত্যাচার থেকে বাঁচাতে কীভাবে প্রাণপাত করেছে তা বলেছিলাম, ওকে বাদ দিয়ে, দাদা আর আমার প্রসঙ্গে। বাড়ি ফিরে ওর বউ মাকে বললো— আমি লজ্জায় মরে যাই। আমার বরের ভাইবোন জেল খেটেছে? শুনে ভাই মুখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠে বলে— নকশালি করলে জেলে যাবে না? যত সব নকশাল।

বলা হয়নি, এর মধ্যে দুটো মহানগরীতে দাদা দুটো ফ্ল্যাট করেছে। আমি একটা, মেজদা একটা।

ফ্ল্যাটটা করেই মেজদা মা-বাবাকে ভাড়াবাড়িতে একলা ফেলে রেখে বৌকে নিজের সংসার ও নিজের বাড়ির স্বাদ দিতে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলো। রুণো গুহ-র অত্যাচার যার চেখে জল আনেনি, সেই বাবা সেদিন কেঁদেছিলো অঝোরে।

ও অবশ্য পরিবারের সব অমঙ্গল ও ওর মা-বাবাকে পরিত্যাগের জন্যও আমাকেই দায়ী করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে আজও।

—পুলিশের ছোঁয়া যে মেয়েমানুষের লেগেছে, সেই জেলখাটা নকশালই সব অমঙ্গলের গূঢ় কারণ— তা ও নানা ব্যাখ্যা ও গল্প সহকারে বলতে আজও পছন্দ করে।

তবে বাবাকে ওর বাড়ি যেতে আমন্ত্রণ সর্বদা জানাতো।

এর পর ১৩৪ পৃষ্ঠায়

গল্প

মহাভারত

বিশ্বজিৎ রায়

কুরুক্ষেত্রের রণভূমি। মহা রণাঙ্গনে যোদ্ধাদের তূর্যনাদ, অস্ত্র ঝন্‌ঝনা, শরসন্ধানের কোলাহল ছাপিয়ে নিহতদের বিক্ষত দেহ, কর্তিত মুণ্ড, অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদর্শনী ক্রমবিস্তৃত। আহতদের আর্তনাদ পিষ্ট, চূর্ণ করে ধাবমান রক্তলোচন রণতুরঙ্গদের হ্রেষা রব আর বর্মসজ্জিত মাতঙ্গদের বৃংহণ, রথচক্রের ঘর্ঘরে চতুর্দিক প্রকম্পিত। তবে যুদ্ধ-উন্মাদনা এক্ষণে স্তব্ধ। কেননা এখন সায়ংকাল। রুধিরধারায় কর্দমাক্ত রণক্ষেত্রে অস্তগামী সূর্যের আলো মিশে এক অপার্থিব লালিমা চরাচরে ব্যপ্ত। কিন্তু আকাশের দিকে চোখ তুলবার অবকাশ কই। নিহতদের বহ্নমান চিতার সারি ঘিরে যুযুধান দুই শিবিরে অন্তরালবর্তিনীদের কান্নার রোল, আহতদের পরিচর্যা ঘিরে ব্যস্ততা ছাপিয়ে জীবিতদের জন্য রান্নার প্রস্তুতি। রাত্রি গভীর হলে বসবে অবশিষ্ট রাজন্যবর্গ ও সেনাপতিদের মন্ত্রণাসভা। চলবে অদ্যকার যুদ্ধে স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় শূরবীরদের পতন এবং সামান্য যোদ্ধা বিনাশের হিসেব নিকেশ, সর্বোপরি আগামী প্রভাতের রণকৌশল নির্ণয়। আপাতত রক্তপাতের বিরতিপর্ব। শ্রান্তি, অবসন্নতা, বিলাপ ও যন্ত্রণার প্রহর। বিভ্রম ও বিহ্বলতারও।

এ সময় দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দোপদী মেঝেন। পাঞ্চালীর ভাষা বোঝেন না জঙ্গল মহলের মেয়ে। তাঁর সঙ্গিনী, কৃষ্ণার সপত্নী চিত্রাঙ্গদা হয়তো কিছুটা বোঝেন। ওরা এসেছেন এক বন্দিনী নারীকে নিয়ে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রধানা মহিষী তথা ইন্দ্রপ্রস্থের সম্রাজ্ঞীর আনুকূল্য প্রার্থনায়। হস্তিনাপুরের দখল নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের কাজিয়ার অবসরে আর্যাবর্তের প্রান্তে অরণ্যময় অনার্যভূমি এবং আরও দূর কিরাত দেশে নানা বিদ্রোহী গোষ্ঠী মাথা তুলেছে। তারা কেউ চায় বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, কেউ বা স্বায়ত্তশাসন। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের বিবাদের জেরে সসাগরা ভারতভূমি রক্তস্নাত হলেও ম্লেচ্ছ, নিষাদ, বেদে অনধিকারী সমতলীয় আরণ্যক অসভ্যকুল এবং পার্বত্য কিরাত গোষ্ঠীসমূহের বিদ্রোহ দমনে তারা ঐক্যমত। তবু দুজনে ছুটে এসেছেন পাঞ্চালীর ন্যায়বোধ, স্পষ্টভাষণ এবং সংবেদনশীল হৃদয়বৃত্তির ভরসায়। যুদ্ধশিবির হলেও পাঞ্চালীর কাছে পৌঁছোনো দূরুহ। দ্বাররক্ষীদের নিরাপত্তা ব্যূহ নিশ্ছিদ্রপ্রায়। চতুর্দিকে গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতকের আতঙ্ক পরিব্যপ্ত অন্ধকারে স্বল্পালোকিত শিবিরের প্রাচীরে কিম্ভুত ছায়াগুলির মতোই প্রলম্বিত। এ সময় বিশেষ পরিচয়পত্রবাহী, গুপ্ত সংকেত বিনা রাজকুলবধূ, বারাঙ্গনা ও কৃষকরমণীর মধ্যে পংক্তিভেদ যোদ্ধা ও অতিবিশিষ্টদের প্রাণঘাতী হতে পারে। তবে চিত্রাঙ্গদা ও দোপদী মেঝেনের সুবিধা এটাই যে তারা ছায়াশরীর ধারণে সক্ষম।

তাঁদেরও দ্রুত ফিরে যেতে হবে বহুদূরের পার্বত্য উপত্যকায়। ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধের দামামা আর্যাবর্ত পেরিয়ে মহাভারতের নানা প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত সুদূর মণিপুরেও। সেখানে সেনা প্রধানদের কড়া নির্দেশ, দিনাবসান মাত্র রাজপথে জনমানবের চিহ্ন থাকা চলবে না। কোনও নাগরিককে গৃহের বাইরে দেখা মাত্র হত্যার আইন জারি আছে। শুধু তাই নয়, সেনাশিবিরগুলি পেরিয়ে উপত্যকার গ্রাম ও নগরে সশস্ত্র রাজকীয় বাহিনীর বিশেষাধিকার বলে সন্দেহভাজন বিদ্রোহী ও তাদের শস্ত্রসম্ভারের সন্ধানে যে কোনও গৃহস্থের ঘরে বিনা অনুমতিতে তল্লাসি বৈধ। দিন ও রাত্রির যে কোনও প্রহরে এই শাসকীয় অভিযান চলাকালীন কোনওরকম বাধাদান বা তার আশঙ্কা দেখা দিলে বিনা সতর্কবাণীতেই হত্যা অনুমোদিত। বিদ্রোহীদের পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী এবং সমর্থকদের রাজভক্তির সামান্য ঘাটতি, হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ শাসকদের প্রতি তিলমাত্র বিদ্রূপ-বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটলে তাদেরও যথোচিত পদ্ধতিতে শমনসদনে প্রেরণের ব্যবস্থা বহাল। সেনাবাহিনীর অধস্তনতম সেনার তাৎক্ষণিক বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের উপরই উপত্যকার সামান্য জনের জীবনমরণ নির্ভরশীল। সৌভাগ্যবানেরা মৃত্যুদণ্ডের বদলে কারাদণ্ড পেয়ে থাকেন। বিদ্রোহী বা তাদের অনুগামী সন্দেহে নারী ধর্ষণ ও হত্যাও ঘটছে। এই বিষয়ে রাজসভা বা ন্যায়পালিকার কাছে ফৌজিদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করার অধিকার জনতার নেই। ধর্ষণ, অত্যাচার বা নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করে সংঘর্ষে মৃত্যুর কুনাট্য রচনা ইত্যাদি রাজাদেশ বহির্ভূত কার্যকলাপের অভিযোগ অনুসন্ধানের উপযোগী কিনা তা নির্ণয় তো বটেই, তার সঙ্গে তদন্ত ও শাস্তিদানের ক্ষমতাও সেনা উর্ধ্বতনদেরই হাতে। এই অন্যায়, অনৈতিক বিশেষাধিকারের সুবাদে হস্তিনাপুরের ফৌজ বিদ্রোহী সন্দেহে কয়েক সহস্র কিরাত তরুণ-তরুণীকে হত্যা করেছে বিগত দুই যুগ ধরে। বিদ্রোহী দমনে অভিযানের পরিণামে নিরপরাধ জনপদবাসী গণহত্যার শিকার বহুবার। আরও কয়েক সহস্র যুবা কারাবন্দী বা সেনা ছাউনিতে অত্যাচারে পঙ্গুপ্রায়। এসবই ঘটমান শান্তনুকুলের সাম্রাজ্যের প্রতি নিষ্ঠার নামে। মহাভারতীয় ঐক্য ও সংহতির বাগাড়ম্বরের আড়ালে ধর্ষিত, নিপীড়িত, রক্তাক্ত চিত্রাঙ্গদার দেশ। বস্তুত ব্রহ্মপুত্রের ওপারে পার্বত্য কিরাতভূমির মূলবাসীদের নাসিকা ও চক্ষুর গড়ন তথা মুখাকৃতির মঙ্গোলীয় আদলের কারণে খোদ হস্তিনাপুরেই তারা প্রায়শ বিদেশি চৈনিক জ্ঞানে উপহাস, বিদ্রূপ ও নির্যাতনের পাত্রপাত্রী।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার রাত্রিচারী ঘাতক আক্রমণে নিহত পঞ্চ পাণ্ডবের শিশুপুত্রদের জন্য এখনও শোকবিধুরা দ্রৌপদকন্যা। সন্তানদের রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে তার অগ্নিবর্ষী জিহ্বা আর রোষরক্তিম দৃষ্টিপাতে পঞ্চস্বামী তো বটেই, স্বয়ং কৃষ্ণও পালিয়ে বেঁচেছেন। এক্ষণে সপত্নী চিত্রাঙ্গদা দর্শনপ্রার্থী হওয়ায় ফেরাতে পারেননি তিনি। যুধিষ্ঠিরের যৌন ইর্ষাহেতু স্বেচ্ছা-নির্বাসিত অর্জুন ভারত ভ্রমণকালে যে কটি নারীর সঙ্গে প্রেম-পরিণয়ে আবদ্ধ হন, আত্মমর্যাদাবোধ, শিক্ষা-দীক্ষা এবং শস্ত্রশিক্ষায় তৃতীয় পাণ্ডবের প্রায় সমকক্ষ মণিপুরের রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা তাদের মধ্যে অনন্য। সব মিলিয়ে সে দ্রৌপদীর শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ঈর্ষার যোগ্য। তাই চিত্রাঙ্গদা ও তাঁর সঙ্গিনীকে তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য দাসীদের নির্দেশ দেন। সন্ধ্যার দীপশিখার আলোয় চিত্রাঙ্গদা দেখলেন জ্যেষ্ঠার কপোলে রূপালি ছোঁয়া। সীমন্তের সিঁদুর রেখা শোকাবেশে বেপথু। অঙ্গের বহুমূল্য শাড়িটি পরিপাটি নয়। আভরণগুলিও যেন ম্লান। কুরুসভাবিমোহিনী দেহবল্লরী কিঞ্চিৎ পৃথুলা। তুলনায় চিত্রাঙ্গদা তরুণী, তন্বী। তবে পথশ্রমের ক্লান্তি তার চোখেমুখে। পারস্পরিক অভিবাদন, প্রীতিভাষণ অন্তে তিনি জ্যেষ্ঠাকে শর্মিলা-কাহিনী অবগত করালেন। সেই সূত্রেই সেনা বিশেষাধিকারের তাণ্ডবে সন্ত্রস্ত, সন্তপ্ত মণিপুরবাসীর কথাও।

—হে আর্যে! স্বজাতি-স্বজনের প্রাণরক্ষায় আমার কনিষ্ঠা জ্ঞাতি-ভগিনী শর্মিলা, পুরো নাম ইরম শর্মিলা চানু, পণ করেছে সেনা যথেচ্ছাচারের বিশেষাধিকার রদ না হওয়া পর্যন্ত সে জলগ্রহণ করবে না। আজ নয়, চতুর্দশ বর্ষ ধরে এই স্বেচ্ছা-উপবাস ব্রতে জীবনপাত করে চলেছে সে। কিন্তু সভ্যতাগর্বী, ধর্মধ্বজাধারী আর্যাবর্তের শাসককুল তার প্রতিবাদে কর্ণপাত করছে না। বরং তাকে বন্দী করে বলপূর্বক তার ব্রত ভাঙ্গার উপর্যুপরি প্রয়াস চলেছে। অভিযোগ, সে আত্মহননের চেষ্টা করছে যা হস্তিনাপুরের আইনে দণ্ডনীয়। অথচ ব্রতপালনের অঙ্গীকারহেতু বা অন্যায়ের প্রতিকার যাচনায় কঠোর তপস্যায় প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের প্রথা এতকাল আর্যাবর্তে মহিমান্বিত। কিন্তু মণিপুরে তা অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য। এক যুগের বেশি সময় চিকিৎসাগৃহ নামক বন্দীশালায় অন্তরীণ থাকার পর সম্প্রতি কিছু প্রহরের জন্য তাঁর মুক্তি মিলেছিল। কিন্তু অনশন ব্রত ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে পুনরায় বন্দী করা হয়েছে। বলা হচ্ছে তাঁর অমূল্য প্রাণরক্ষার প্রয়োজনেই এই শাসকীয় তৎপরতা। কিন্তু শর্মিলার ব্রতরক্ষা বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের কোনও হেলদোল নেই। উচ্চপর্যায়ের অমাত্যদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে সেনা বিশেষাধিকার সংক্রান্ত রাজাদেশ আজও বহাল। কেননা সেনাপতিরা তাঁদের বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। হস্তিনাপুর থেকে মণিপুর সর্বত্র তাদের সতর্কবাণী : ফৌজি যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হলে সৈন্যদলের মনোবল ধ্বংস হবে, ভারতভূমির নিরাপত্তা ও শান্তি রসাতলে যাবে, বহিঃশত্রু রাক্ষসবাহিনী ও বিভীষণকুলের যৌথ ষড়যন্ত্রে সপ্তসিন্ধুর দেশ শ্মশানে পরিণত হবে। শর্মিলায় নীরব প্রতিবাদ তাই আজ অরণ্যে রোদন মাত্র। বহু আশা নিয়ে তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি তাঁর প্রাণ ও ব্রত দুই রক্ষায়। আপনিও নারী। প্রবল পুরুষদের অত্যাচার, বিকৃতকামনা ও ক্ষমতামদমত্ততার আপনিও ভুক্তভোগী, শ্রেষ্ঠা।

চিত্রাঙ্গদার দৃঢ়কণ্ঠ ও মর্যাদাব্যঞ্জক বক্তব্যভঙ্গি সত্ত্বেও তার মর্মদাহ গোপন থাকে না। দোপদী মেঝেন যেন মুখিয়ে ছিল ধরতাই দেওয়ার জন্য।

—সে দিদি তু না দেখলে বিশ্বাস করবিক লাই। কুড়িটোকে ফান্দে এটকে পড়া শুকরিটোর লেকা ঠ্যাং চ্যেপা ভ্যানে উঠা করালে বিটি পুলিশ গুলান। উয়ার ফানেকটো ছিঁড়ছে, শরীলটো উদোম হতে লাইগছে, মরদ পুলিশগুলার শরম লাই। দেশে অ্যাতো লোক খিদায় মরছেক, বিটিগুলাক নুছিং দিছেক সাপে, গরমিন্টের হুঁস লাই। আর ই কুড়িটো সমাজের খাতির ভুখ হরতালি কইরছে। রাজার নেহ্ডাটো চুলকাইনছে। কেনে? উ মরলে রাজা ল্যাংটা হবেক বলে ডরে হুলোচ্ছে। শালো, মনে লিচ্ছে কি রাজার নেড়হ্যায় ছুরি ভুকিং দুবো।

দোপদী মেঝেনের অসংস্কৃত বাক্যমালা রাজঅন্তঃপুরবাসিনী দ্রৌপদীর পক্ষে অনুধাবন করা মুস্কিল। কুন্তী সমভিব্যাহারে পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁর দ্বাদশবর্ষ কাল বনবাস পর্বে জতুগৃহ দাহ থেকে জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতা তিনি ভুলে যাননি। তবে ক্ষুধার প্রহার, নিপীড়নের নিদারুণ চিহ্নগুলি এই পলিতকেশ মলিনবসনা মধ্যবয়সিনীর শরীরে বড়ই প্রকট। শুধু নামসাযুজ্যে এই অসভ্য, আরণ্যক রমণীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব মুছে যাওয়ার নয়। বস্তুত চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে না এলে রাজ্ঞী সমীপে হাজির হওয়ার অধিকারই পেত না এই প্রগলভা নারী। কিন্তু 'বিরভূম' তথা জঙ্গলভূমির বাসিন্দা সাঁওতালনী দোপদীর হেলদোল নেই।

—তুর সখা কিষ্ণকে ডাক হে বহিন। সি তো সগ্গ-মত্ত্য-পাতাল বেবাক দেখইছে। পাপ-পুণ্যের বিচারটো কইরছে। সি বুলবেক আমি সেরি কি মিছা। শর্মিলা সাচা কি মিছা!

ধৃষ্টদ্যুম্নভগিনী বিরক্ত বোধ করেন। প্রিয়সখা হলেও ত্রিকালদর্শী বাসুদেব এখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভ্রাতৃকুলের ধর্মাধর্মের সূক্ষ্মবিচার, নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের পথে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জটিল ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত। সমনামধারিণী এই মুর্খ, অনার্য নারীর তার তাৎপর্য অনুধাবনের শিক্ষা নেই। নেহাতই আঞ্চলিক ও প্রান্তিক সমস্যা নিয়ে সে নররূপী নারায়ণের মনোযোগ দাবি করছে। বস্তুত সে দেবকীনন্দন, বৃষ্ণিকুল চূড়ামণির প্রতি কতটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখে তাও স্পষ্ট নয়। কৃষ্ণার মনোভাব যেন বুঝতে পারেন দোপদী।

—না গ দিদি, বিপদে তুর মতন আমি কিষ্ণকে ডাকি লাই। সত্তরের বিরভূমে মিলিটারি যখন আমার ইজ্জত লিলেক,

গিধ্‌গুলার লেকা আমার মাস খেলেক তখ্‌খন আমি হা কিষ্ণ হা কিষ্ণ করি লাই। কলিকালের দুশাসন পঙ্গপালের লেকা ঝাঁপাইনছে। কিষ্ণ কি জুলহা! অন্ত কাপড় সে পাবেক কুথা! আমি তাই ল্যাংটা হয়্যা মিলিটারি অফসারকে ভড়কাইনছি। হারামি, মর্দাঙ্গি দিখাইবি তো আয়। আমি লাজে লুক্যাবো কেনে, লাজ তো তুদের!

ক্ষুব্ধ কৃষ্ণা চিত্রাঙ্গদার দিকে প্রশ্নার্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। ভ্রূভঙ্গিতেই স্পষ্ট, তিনি জানতে চান এই সামান্যা বনবাসিনী কেন মণিপুর রাজকন্যার সঙ্গিনী? বুঝতে পেরে বিনীত হাসলেন কনিষ্ঠা অর্জুনপ্রিয়া।

—আমার সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা অদ্ভুত, জ্যেষ্ঠা। হয়তো অনিবার্য ছিল। ওদের দেশের এক কবি আমার আর তৃতীয় পাণ্ডবের প্রেমকাহিনী নিয়ে কাব্য লিখেছেন। সেই নৃত্যনাট্যের কারণে আমি বঙ্গভূমে জনপ্রিয়। আবার দোপদীকে নিয়ে গল্প লিখেছেন ওদের এক লেখিকা। যে কাহিনীকে নাটকে রূপ দিয়েছেন আমাদের এক নাট্যকার ও তাঁর দল। আপনি মঞ্চে দোপদী-বেশী সাবিত্রীকে দেখেননি আর্যে। সেনা অত্যাচারে রক্তাক্ত, গণধর্ষিতা দোপদীর উলঙ্গ প্রতিবাদ তাঁর রক্তে-মাংসে-মূর্ত। ক্ষমতামত্ত হস্তিনাপুরকে বেআব্রু করেছে দোপদীর ছায়া আর সাবিত্রীর কায়া মিলেমিশে। সম্ভবত তা থেকেই শাসকীয় ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক অমোঘ ভাষা শিখেছেন আজকের মণিপুরের মেয়েরা-মায়েরা। উর্দিধারী ধর্ষকদের বিরুদ্ধে পথে নেমে উলঙ্গ হয়েছেন তাঁরা। চিৎকার করেছেন : এসো সৈন্যেরা, ধর্ষণ কর আমাদের।

বলতে বলতে একটু থামেন চিত্রাঙ্গদা। ঘনিয়ে ওঠা আবেগকে দমিয়ে আত্মসংবরণের শিক্ষা তার। সময়ও কম। দ্রৌপদীর সহমর্মিতা অর্জনে তিনি বৃহত্তর ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গ টানেন।

—কুরুসভায় বলদর্পী ও ভীরু পুরুষদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদ আর কালান্তরে দোপদীর প্রতিবাদ এভাবেই আমাদের প্রতিবাদের সঙ্গে মিলেছে। শর্মিলা আপনারই উত্তরসূরি, শ্রেষ্ঠা! ওর প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে আপনি কি আমাদের পাশে দাঁড়াবেন না?

মেঝেন দোহার দেন।

—কুড়িটো তুর লেকা কঠিন পণ কইরেনছে গ দিদি! যত্ত দিন তার বেতো পূরা না হবেক, তত্তদিন সি বিটি চুল বাধবেক লাই। ফুলন ত্যাল দিবেক লাই। বিটির মা কুড়িটোর মুখ দ্যাখে নাই চোদ্দ বচ্ছর। পিতিজ্ঞা দুয়োজনার। ভাত খাইবার লেগ্যা কুড়িটোর বড় সাধ। তিয়াসে বুক ফাট্যে। কিন্তুক রাজা প্রজার কথাটো না শুনলে উ বেতো ভাঙবেক নাই।

কে এক শর্মিলার সঙ্গে তার তুলনা পাঞ্চালীর পছন্দ নয়। তার আত্মাভিমান প্রখর। কিন্তু মুখরা জঙ্গলকন্যা নিজের সঙ্গেও রাজ্ঞীর সম্পর্ক প্রমাণে উৎসুক।

—তুর মতো সি কুড়িটো দুশাসনের কইলজার রক্ত মাঙে লাই। কুনও ভীমও লাই তার সাইথে। একটা পিমড়া ভি মারে লাই। মোর সামুতে পইড়লে দিখাইন দিতাম। তুর মতো আমি ল্যাংটা কালী হয়্যা বন-জঙ্গলে, শমশানে রাইতভর বদমাইসগুলার হাড়মাস চিবাইতাম। দোপদীর আসলি রূপ তো দেখিস লাই তুরা!

চমকে ওঠেন পাঞ্চালী। তিনি যে বিশ্বরূপা, কালীস্বরূপিণী, আদ্যাশক্তির অংশীদার, তা বনবাস পর্বে স্বয়ং কৃষ্ণ ভীমকে জানিয়ে ছিলেন। পঞ্চস্বামী পর্ণকুটিরে আগল এঁটে শুয়ে পড়ার পর চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়তেন মায়াপাঞ্চালী। শ্মশানচারী, জঙ্গলচণ্ডী রূপে রাত্রিবিহার করতেন। বনের পশুপাখী, মৃত বা জীবিত মানুষ তার ক্ষুধানলে পুড়ত। ভামিনীর যৌন ক্ষুধাও এত প্রবল ছিল যে মহাবলশালী ভীমসেন তা মেটাতে না পেরে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তার পৌরুষের অংশ ভীমকে দান করেন। লোলজিহ্বা, করালবদনী কালীরূপিনী দ্রৌপদীকে বলপূর্বক কুটিরবন্দি রাখলে তিনি পঞ্চ স্বামীকেই ভক্ষণ করবেন, কৃষ্ণের এই সতর্কবাণীর কারণে তাঁর রাত্রিবিহারে বাধা দেওয়া সাহস পাননি পাণ্ডবেরা। এমনকি ভোরে ফিরে আসার পরও ভয়কাতর ভীমসেন দ্বার উন্মুক্ত করেন নি। দরজার ফাঁক দিয়ে আঙ্গুল প্রসারিত করে পিশাচসিদ্ধা পাণ্ডবানীর কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল : তিনি কৌন্তেয় ও মাদ্রীপুত্রদের ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামীর আঙ্গুল স্পর্শ করুন। কুপিতা আদ্যাশক্তির নখের আঘাতে ভীমসেনের আঙ্গুল থেকে পঞ্চ বিন্দু রক্তপাত ঘটে। সেই রক্তবীজ থেকে জন্ম নেয় পঞ্চ সন্তান। সন্তানদের মুখ দেখে ক্রোধ শান্ত হয় মায়াপাঞ্চালীর। তিনি মাতৃরূপেন সংস্থিতা হলে রক্ষা পায় মহাভাগ পাণ্ডবকুল। কিন্তু এসবই তো বনবাস পর্বের গোপন ইতিহাস। চিরপ্রণম্য বেদব্যাস তা লিখে যাননি। হ্যাঁ, বিস্তীর্ণ ভারতভূমির উত্তর ও দক্ষিণের নানা প্রান্তে পাঞ্চালীর রূপান্তরের নানা কাহিনী পল্লবিত যা আজ তার সুসংস্কৃত রাজ্ঞী পরিচয়ের বিড়ম্বনার কারণ। এই অসংস্কৃত বনবাসিনী তা ফের মনে পড়ানোয় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন।

—ভগিনী চিত্রাঙ্গদা, দূরবাসিনী হলেও তুমি নিশ্চয়ই হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভার জটিল ও কুটিল রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত। তুমি তো জানো, আমাকে এই মহাযুদ্ধের কারণ হিসাবে ঠারেঠোরে দোষারোপ চলছে। যদিও আমি সম্যক জানি, আমার ভূমিকা স্রেফ উপলক্ষ্যের। মহাজ্ঞানী, সত্যপ্রেমী যুধিষ্ঠির আমাকে অপরাপর স্থাবর ও জঙ্গম সম্পত্তির মতো বিনিময় বা বিক্রয়যোগ্য না মনে করলে এই ভয়াবহ যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না। পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থও ক্ষমতার পাশাখেলার কুৎসিত নরক থেকে আমাকে রক্ষা করেন নি। এমনকি নররূপী নারায়ণ বাসুদেবও তার সুদর্শনচক্র ব্যবহারে দুরাচারীদের স্তব্ধ করেননি। বস্ত্রহরণকালে আড়াল থেকে লজ্জা নিবারণ করেছেন মাত্র। একমাত্র সূক্ষ্ম বিচারে অপারগ, আবেগপ্রবণ ভীমসেন

আমার লাঞ্ছনায় উন্মত্ত হয়ে দুরাত্মা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও বিকৃতকাম দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখনও চলমান। তোমার কাছে সত্য গোপন করব না। সাম্রাজ্যাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের পরিণতিতে কুরু বা পাণ্ডবপক্ষ যেই জয়ী হোক, হস্তিনাপুরের ভারতদর্শন বদলানোর সাধ্য আমার নেই। এমনিতেই আমি বিবাদিতা, বিতর্কিতা। আমাকে আর বিবাদে জড়িও না।

অধোবদন, বিড়ম্বিতা দ্রৌপদীর বাক্যশ্রবণে রুদ্ধবাক চিত্রাঙ্গদা। বড় আশা নিয়ে জ্যেষ্ঠার শরণাগত হয়েছিলেন। তার অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি পাঞ্চালীর চোখ এড়ায় না। তিনি মণিপুর রাজনন্দিনীকে পাল্টা বিব্রত করতে চান।

—তুমি নিজেও তো অর্জুনপ্রিয়া! ধনঞ্জয়পুত্র বভ্রুবাহনের মাতা। তাঁর সাহায্য নিজে কেন প্রার্থনা করছ না ভগিনী? তিনি মণিপুরবাসীকে চেনেন, জানেন। তাদের জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণা থাকতেই পারে। দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আভাস চিত্রাঙ্গদার কান এড়ায় না। তিনি নিজে যে এমনটা ভাবেননি তা নয়। কিন্তু আত্মাভিমানী তিনিও কম নন। প্রেমিক, স্বামী হলেও তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে দয়াভিক্ষা তাঁর মর্যাদাবোধে বাধে। তাছাড়া তিনি প্রান্তীয় রাজ্যের রাজকন্যা হলেও রাজধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম সম্পর্কে টানাপোড়েন তাঁরও আছে। স্বদেশ-স্বজাতির লাঞ্ছনা-দুর্দশায় তিনি কাতর হলেও স্বামীর কুল তথা হস্তিনাপুরের বন্ধন ছিন্ন করে, তার সার্বভৌমত্বের দাবিকে অস্বীকার করে এগোনোয় তাঁর দ্বিধা আছে। সে মনোভঙ্গি বুঝে হাসলেন দ্রৌপদী। বোঝাপড়ার হাসি।

--তুমি অতীব বুদ্ধিমতী, শাস্ত্র-শস্ত্রজ্ঞানী নারী। তোমাকে লুকোবো না। খন্ডিত হোক বা সসাগরা মেদিনী, সাম্রাজ্য না থাকলে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকাই বা কী? এত লাঞ্ছনা, ক্লেশভোগ এবং শোকতাপের পর এটুকু সুখ শান্তি কী আমার প্রাপ্য নয়! হোক না স্বল্পকালের জন্য, তবু এই যুদ্ধশেষে যে উত্তরাধিকারীরা বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য সাম্রাজ্য সুনিশ্চিত করা তো আমারও কর্তব্য। বিবাহসূত্রে তোমারও।

চিত্রাঙ্গদা চিত্রার্পিত। মানসচক্ষে দেখতে পেলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে বিজয়ী পান্ডবপক্ষ সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অভিষেকেই সন্তুষ্ট নয়। রাজচক্রবর্তী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রাজসূয় যজ্ঞও আয়োজন করা হয়েছে এবং তারই অঙ্গ রূপে দিগ্বিজয়ের নেশায় অশ্বমেধের ঘোড়ার পশ্চাতে ফের বনপথ-জনপথে ধাবমান সসৈন্য অর্জুন। ত্রিগর্ত, সিন্ধু, প্রাগজ্যোতিষপুর সহ নানা রাজ্যে প্রভূত লোকক্ষয় ও ধনলুণ্ঠনের পর বিজয়ী পার্থ উপস্থিত মণিপুরে। সাম্রাজ্যের বিজয়কেতন ওড়াতে মণিপুরপতি তথা পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। পিতাকে যথা সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রাণদাতার সঙ্গে যুদ্ধে অস্বীকৃত হলেন চিত্রাঙ্গদাপুত্র। বিনিময়ে জুটল ক্ষাত্রধর্ম তথা রাজধর্ম পালনে অনীহার অভিযোগে পিতার কঠোর তিরস্কার। বিমাতা উলুপীর উপরোধে শেষপর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বভ্রুবাহন। প্রবল শরাঘাতে দেববিজয়ী পিতাকে ভূপাতিত করে শোক পরিতাপে নিজেও মোহাবিষ্ট হয়ে ধরাতলে নিপতিত হলেন। রণস্থলে সমাগতা চিত্রাঙ্গদা স্বামী ও পুত্রের সমরশয্যাগত রক্তাক্ত দেহদর্শনে ক্রন্দনে আকুল হলে সপত্নী তাকে প্রবোধ দিলেন। নাগকন্যা উলুপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী মণি এনে প্রায়োপবিষ্ট বভ্রুবাহনকে দেন। মণিস্পর্শে প্রাণ ফিরে পান অর্জুন। পরিণতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞশেষে হস্তিনাপুরে শ্বশ্রূমাতা কুন্তীর দ্বারা উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা সমাদৃতা হন। বভ্রুবাহনও পিতৃকূলের আশীর্বাদ ও প্রীতিলাভ করলেন।

চিত্রাঙ্গদার ভবিষ্যৎ-দর্শন দ্রৌপদীর অজানা নয়। স্মিতহাস্যে সপত্নীর দিকে তাকালেন। যার অর্থ : কী, বলে ছিলাম না! মণিপুর কন্যা তবু দীর্ণ হৃদয়। ভারাক্রান্ত মনে তিনি বিদায় নিলেন। মেঝেনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই। দুই জায়ের কথোপকথন থেকে তিনি যা বুঝলেন তা তাঁর ভাষায় এরকম: রাজধম্ম বুলতে দিদি বুঝাচ্ছে কী? যি যাবেক লঙ্কায়, সি-ই হবেক রাবণ?

দুই

বীর নীলমণি সিংহের চোখে জল। পুরু লেন্সের চশমায় বৃদ্ধ এমনিতেই ঝাপসা দেখেন। তার উপর অশ্রুপাতে দৃষ্টি আরও অস্বচ্ছ। আজ সকাল থেকেই তার মন বিচলিত। দিনাবসানে লণ্ঠনের আলোয় দেখলেন সেনানায়কের উর্দি পরিহিত এক ব্যক্তি তাঁর দুয়ারে। প্রথমটায় ঠাহর করতে না পারলেও আগন্তুক টুপি খুলতেই নীলমণি আদলটা চিনতে পারলেন। পুরোনো অভ্যেস মতো উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করতে যেতে অতিথি এগিয়ে এসে হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলেন। স্পর্শে তাঁর উষ্ণতার ছোঁয়া। স্বল্প কেশ, প্রশস্ত ললাট, গৌরবর্ণ বাঙ্গালি ভদ্রলোক। নীলমণির বেদনা তাকেও ছুঁয়েছে। তাই দেখা করতে এসেছেন একদা অনুগামীর সঙ্গে। ঘরের একমাত্র ভাঙা চেয়ারটিতে মুখোমুখি বসে গোল চশমা খুলে চোখ মুছলেন। সেনাপতিসুলভ কাঠিন্য, রুক্ষতা তাঁর কখনই ছিল না। বাংলাদেশের সজল প্রকৃতির সন্তান। একটুতেই ভাবাবেগ এসে যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই প্রান্তে এলেন বহুদিন পর। সেই কবে যুদ্ধের ডামাডোলে ইংরেজ সরকারের নজর এড়িয়ে কলকাতা ছেড়েছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শত্রুর শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতার সূত্রে পাহাড়-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে স্বদেশ থেকে দূরে গড়ে তোলেন মুক্তিফৌজ। আর্যজ্যাতাভিমানী গুঁফো হিটলার তথা নাজি মারণযজ্ঞের হোতা ফুয়েরার আর নিপ্পন সাম্রাজ্যবাদী টেকো তোজোর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার ভালোমন্দ নিয়ে বখেড়া আজও বিদ্যমান।

কিন্তু অশীতিপর নীলমণির কাছে তিনি আজও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। চুয়াল্লিশে জাপানিদের সঙ্গে আগুয়ান আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে পৌঁছোয় মণিপুর ও বার্মা অধুনা মায়ানমার সীমান্তের অখ্যাত গ্রাম মৈরাঙে। এখানকার মাটিতে প্রথম ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ান ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামীরা। শুধু তাই

নয়, রাজধানী ইম্ফলের পথে পালেল গ্রামে ফৌজের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলে ইম্ফল ও কোহিমা রক্ষায় মরিয়া ব্রিটিশ বাহিনীর কর্তাদের রক্তচাপ প্রবল হয়। মৈরাঙে তিরঙ্গা ঝান্ডা ওড়ার দিন সেখানে ছিলেন মেইতেই যুবক নীলমণি। আইএনএ-তে যোগ দিয়ে পালেল কেন্দ্রের সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্মৃতিতে নেতাজিকে প্রথম দেখা পালেলেই।

তার আগেই অবশ্য তরুণ নীলমণির বিপ্লবদীক্ষা সাঙ্গ শিলচর, কুমিল্লা, ঢাকার বাঙালি বন্ধুদের সুবাদে। তাদের যোগাযোগে কলকাতা এবং চন্দননগরে বিপ্লবী সমিতিগুলির গোপন ডেরাও ঘুরে এসেছেন। চন্দননগরের এক ডেরায় বাঙালি বৌদি বিভাবতীর রান্না কই মাছের ঝাল আর জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রদর্শন কোনটাই ভোলেননি আজও। বাঙালিদের সঙ্গে মণিপুরের মেইতেইদের সম্পর্কটা অবশ্য পাঁচশো বছরের পুরোনো। চৈতন্যদেবকে ঘিরে বৈষ্ণব প্রভাবে তা গাঢ় হয়। নদের নিমাইয়ের রসে ডুবু ডুবু নবদ্বীপ তো মণিপুর রাজবংশের দ্বিতীয় গৃহ হয়ে ওঠে। বাংলা লিপিতে মেইতেই রাজভাষা হয়ে ওঠে। শুধু মেইতেই নয়, আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন পূর্বোত্তর ভারতের নাগা, কুকি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বেশ কিছু যুবক। ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য উপজাতীয় অঞ্চলগুলি জয়ের পর তা সমতলীয় ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত না করে আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করে। নেফা, নাগা হিলস, লুসাই হিলস ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ এজেন্সি খোলে এবং মণিপুর বা ত্রিপুরায় রাজবংশের স্বীকৃতি দেয়। এর পিছনে খ্রিস্টান মিশনারীদের চাপ যেমন ছিল, তেমনই ছিল স্থানীয় উপজাতীয় রাজা, গোষ্ঠীপ্রধান ও সাধারণের স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বকীয় ঐতিহ্যচেতনা। মুঘল যুগেও বৃহত্তর অসম লাগোয়া বিস্তীর্ণ পার্বত্য বনভূমিতে নাগা, মিজো, গারো, খাসি ও অপরাপর অজস্র ছোট গোষ্ঠীগুলি দিল্লির শাহেনশার অধীনস্থ হয়নি। ইংরেজ উপনিবেশকারীরা সামরিক শক্তি এবং ভেদবুদ্ধির জোরে নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে সক্ষম হলেও মহাভারতের সমতলের মতো তা কখনও নিরঙ্কুশ ছিল না। তুলনায় সমতলীয় মণিপুর উপত্যকায় প্রতিবেশী বর্মী রাজাদের আক্রমণ বেশি ছিল। ইংরেজরা বর্মী হানাদারি রুখতে সাহায্যের বিনিময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

জার্মান-জাপানি আক্রমণে কোণঠাসা ব্রিটিশ সিংহের মোকাবিলায় অগ্রসর আইএনএ-তে যোগদানকারী মেইতেই, নাগা, কুকি যুবকেরা তাই ভারতের স্বাধীনতার পাশাপাশি নিজেদের জাতিসত্তাগুলিরও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। বাঙালি দেশনায়কের স্বপ্ন : হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দ্রাবিড়-পাঞ্জাব-মারাঠার সম্মিলিত ভারত। আর মহাভারতীয় প্রান্তভূমির কিরাত গোষ্ঠীগুলির আত্মজদের স্বপ্ন : ইংরেজ-পূর্ব সময়ের স্বাধীনতা এবং নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ঐক্যসাধনের পথে বৃহত্তর অঞ্চলে ক্ষমতাবৃদ্ধি। দুই স্বপ্নের সংঘাত তখনও স্পষ্ট নয়। নয় ছোটো ছোটো স্বপ্নগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধের মুষলপর্বও।

—ফিজোকে আপনার মনে পড়ে নেতাজি? ও তো আপনার সঙ্গে রেঙ্গুন যাবে বলে এগিয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল ওর গর্ভবতী স্ত্রী। শুনেছি ইরাবতীর ধারে ওদের মেয়ে আদিনোর জন্ম হয়। সেই ফিজোই তো পরে নাগা স্বাধীনতার দাবিতে অস্ত্র হাতে নিল।

নেতাজি অস্ফুটে হাসলেন। ব্যথিত, ক্লান্ত হাসি। দীর্ঘ কয়েক মাস ম্যালেরিয়া, ব্রিটিশ বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণ, খাদ্যাভাব, যুদ্ধ উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করেছে আইএনএ। কিন্তু ক্রমশ পর্যদুস্ত জাপানিরা ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় রসদহীন, শস্ত্রহীন ভারতীয় মুক্তিবাহিনী বার্মার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপথে পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয়। সেই তো তার স্বপ্নের শেষের শুরু।

এতক্ষণ নীলমণি খেয়াল করেননি তার একদা সর্বাধিনায়কের শরীরে আঘাতের চিহ্ন। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। কোমরবন্ধের অসি দুটুকরো। পায়ের ব্রিচেস ছিন্নপ্রায়। পরাজিত, পলাতক নায়ক আরও একবার হতমান। নীলমণি তার কারণটা জানেন। মৈরাঙে ভারতীয় মুক্তি ফৌজের ত্রিবর্ণপতাকা উত্তোলন স্মরণে প্রতি বছর জড়ো হন বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকরা। ওখানেই প্রতিষ্ঠিত আইএনএ স্মারকশালার সামনে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তিকে অভিবাদন জানান তাঁরা। এবার মৈরাঙ দিবসের কদিন আগে নেতাজির মূর্তিতে হাতুড়ি, কুঠারের আঘাত নেমে এসেছে। ত্রিবর্ণ পতাকা যা আজ স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্বের অশোকচক্রশোভিত বিজয়কেতন, তাও ছিন্ন। কেননা, স্থানীয় স্বাধীনতাকামী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাছে নেতাজি, আইএনএ স্মারকশালা আর তিরঙ্গা ঝান্ডা আজ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বা আধিপত্যবাদের প্রতীক। এই ভগ্ন মূর্তি ও স্মারকশালা রক্ষায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর একটি কোম্পানির ঘেরাটোপে কুচকাওয়াজ করছেন বৃদ্ধ ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামীরা। সিঙ্গাপুর থেকে সিডনি, আঙ্কারা থেকে অমৃতসর প্রত্যাগত অশীতিপর সহযোদ্ধাদের কণ্ঠে বেজেছে তাঁদের স্বপ্নসংগীত : কদম কদম বঢ়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা, ইয়ে জিন্দেগি হ্যায় কওম কী, তু কওম পে লুটায়ে যা...

—অ্যাটেনশন, সভি জওয়ানো সুপ্রিম কমান্ডারকো স্যালুট করো। প্রাক্তন কর্ণেল জেকবের এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অথর্ব, ন্যুব্জপ্রায় দেহগুলি ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো টানটান। কুঞ্চিত-ত্বক, শীর্ণ হাতগুলি কপালে স্যালুটের ভঙ্গিতে। বলিরেখালাঞ্ছিত মুখগুলিতে আশ্চর্য এক দীপ্তি। দেখে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর সুবেদার নায়েক যশবীর সিংহ বিস্মিত।

—স্যার, ইয়ে বুঢ়ঢো কা জামাত মে আভি ভি জওয়ানি কি জোস ভরপুর হ্যায়। শুনে ঘাড় নাড়লেন তরুণ মেজর

আলুওয়ালিয়া। তারপরই অধস্তন জওয়ানদের নির্দেশ দিলেন।

— সভি জওয়ানো চৌকন্না রহনা। কভি ভি আতঙ্কবাদী লোগ হামলা কর সকতা হ্যায়। চারো তরফ ফয়েল যাও সব। কোই আগর হাতিয়ারবন্দ সাসপেকট হো তো ভুন দেনা। কোই গদ্দার কো ছোড়না নেহী।

কম্যান্ড পোস্টের অদূরে দাঁড়ানো নীলমণির চোখে জলের ধারা।

—কেন এমন হল নীলমণি? তোমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের স্বপ্নের এমন সংঘাত কেন হল? কোথায় আমরা ভুল করলাম? কার পাপে এমন ঘটল?

নেতাজির যন্ত্রণার্ত কণ্ঠস্বর ভিতর থেকে কাঁপিয়ে দিল নীলমণিকে। কত কথাই মনে পড়ছে। কত কিছুই বলতে চান। স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত শোনাতে রাত কাবার হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ এবং থাংজাম মনোরমার সঙ্গে নেতাজির আলাপ করিয়ে দেওয়া ভাল। তার আগে খেয়াল পড়ল, পথশ্রমে মানুষটি নিশ্চয়ই শ্রান্ত। তিনি তো এখন অতি বৃদ্ধ হয়েছেন। নীলমণি শুনেছেন কলকাতায় শ্যামবাজারে ঘোড়ায় চড়ে সেনানায়কের পোশাকে নেতাজিকে ট্র্যাফিক সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বছরে একবার ঘটা করে বেঁটে বেঁটে নেতারা মইয়ে চড়ে গাঁদা ফুলের মালা চড়ান বিগ্রহে। বাকি দিনগুলো রোদ-বৃষ্টি, ধুলো আর পক্ষীপুরীষে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন একা। মানুষটার একটু বিশ্রামও প্রয়োজন। ক্ষতের শুশ্রূষাও। যৌবনের দিশারীকে আতিথেয়তার সম্বল নীলমণির নেই। থাকেন একা, খান স্বপাকে। ভাবলেন চা খাওয়াবেন নেতাজিকে। কিন্তু অতিথির ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ আর নেই। নীলমণি কোনও ওজর আপত্তি শুনতে রাজি নন। স্টোভ জেলে জল গরম করে কাপড় ছিঁড়ে পুলটিশ বানিয়ে ফিল্ড হাসপাতালের কায়দায় নেতাজির ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলেন। তারপর সামরিক ধড়াচুড়ো ছাড়িয়ে পরিয়ে দিলেন মৈইতেই পোশাক। জঙ্গি আক্রমণের ভয় এড়িয়ে রাত্রিবিহারে সুবিধা হবে। নেতাজি আপত্তি করলেন না। এর আগে ইংরেজ সরকারের টিকটিকিদের চোখে ধুলো দিতে কাবুলি, ইতালীয় সাহেবের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। এবার স্বদেশি জঙ্গিদের এড়াতে। শুধু তার খেদ হল, ভাগ্যে এটাও ছিল!

রাত্রি গভীর হলে দুজনে উপস্থিত হলেন ইম্ফল নগরের কেন্দ্রে কাংলা প্রাসাদের অদূরে। কারফিউ জারি থাকায় রাস্তাঘাট জনমনুষ্য-হীন বিশাল এলাকা জুড়ে এই প্রাসাদ-দুর্গ মণিপুর রাজবংশের একদা বাসগৃহ। শুধু তাই নয়, এখানেই বভ্রুবাহনের মন্দির। নীলমণি জানালেন, চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের সন্তান বভ্রুবাহনকেই মণিপুর রাজপরিবার তাদের আদি পিতা বলে পূজা করে। এই প্রাসাদ চত্বরেই অন্য মন্দির চত্বরেই রয়েছেন মৈইতেই ধর্মের অন্যতম আদি দেবতা— পাখাংবা যিনি আধা সর্প আধা মানব। কিংবদন্তী বলে, এনস হাওবা চানুর গর্ভে বভ্রুবাহনেরই সন্তান তিনি। রাজবংশের আনুকূল্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বাড়লেও স্থানীয় জনমানসে নিজস্ব প্রাচীন বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষাও তীব্র। ফলে দুইয়ের মিশ্রণে দেবদেবীরা মহাভারতীয় ও স্থানীয় দুই পরিচয় তথা নামেই পূজিত। এভাবেই পাখাংবার হিন্দু নাম যবিষ্ঠ, স্বর্গের রাজা সোরাসেন ইন্দ্র, প্রলয়ের দেবতা নঙপোক নিংথাও শিব। পানথৌবি দুর্গা, জলদেবতা ওয়াংবারেন বরুণ প্রমুখ। এ ছাড়া লোকজ দেবী সেনামেহি পূজিতা রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির সর্বত্র। আর্যাবর্তীয় হিন্দু আগ্রাসন, এমনকি স্থানীয় সংস্কৃতির বঙ্গীয়করণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং মহাভারতীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাসের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ও রক্ষার তাড়না— দুইয়ের টানাপোড়েনের উৎস মণিপুরের ভূগোল- ইতিহাস, সমাজে-রাজনীতি-অর্থনীতিতে। বিশেষ করে ইম্ফল উপত্যকার মৈইতেইদের সঙ্গে সমতলীয় ভারতভূমির যোগাযোগ বহু শতকের। উজানি অসমের আহোমদের পর মণিপুরের মৈইতেই সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি একদিকে হিন্দু-মুসলিম ভারত অন্যদিকে সীমান্তবর্তী বর্মী-থাই তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগোত্রীয় উৎসভূমির সঙ্গে বহু কালের বন্ধন ও বিচ্ছেদে আলোড়িত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেদনীতি তাকে আরও জটিল ও কুটিল করেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব— গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেল এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ও আঞ্চলিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ও জনমানসে তার প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করেননি।

নীলমণির মনে পড়ল, আইএনএ-তে যোগদানের পর তিনি মৈইতেই, নাগা, কুকি, মিজো প্রমুখ জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নীতি জানতে চেয়ে ব্যর্থ হন। বড় স্বপ্নের আবর্তে ছোট ছোট স্বপ্নগুলো তলিয়ে গিয়েছিল। জোয়ার নেমে যাওয়ার পর ভাঁটার কাদায় ফের উঠে এসেছে তারা। মোকাবিলায় হস্তিনাপুর-দিল্লির আজকের শাসকরা ইংরেজরা পথেই হাঁটছে। ভাবলেন, এই সুযোগে নেতাজির মতটা জেনে নেবেন। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সর্বাধিনায়ক পকেট থেকে বায়নাকুলার বের করে কাংলা নিরীক্ষণে ব্যস্ত। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে উর্দিধারী সশস্ত্র ফৌজ প্রাচীর বরাবর টহল দিচ্ছে। প্রাচীর গাত্রে নজরদারি মিনারে যুদ্ধাবস্থাকালীন সতকর্তা। বালির বস্তার আড়ালে থেকে উদ্যত মেশিনগান। সার্চলাইটের ঘূর্ণায়মান শ্যেনদৃষ্টিতে চিরে যাচ্ছে রাতের অন্ধকার।

নেতাজির বিস্মিত কণ্ঠস্বর কানে আসে।

—সে কি, যুদ্ধ কি এখনও শেষ হয়নি? ইংরেজরা এখনও কি কাংলা প্রাসাদ দখলে রেখেছে? আমি কি ভুল দেখছি নীলমণি?

—নাহ্, আপনি যা দেখছেন তা বিভ্রম নয়। ইংরেজ আমলে এই প্রাসাদ-দুর্গ দখল করে সৈন্য ঘাঁটি বানানো হয়। এখানেই বিদ্রোহের দায়ে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলায় ইংরেজ। আজও কাংলা

ফৌজি দখলে। অপরিচিত কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে তাকান নেতাজি। রাজবেশধারী দীর্ঘকায় সুপুরুষ। মাথায় মণিপুরী পাগড়ি। হাতে খোলা তলোয়ার। গলায় ফাঁসির দড়ির দাগ দগদ্‌গে।

নীলমণি প্রথমে 'কৈরাঙ' সম্বোধনে অভিবাদন জানান। তারপর পরিচয় করিয়ে দেন— ইনি বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ। মণিপুর রাজবংশের বিদ্রোহী রাজপুত্র। নেতাজি দেখলেন সেনানায়কের পোশাক পরনে থাকলেও তাঁর মতোই গোলগাল মুখ। তবে হালকা গোঁফ রয়েছে। যুবকোচিত স্বপ্ন ও স্পর্ধা তাঁর চোখে।

মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহের মৃত্যুতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচাঁদ সিংহ সিংহাসনে বসে ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদারি চরমে তোলেন। ইম্ফলে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রিমউডের ঔদ্ধত্য, রাজকার্যে দৈনন্দিন দখলদারি সহ্য করতে পারেননি টিকেন্দ্রজিৎ। অন্য ভ্রাতা কুলচন্দ্রকে রাজগদিতে বসিয়ে যুবরাজ হন টিকেন্দ্রজিৎ। প্রজাদের সমর্থন ছিল তার দিকেই। ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূল টিকেন্দ্রজিৎ-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউনের নির্দেশে অসমের চিফ কমিশনার জে ডবল্যু কুইন্টন টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেফতার এবং নির্বাসনে পাঠানোর জন্য সসৈন্যে ইম্ফলে উপস্থিত হন। ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে দরবারের ছলে যুবরাজকে গ্রেফতারির ষড়যন্ত্র ভেঙে গেলে প্রাসাদ আক্রমণ করে ইংরেজ বাহিনী। বহু নারী শিশু ও পুরুষকে হত্যার পরও টিকেন্দ্রজিৎ অধরা থাকায় রেসিডেন্সিতে ঘাঁটি গাড়ে ব্রিটিশ ফৌজ। পাল্টা আক্রমণে পর্যুদস্ত কুইন্টন সহ পাঁচ ইংরেজি অফিসার শান্তি আলোচনার জন্য দুর্গে প্রবেশ করেন। কিন্তু অস্ত্র সমর্পণে অস্বীকৃত কুইন্টনের ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দুর্গ রক্ষাকারী মণিপুরী সেনা এবং প্রজাকুল। তাদের আক্রমণে গ্রিমউড নিহত হলে টিকেন্দ্রজিৎ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন। বাকি ব্রিটিশ অফিসারদের বন্দি করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাদেরও হত্যা করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ প্রতিরোধে নেতৃত্বের কথা স্বীকার করলেও অফিসারদের হত্যার দায়িত্ব নেননি। প্রত্যাঘাতকারী ব্রিটিশ বাহিনী দুর্গ দখল করে তাঁকে বন্দি করার পর সামরিক আদালতে তিনি জানান, মণিপুরের প্রভাবশালী সেনাপতি থাঙ্গল জেনারেলের নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড। যদিও এ নিয়ে দুজনের আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আদালত টিকেন্দ্রজিতের যুক্তি মানেননি। কেননা তিনিই ছিলেন বিদ্রোহের নেতা। ভারতসম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং পাঁচ ব্রিটিশ অফিসারের হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনার অভিযোগে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। একই সাজা পান প্রবীণ থাঙ্গল জেনারেলও। তাঁর বিদ্রোহের শুরু ১৮৫৭ সালে তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহের কালে। চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সেনাদের সারিতে ছিলেন তিনিও।

১৮৯১-এর এই বিদ্রোহ কাঁপিয়ে দেয় ব্রিটিশ সরকারকে। শহীদ টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গল বীরের মর্যাদা পান জনমনে। তাঁদের জনপ্রিয়তা এবং ব্রিটিশবিরোধী জনরোষ দেখে ইংরেজ সরকার সরাসরি মণিপুরকে কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। রাজবংশের এক অখ্যাত শাখার উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসায় তারা। শিলচর, কোহিমা ও তামু থেকে যে ইংরেজ ফৌজ কাংলা দখল করে তার মধ্যে আসাম রাইফেলস,বেঙ্গল মাদ্রাজ ইনফ্যান্ট্রি ও গুর্খা রেজিমেন্টও ছিল। পরবর্তীকালে আসাম রাইফেলসের ঘাঁটি হয় কাংলা দুর্গ। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও মণিপুরের মানুষের জাতীয় আবেগ ও শহিদ-স্মৃতিকে উপেক্ষা করে কাংলাকে সৈন্যমুক্ত করা হয়নি। নাগা ও মেইতেই জঙ্গি দমনে কাংলার ফৌজি ছাউনির অবস্থান ও গুরুত্বই বড়ো হয়ে ওঠে।*

— আচ্ছা সুভাষবাবু, বলুন তো কলকাতায় রবিবাবুর বাড়ি বা আপনাদের বাড়ি যদি আর্মি ব্যারাক হয়ে থাকত তাহলে আপনার বা কবির ভক্তদের কেমন মনে হত? আপামর বাঙালির মনের অবস্থাই বা কেমন হত?

যুবরাজের প্রশ্নে নেতাজি বিচলিত হন। স্বাধীন ভারতে পা না রাখলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম আইকন তিনি। বঙ্কিমবাবুর জমানা থেকেই বাঙালি হিন্দু দেশপ্রেমিকরা যে দেশমাতৃকার কল্পনায় বিভোর হন তাতে বাঙালি জাতীয়চেতনা মহাভারতীয় পরিচয়ে প্রায় বিলীন। আদি ভারতীয় অনার্য, অরণ্য সন্তানকুল বা পার্বত্য প্রান্তভূমির জনগোষ্ঠীগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাঁদের চেতনায় ধরাই পড়েনি। আর্যাবর্তের চোখেই অসভ্য, অনার্য-কিরাত, ম্লেচ্ছ-নিষাদদের মহাভারতকে দেখেছেন বাঙালি চিন্তাবিদেরা। কাংলার সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র গৌরাঙ্গপ্রেম হলেও তা মূলত একমুখীই থেকেছে। তাই ঠাকুরবাড়ি বা বসুবাড়ির সঙ্গে তুলনায় কিছুটা বিরক্তই বোধ করেন সুভাষ।

—যুবরাজ, বাঙালিরা পাঠান-মোগলের বিরুদ্ধে কিছু বিদ্রোহ করলেও কোনও রাজতন্ত্রের জন্য লড়েনি। স্বাধীনতার পর অবাঙালি দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেনি। হ্যাঁ, একথা ঠিক এই খণ্ডিত স্বাধীনতা আমি চাইনি। আমার স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত, সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভারত। দেশভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠার পর আমার দাদা শরৎ বসু শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা, যুক্ত বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জিন্না, নেহরু, প্যাটেলরা তা মানেননি। এটাও সত্যি হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত, দাঙ্গা-বিপর্যস্ত বাঙালিও তাকে পাত্তা দেয়নি। অখণ্ড বঙ্গভূমির স্বপ্ন জনমনে শেকড় গাড়েনি। তেমন হলে জোড়াসাঁকো বা এলগিন রোডে সিআরপি-র ঘাঁটি হতো হয়তো। কিন্তু মনে রাখবেন, বাঙালিরাই ভারতীয় আধুনিক জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। অন্যদিকে আপনাদের বিপথগামী সন্তানেরা তাদের ভারতীয় পরিচয়টাই মুছে ফেলতে চায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসটাই অস্বীকার করছে। আইএনএ আর আমাকে পর্যন্ত আক্রমণ করছে। ওরা বুঝতে পারছে না দিল্লি

* দীর্ঘ ১১৩ বছর পর ২০০৪ সালে ভারত সরকার কাংলা প্রাসাদকে ফৌজি দখলমুক্ত করে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষাধিকার আইন আজও বহাল।

মানে ভারত নয়। ভারত ওদেরও। এটাই আমাকে বেদনা দিচ্ছে।

টিকেন্দ্রজিৎ সুভাষের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দুঃখের হাসি।

—মাপ করবেন সুভাষবাবু। আমরা নয় প্রান্তের লোক, মূলভূমির আলোর বৃত্ত থেকে অনেক দূরে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও আমরা ঠাঁই পাইনি। কিন্তু আপনি বা অপরাপর বাঙালি নেতারাই বা কতটুকু জায়গা পেয়েছেন?

ভিন্ন এক কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠেন নীলমণি। খেয়াল করেননি কখন এসে হাজির হয়েছে হাইজাম ইরাবত। হঠাৎ দেখলে অল্পবয়সের মাও সেতুংকে মনে পড়ে। পাতলা শরীর। ধুতি জহরকোট পরনে। এককালে গান্ধী টুপিও পরেছেন। শেষ জীবনে মাও টুপি।

—সমাজতন্ত্র তো আমিও চেয়েছি। আপনার স্বপ্ন সফল হলে লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ানোর পর আপনি কি আমাদের স্বাধীনতা দিতেন? না নেহরু-প্যাটেলের পথেই যেতেন?

আইএনএ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হওয়ার পর ভারতীয় ও মণিপুরী আত্মপরিচয়ের টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পেতে ইরাবত সিংহের অনুগামী হন নীলমণি। রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ সরকার দুইয়ের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজাস্বার্থে পথে নামেন ইরাবত। তাঁর প্রজাসভার সমর্থনে চালের আড়তদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে মণিপুরের মা-মেয়েদের নারী বিদ্রোহ বা নুপিলান আন্দোলনে কেঁপে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইম্ফল উপত্যকা।

শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট হয়ে যান ইরাবত। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশি রাজতন্ত্রের অবসানে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গ হিসাবে অন্য এক মহাভারতের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছামূলক সম্মিলনী এক ভারতীয় ইউনিয়ন। পরবর্তীকালে চীন বিপ্লবের প্রেরণায় এবং বার্মায় কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের উত্থানে উৎসাহিত ইরাবত বার্মা ও মণিপুরের সম্মিলিত এক সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রকল্পে যুক্ত হন। কিন্তু আইএনএ-কে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের মতোই ফ্যাসিস্ত হিটলার ও জাপানি সম্প্রসারণবাদীদের পুতুল ভাবতেন। এই নিয়ে তরুণ নীলমণিদের সঙ্গে তাঁর তর্ক কম হয়নি। আরও অনেকের মতোই ইরাবতের ঐ মনোভাব তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু মণিপুরের ইতিহাসের এই উপেক্ষিত নায়ককে ভুলে যাননি।

নেতাজির সঙ্গে ইরাবতের পরিচয় করিয়ে দেন নীলমণি।

—আপনার কথা আমি শুনেছি যুদ্ধের সময়েই। কিন্তু আপনার কোনও স্বপ্নই তো শেকড় পায়নি। তির্যক সুরেই বলেন সুভাষ।

—সেই মাপকাঠিতে তো আপনিও ব্যর্থ সুভাষবাবু! তাতে কি আপনার আমার স্বপ্নগুলি ব্যর্থ হয়ে যায়? ইরাবতের ঝাঁঝালো প্রত্যুত্তর ভেসে আসে।

ইতিহাস-পুরুষদের পরস্পরবিরোধী স্বপ্নের অভিঘাতে বিড়ম্বিত নীলমণি কথা ঘোরাতে চান। রাত শেষ হয়ে আসছে।

— চলুন নেতাজি, মনোরমা অপেক্ষায় আছে।

যুবরাজ ও ইরাবতের থেকে বিদায় নিয়ে স্থানীয় এক হাসপাতালে ঢোকেন দুজনে। যুদ্ধের সময় অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে ফিল্ড হাসপাতালে ছিন্নভিন্ন দেহ দর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন নেতাজি। কিন্তু এ কোথায় নিয়ে এল নীলমণি। এ তো লাশঘর! পচা লাশের গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। নাক চেপেও বমি আটকানো দায়।

—হ্যাঁ নেতাজি, আমি এখানেই থাকি। আমার মতো অনেক ছেলেমেয়েই এখানে থাকে। লাশের গাদা থেকে উঠে আসতে আসতে একটি মেয়ে গোঙানির সুরে বলে ওঠে। কাছে আসতে লাশঘরের আলোআঁধারিতে সুভাষ দেখতে পান চশমা পরা বেঁটেখাটো মেয়েটি খুঁড়িয়ে হাঁটছে। উলঙ্গপ্রায় সারা শরীর রক্তাক্ত, বুলেটের গর্তে বিক্ষত। বিশেষ করে বুকে ও কোমরের নিচে রক্ত জমাট বেঁধে থকথকে। নীলমণি দ্রুত তার চাদরটা ছুঁড়ে দিলেন। লজ্জাস্থান ঢেকে মেয়েটি কাতরাতে কাতরাতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—তোমার এই অবস্থা কী করে হল মেয়ে?

—২০০৪ সালে মাঝরাতে বাড়িতে হানা দিয়ে জঙ্গি অভিযোগে গ্রেফতারের পর আমাকে ধর্ষণ-খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি ভারতীয় ফৌজিরা। আমার গোপনাঙ্গেও গুলি করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে। ফরেনসিক রিপোর্টে ধর্ষণের চিহ্ন পাওয়া সত্ত্বেও দোষীদের শাস্তি দূরে থাক, সেনা কর্তারা আমাকেই সন্ত্রাসবাদী বলে দেগে দিয়েছে। রাজ্যের তদন্ত কমিশন ফৌজিদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ হাজির করলেও দিল্লির সরকার ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষাধিকার আইনের জোরে মামলা-মোকদ্দমা থেকে রেহাই পায় ধর্ষণকারীরা। দোষীদের শাস্তি আর ফৌজের বিশেষাধিকার আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আমার পরিবার মৃতদেহ নেয়নি। সরকারই জ্বালিয়ে দেয়। এই জন্যই কি আপনি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন? ঝাঁসি রানি ব্রিগেড গড়েছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে?

মনোরমার প্রশ্নে বেদনায়, লজ্জায় গলা বুজে আসে নেতাজির। স্তম্ভিত হয়ে যান। এ কোন্ ভারতে এসে পড়লেন তিনি? চকিতে তাঁর মনে ভেসে ওঠে বাপুর কথা। স্বাধীনতার পথ, হিংসা-অহিংসা নিয়ে মতভেদ, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে বিরোধ যাই ঘটে থাকুক না, তিনিও নিশ্চয় দেশ ও জাতির নামে এহেন বর্বরতা মেনে নিতে পারতেন না। কথাটা নীলমণিকে বলতে মনোরমাও শুনতে পায়।

—আমাদের শর্মিলা তো গান্ধীজির পথেই এত বছর ধরে সেনা বিশেষাধিকার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে দেশের সব রাজবন্দির অনশন মিলেও তো চোদ্দ বছর একটানা ভুখ-হরতাল হবে না। কিন্তু

অহিংসার ধ্বজাধারীরা, বাপুর বিগ্রহপূজারীরা শর্মিলার নীরব একক প্রতিবাদকে আজও কোনও মর্যাদা দিল? এরপরও কি আপনি আমাদের ভারতীয়তায় বিশ্বাস রাখতে বলবেন?

উত্তর খুঁজে পেলেন না সুভাষ। বিপর্যস্ত বোধ করেন। ভাবেন, বাপুর সঙ্গে একবার দেখা করাটা জরুরি। কতকাল দুজনের কথা হয় না। তবে লাহোর জেলে অনশন বন্দি যতীন দাসের মৃত্যুকে ঘিরে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে বাপুর টানাপোড়েন আজও মনে আছে। নিজে বহুবার অনশনে বসলেও দুর্বোধ্য কারণে তিনি যতীনের সমর্থনে মুখ খোলেননি। হয়তো স্বাধীন ভারতের বীভৎস বাস্তবতা পুরোন তিক্ততা এবং অনড় মানসিকতাকে মুছে দিতে পারবে। তবে দুজনেই আজ ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে, বাতিলের দলে পড়া নখদন্তহীন সিংহ। নীলমণি, মনোরমার অশ্রু মোছানোর সাধ্য দুজনের কারুরই নেই। ম্লানমুখে পশ্চাদপসারণের জঙ্গলপথে ফিরে যেতে যেতে নেতাজি ভাবলেন, এ দফায় এখানে না এলেই বুঝি ভালো হত।

তিন

শর্মিলাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ইম্ফলের হাসপাতালে তার বহু পরিচিত ঘরটায়। হাতে স্যালাইনের চ্যানেল খোঁচাখুঁচিতে ফের রক্তাক্ত। মুখে জলগ্রহণেও অস্বীকৃত হওয়ায় নাকে ফের ঢোকানো হয়েছে রাইলস টিউব। ওই টিউবের মাধ্যমেই জবরদস্তি খাদ্য পাঠানো হয় তাঁর পাকস্থলীতে। এভাবেই বাঁচিয়ে রাখা হয় তাকে। মাত্র ৪০ ঘণ্টার মুক্তি পর্বে চোদ্দো বছরের জন্য অহর্নিশ বয়ে বেড়ান ওই রবারের নলটি থেকে নিষ্কৃতি প্রথম মুক্তির অনুভূতি এনেছিল তার মনে।

—আমি এখন মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চাই। ইম্ফলের রাস্তায় ছুটে বেড়াতে চাই বাচ্চা মেয়ের মতো।

৪২ বছরের নেনের খুশির কাকলি শুনে হেসেছিল প্রিয় ভাইঝি রোমা। মনে পড়ে যায় ১৪ বছর আগে দুজনে মিলে হুটোপুটি, ছুটোছুটির দিনগুলো। শেষ সিনেমা দুজনে দেখেছিল শাহরুখের ছবি, দিল তো পাগল হ্যায়। কিন্তু শর্মিলার জীবনটা বদলে গেল ২০০০ সালের নভেম্বরের পর। ওইদিন ইম্ফল উপত্যকার মালোমে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ১০ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটেনি। প্রতিবারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি হয়। জঙ্গিরা পাল্টা খুন জখম চালায়। কিন্তু সেবার শর্মিলার মনে হয় ভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ করা জরুরি। সেনাবাহিনীর বিশেষাধিকার আইন, যা ১৯৫৮ সালে মণিপুরের পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী নাগাল্যান্ডে নাগা বিদ্রোহীদের দমনে লাগু করে নেহরু সরকার, তা প্রত্যাহারের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন তিনি। অচিরেই বন্দি হন। হাসপাতালে আনা হয় জবরদস্তি খাদ্য গেলাতে। না পেরে রাইলস টিউব। সেই থেকে চলছে। মুখ ধুতে গিয়ে পাছে জল গিলে ফেলেন, তাই শর্মিলা দাঁত-জিভ পরিষ্কার করেন স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে। শাসকেরা তাকে জীবন্মৃত বাঁচিয়ে রাখছে। জীবিত শর্মিলাকে ঔদাসীন্য ও নীরবতার প্রাচীরে ঘিরে তিলে তিলে তাঁর আত্মবিশ্বাস, সংকল্পের দৃঢ়তাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে। মৃত শর্মিলা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। তাই তাঁর প্রাণের এত মূল্য। আত্মহননে প্রতিবাদের চরম সীমায় পৌঁছোতে দেওয়া যাবে না তাঁকে।

শর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন চিত্রাঙ্গদা। সঙ্গে দোপদী মেঝেন, থাংজাম মনোরমা আর নীলমণি। পুলিশের নজরদারি, আমলাদের অনুমতির কড়াকড়ি পেরিয়ে হাসপাতালে শর্মিলার সাক্ষাৎ পাওয়া মোটেই সহজ নয়। তবে অনেক কালের অভ্যেসে ওরা চারজন সে বাধা পেরিয়ে এসেছেন।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন শর্মিলা। একপাশে বইয়ের পাঁজা। খলিল জিব্রান থেকে ওরহান পামুক, রবীন্দ্রনাথ থেকে খুশবন্ত সিংহ সবই তাঁর পাঠ্য। বন্দীদশার দুঃসহ বছরগুলিতে বই-ই তার সঙ্গী। চারজনকে দেখে ম্লান হাসলেন। ওরা তাঁর পূর্ব পরিচিত।

পাঞ্চালীর থেকে কোনও সাহায্যের আশ্বাস মেলেনি। নেতাজি ব্যথিত, দুঃখিত। কিন্তু দিল্লির মনোভাব পরিবর্তনে অপারগ তিনিও। ওদের কাছে এসব শুনে কষ্ট পেলেন শর্মিলা। তিনি বুঝতে পারছেন মহাভারতীয় বিবেকের দোরে তাঁর নীরব প্রতিবাদের আবেদন ভোরের শিশিরের মতো স্বল্পায়ু। যতীন দাস থেকে পট্টভি রামালু, অনশনব্রতীদের মৃত্যুতে উদ্বেল হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব পাঞ্জাব ও বাংলা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অন্ধ্র। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের অনেকেরই ভুখ হরতাল করে আঞ্চলিক দাবির সমর্থনে জনমত গড়ে তুলেছেন, শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে বাধ্য করেছেন। কিন্তু প্রান্ত ভারতের প্রতিনিধি বলেই কি আর্যাবর্ত বা বিন্ধ্যের ওপাশের বিস্তীর্ণ দক্ষিণে শর্মিলার প্রতিবাদ কোনও সাড়া জাগায় না? ১৪ বছর জলগ্রহণ না করেও ইন্টারনেটের যুগে শর্মিলা উন্নয়ন-রথে সওয়ার তরুণ ভারতের হৃদয় থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে থেকে গেলেন কেন? কেন?

—কেন এই ঔদাসীন্য ইবোক (ঠাকুমা)? তাহলে এটাই সত্যি মহাভারত, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লির বাইরের ভারতের আমরা কেউ নই? বাকি ভারতের কাছেও আমি দেশদ্রোহী? কোথায় গেল সব বিবেকী কণ্ঠস্বর? এমনকি চৈতন্যদেবের বাংলা, রবীন্দ্রনাথের বাংলাও তো নির্বাক! শর্মিলার জিজ্ঞাসায় অধোবদন চিত্রাঙ্গদা। সান্ত্বনা দেন দোপদী।

—দুখ্ পাচ্ছিস কেনে বহিন। মিলিটারি যখন আমার ইজ্জত নিলেক তখনও উয়ারা দুয়ারে খিলন দিয়া নিদ গ্যাছে। সাবিত্তি দিদি রবীন্দসদনে 'হাম্মা হো' ডাক দিলে উয়ারা হাততালি দিবেক। তা বাদে হিসাব করবে, শর্মিলা কার লোক বটে। উয়াকে বন্ধু মানলে লাভ কি লুসকান! দোপদী মেঝেনের খরবাক্য হাসপাতালের ঘরের ভিতর গুমরে গুমরে ওঠে।

কিন্তু শর্মিলার মর্মবেদনার কারণ আরও গভীরে। ১৪ বছর আগে তাঁর সঙ্গে রিলে অনশনে বসেছিল হাজার দুয়েক মানুষ।

অধিকাংশই নারী। এ দফায় সংক্ষিপ্ত মুক্তির অবসরে ফের ধর্নায় বসলে জনা ছয়েকের বেশি সঙ্গিনী জোটেনি। এমন নয় ইম্ফলের মানুষ, মণিপুরের মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। ইমা বাজার, এশিয়ার সবচেয়ে বড় মহিলা বিক্রেতাদের বাজার যা কিনা মণিপুরের মা-মেয়েদের নুপিলান আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী, সেখানে উপস্থিত নারীদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, আবেগের ঢল নেমেছিল তাঁকে ঘিরে এতদিন পরেও। তবু পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। কোলা বিপ্লব, মোবাইল বিপ্লব, বাজার ও ভোগ বিপ্লবের স্রোত বইছে মণিপুরের রাজধানীতেও। রকমারি মডেলের গাড়ি, মোটর সাইকেল, শপিং মল, সুপার মার্কেটে ভিড় উপচে পড়ছে। এসময় রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্যের পাহাড় নড়াতে ব্যর্থ শর্মিলাকে কি তার স্বজনরাও ভুলতে বসেছে? এই প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে।

চিত্রাঙ্গদা সান্ত্বনা দেন।

—না, মন খারাপ কোরো না ইচে (বোন)। তুমিই আজ মেইতেই জনমনে লাইমারেল, মহীয়সী রানি!

সুর মেলায় মনোরমাও।

—হ্যাঁ, তুমিই দেবী সেনা মেহি, লাইমারেন। আমাদের প্রতিরোধের প্রতীক আজ তুমিই।

আর্তনাদ করে ওঠেন শর্মিলা। সজোরে মাথা নাড়েন। প্রসারিত নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়। ঠোঁট কাঁপে কান্নায়। রক্তাভ চোখ ভরে আসে জলে।

—না। আমি প্রতীক হয়ে বাঁচতে চাই না। আমি কোনও দেবী নই, রাজকন্যা বা রানি নই। নই কোনও বিগ্রহ। বীরপূজা আমি চাই না। আমি এক সাধারণ মেয়ে, ইবোক। আমারও স্বাভাবিক জীবন বাঁচতে সাধ হয়। আমার ইচ্ছেগুলোকে আর লুকিয়ে রাখতে পারি না। ১৪ বছর ধরে তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ভাতের গন্ধে ঘুম আসে না।

সকলেই বোঝে এই কথাগুলির উৎস কোথায়। শর্মিলার জীবনে প্রেম এসেছে। সে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে আর দশজন মানুষের মতোই। বিদেশি সে মানুষটি তাঁর সংগ্রামের সহমর্মী। তাঁকে জয়ী দেখতে চেয়ে অপেক্ষার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। কিন্তু শর্মিলার পরিবারে কেউ কেউ এবং সমর্থকদের অনেকে এই সম্পর্ককে গোপন রাখার জন্য চাপ দিয়ে চলেছে। বিদেশি প্রেমিককে অপমান করেছে, হুমকি দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য : বৃহত্তর আদর্শের স্বার্থে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ-ভালোলাগা-ভালোবাসাকে অস্বীকার করুক শর্মিলা। মানুষের কাছে তাঁর মহীয়সী, আত্মত্যাগী ও আত্মপীড়নের চরম উদাহরণ স্বরূপ কঠোর তপস্বিনী ভাবমূর্তি রক্ষাটা জরুরি। কিন্তু শর্মিলা সামান্যা মানবী রূপেই অসামান্য হয়েছেন। তাই থাকতে চান। তপস্যাচ্যুত তিনি হতে চান না। আবার বিগ্রহ হয়ে বাঁচতে তাঁর প্রবল অনীহা। তাঁর মানবী মন মানে না।

এ দুয়ের টানাপোড়েন থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারে মহাভারত জুড়ে গণবিবেকের প্লাবন, নীলমণি বোঝেন। কিন্তু কোথায় কোন্ জগদ্দল পাথরের তলায় তা রুদ্ধ হয়ে আছে!

পরিবেশটা একটু হালকা করার চেষ্টা করে মনোরমা।

—জানো ইচে, আমাদের মেরি কমকে নিয়ে সিনেমা বানিয়েছে মুম্বাইয়ের সঞ্জয় লীলা বনশালী। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ন্যাড়া মাথায় মেরি কম সেজে বক্সিং করছে রিঙের ভিতরে বাইরে। গোটা দেশে লড়াকু ভারতীয় মেয়েদের একজন আইকন হিসেবে মেরি কমকে তুলে ধরা হচ্ছে। অবশ্য ইম্ফলে আন্ডারগ্রাউন্ড ছবিটা রিলিজ করতে দেয়নি। বলিউডের ছবি তো বন্ধ এখানে অনেকদিনই। কিন্তু দিল্লি-বম্বে কলকাতায় এমন কি গুয়াহাটি শিলঙে সবাই দেখছে। শত হলেও আমাদের ঘরের মেয়ে তো। তাই গর্ব হচ্ছে!

মনোরমার কথায় বোঝা যায় উপত্যকায় নাগা-মেইতেই-কুকি টানাপোড়েন ছাপিয়ে মণিপুরী কন্যার স্বীকৃতি অনেককেই ছুঁয়ে গেছে। শর্মিলা ১৪ বছর বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। সিনেমা দেখতে ভালোবাসলেও সুযোগ নেই। তবু শুনে তাঁর ভালো লাগল।

কিন্তু মনোরমাই প্রশ্নটা তুলল।

—আচ্ছা ইচে, তোমাকে নিয়ে কেন ছবি বানায় না বলিউড? দোপদী মাসিকে নিয়ে কেন বানায় না?

উত্তরটা দিল দোপদীই।

—কেনে বানাবে? আমরা যে সব দেশের শত্তুর লো বিটি! উয়ারা তো সব দেশের লাগর। দেশপেম বেচ্যা খায়।

মনোরমা ঘাড় নাড়ে। শর্মিলার দিকে তাকায়।

—জানো ইচে, মেরি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের পতাকা হাতে দাঁড়াতে দিল্লি-মুম্বাই-কলকাতার কাগজে-টিভিতে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়েছে। কিন্তু ওকে কেউ তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি। তোমার লড়াই নিয়ে ও কী ভাবে তা জানতে চায় নি। যেন তাতে ওর ভারতীয় পরিচয়ে কম পড়ে যাবে। মেরি নিজে ওদের কথা কিছু বলেছে কিনা জানি না। তবে বছর কয়েক আগে যখন ভারতবাসী জানত না, তখন ইম্ফলের কাগজকে বলেছিল: ও তোমার সাহসকে সম্মান করে। মণিপুরের মানুষের জন্যে তোমার ত্যাগ ও মমতাকে ও কুর্নিশ জানায়। একজন মেয়ের কষ্ট আর একজন মেয়ে হিসেবে অনুভব করে। ও তোমাকে বুঝতে পারে। এখন খ্যাতি, অর্থ পাওয়ার পর ওর কি এসব কথা মনে আছে?

শর্মিলা জানেন, মেরি মণিপুরের সমতলে সংখ্যাগুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের নন। অতি ক্ষুদ্র কম উপজাতির মানুষ, ধর্মে অধিকাংশ খ্রিস্টান। এই গোষ্ঠীর মানুষদের গর্ব মেরিকে নিয়ে। মেইতেই স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা মেরিকে নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখাতে না দেওয়ায় তারা ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের আবেদন বৃথা গেছে।

শর্মিলা ওদের কষ্টকেও বুঝতে চান। চান মেরিকে কাছে পেতে।

—ইচে, তুমি একবার যাবে ওর কাছে? ওকে আসতে বলবে?

হাসপাতালের জানালার চিলতে আকাশেও সন্ধ্যা নেমেছে। কুরুক্ষেত্র থেকে কত দূরে মণিপুর। তবু কত কাছে। বড়ো যুদ্ধের মধ্যে কত না ছোট ছোট সংঘাত। চিত্রাঙ্গদা বোঝেন, মহাভারতের কাহিনী আজও শেষ হয়নি।

স্মরণ

বিপন চন্দ্র : ১৯২৮-২০১৪

শমিতা সরকার

স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢাকি

আগস্ট ৩০, ২০১৪ ভারতের ঐতিহাসিক মহলের ইন্দ্রপতন— ৮৬ বছর বয়সে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিপনচন্দ্র। স্বাধীন ভারতের বৌদ্ধিক জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। এ ক্ষতি শুধু ঐতিহাসিক মহলের নয়, ক্ষতি সারা দেশের বৌদ্ধিক জগতের।

ঔপনিবেশিক ভারতের অবিভক্ত পাঞ্জাবের (আজকের হিমাচল প্রদেশের) কাংড়া উপত্যকায় তাঁর জন্ম। প্রথমদিকের পড়াশুনো লাহোরে, উর্দু-মাধ্যমে। লাহোরের ফর্মান ক্রিশ্চান কলেজের স্নাতক দেশভাগের ঝোড়ো হাওয়ায় হলেন ভারতবাসী। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন। তবে অনেকেই জানেন না যে রুশ-মার্কিন ঠান্ডাযুদ্ধের জমানায় সেনেটর ম্যাকার্থির কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রোশের বলি হয়ে তাঁকে ভারতে ফিরতে হয়।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তিনি দিল্লীর হিন্দু কলেজের অধ্যাপক— সেসময়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসা ছাত্রদের সৌজন্য মুলক সম্ভাষণ থেকে মুক্ত করে কাছের মানুষ করতে শিখিয়েছেন— অধ্যাপক অর্জুন দেব স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—''কল মি বিপন''।

১৯৫৯ সালে *এনকোয়ারি* পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করছেন তাঁর মার্কসবাদী বন্ধু লেখক-চিন্তকদের নিয়ে, যে পত্রিকাটি পরে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৯৬৬ সালে পিপলস্ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পিএইচডি গবেষণাপত্র : 'রাইজ এন্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া : ১৮৮০-১৯০৫'।

প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদীরা কীভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক সমালোচনা করেন এবং কীভাবে তা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটি মতাদর্শগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই গ্রন্থে সেই বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমদিককার ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে ভারতের অবশিল্পায়ন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অধ্যাপক চন্দ্রের মনে বারবারই অনুরণন তুলেছে। মার্কিন গবেষক মরিস ডি মরিন যখন ঔপনিবেশিক শোষণ বা অবশিল্পায়ন আদৌ হয়েছিল কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন বিপন চন্দ্র তার এক কঠিন প্রত্যুত্তর দেন ১৯৬৮-র *ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ* পত্রিকায়। আজ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাঠক্রমে এই বিতর্কটি তার স্থান করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেছেন, এই লেখাটিই তাঁকে প্রথম উনবিংশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে তিনি তার সেন্টার ফর হিস্টরিকাল স্টাডিস্ বিভাগের দায়িত্ব নেন রোমিলা থাপার ও এস গোপালের সাথে। বিপনের স্বপ্ন ছিল এ হবে এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অধ্যাপক ও পিওন এক টেবিলে বসে চা খেতে দ্বিধা করবেন না। আজও এদেশে ছাত্রছাত্রী গবেষক বুদ্ধিজীবীদের কাছে জেএনইউ-এর উদার মানসিকতার যে আকর্ষণ বোধহয় বিপনের মতো মানুষদের উত্তরাধিকার হিসেবেই পাওয়া।

'৭০-এর দশকে এনসিইআরটি-র (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) জন্য স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনায় মন দিলেন বিপন। ঔপনিবেশিকতা ও ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বিষয়ে একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এটি আজ শুধু স্কুলপাঠ্য নয়, স্নাতক এমনকি স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজও অবশ্যপাঠ্য। যদিও এটি অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রোষে পড়ে প্রথম থেকেই। তাতে বিপনের লেখনী থামানো যায় নি। আরএসএস-এর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা'— ইতিহাস শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার প্রয়াসের এক অসামান্য দলিল। ২০০১ সালে প্রথম বিজেপি সরকার ঐ বইকে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাদ দিলেও আজও ছাত্রদের কাছে তা সমাদৃত এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। সেই সত্তরের দশকের শেষ থেকে বিপন সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সোচ্চার ও অঙ্গীকারবদ্ধ। পরবর্তীকালে তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে প্রকাশিত হয় *কমিউন্যালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া* গ্রন্থে (১৯৮৪)।

প্রায় একই সময়ে তিনি এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেন। অমৃতসরে ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে গান্ধীর আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা যে সমঝোতা হিসেবে দেখেছিল তার একটা পূর্নমূল্যায়ন করেন তিনি, যেখানে তিনি একে দেখেছেন একটি মাইনোমিউডাল কার্ড-এর আকারে, চাপ সৃষ্টি - সমঝোতা - চাপ সৃষ্টির ঘটনাবলী দিয়ে, 'লংটার্ম ডাইনামিক্স অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট' নামক প্রবন্ধে।

বোধ হয় এই সময়ের কিছু আগে থেকেই বামপন্থীদের থেকে তাঁর অবস্থানগত দূরত্বের শুরু। ১৯৮১ সালে জেএনইউ-এর জার্নাল *স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি*-তে 'লেফ্ট ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে তিনি ভারতের বামপন্থার ইতিহাস সম্পর্কে সমালোচনামূলক অবস্থান নেন। পরবর্তীকালে *সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট* পত্রিকার আয়োজিত এক সেমিনারেও তিনি এই নিয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন।

১৯৮৭ সালে আদিত্য মুখার্জী, মদুলা মুখার্জী ও অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পাদিত *ইন্ডিয়াজ স্ট্রাগ্‌ল ফর ইনডিপেন্ডেন্স* বা তারও পরবর্তীকালে সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে রচিত পাঠ্যপুস্তক

এর পর ১৩৬ পৃষ্ঠায়

স্মরণ

দুঃসাহসী বিন্দু

সুনন্দন চক্রবর্তী

কিন্তু তবু বুকে তাঁর সিন্দুর চেতনা। এইভাবে আমরা ভাবতে শুরু করতে পারি নবারুণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে। বেপরোয়া মেজাজেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নবারুণ। বেপরোয়াই চলে গেলেন। তাঁর লেখক জীবনের প্রথমার্ধে তাঁর কবি পরিচিতিই পাঠককুলের কাছে আদৃত ছিল। হারবার্ট পরবর্তী লেখার কালে তিনি মূলত একজন রোখাচোখা গদ্যকার হিসেবে বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে থাকেন। সেটা তাঁকে না দেবার বুকের পাটা বাঙালি পাঠকের হয়নি। বিশেষত ফ্যাতাড়ু আর কাঙাল মালসাট খোকা গদ্যের অশোক বনে যে পরিকল্পিত অশিষ্ট হামলা চালায় তাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। গদ্যে এবং পদ্যে, দুটিতেই নবারুণ শানিত, বিস্ফোরক, স্পর্ধিত, সংক্ষুব্ধ, লড়াই ক্ষ্যাপা। তবে আমার মনে হয় কবিতায় তিনি অনেক বেশি একটি বয়ে আসা ধারার সংগে যুক্ত। গদ্যে তাঁকে নিজের রাস্তা কেটে বের করে নিতে হয়েছে। বিষয়বস্তুতে এবং ভাষায় সেই জন্যেই হয়ত নবারুণের ঘোষিত যুদ্ধ রয়েছে যেসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তাঁদের মধ্যেও জনপ্রিয় নবারুণ। গদ্যকার নবারুণ। ফ্যাতাড়ু এবং কাঙাল মালসাটের লেখক নবারুণ। বিপ্লবেরও (অ)শোভন সংস্করণ হয়। নবারুণের কবিতা একটা সোজা সাপটা রাজনৈতিক মোকাবেলা। ব্যারিকেড উঠেছে, বন্দুকের নলের মতো নবারুণ উঁচিয়ে ধরেছেন তাঁর কবিতা। আপনি হয় এদিকে আছেন নয় ওদিকে। জটিলতাহীন এইসব মূহূর্ত ইতিহাসে বিরল। ঘটনাচক্রে এরকম সময় যাদের ছুঁয়ে যায়— একদিন বা এক দশক— তাদের দেহকোষের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে যায় একটা অস্বীকারের বয়ান। উগ্রতায়, তীব্রতায়, অসহিষ্ণুতায়, এমনকি হয়ত বালখিল্যতায় অপরিচিত মনে হতে পারে এই বয়ান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। নবারুণের কবিতা এই অতিকথনের পরম্পরায় মধ্যে স্থিত। তাঁর গদ্য আরও অনেক সেয়ানা, জটিল, বহুমতসহিষ্ণু। খেয়াল করলে দেখা যাবে যদিও নবারুণ এর প্রথম গল্প বেরিয়েছিল সেই ১৯৬৮-তেই, হালাল ঝান্ডা-র গল্পগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল ১৯৮৭-তে, তবু ১৯৯২-এ হারবার্ট প্রকাশিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার প্রধান গদ্যলেখকদের মিছিলের সামনের সারিতে তাঁকে দাঁড় করানো হয়নি। আর কে না জানে তাঁর প্রবাদপ্রতিম কবিতা, *এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না* বেরনো এবং হারবার্ট লেখার মধ্যের এই দুই দশক ধরে দেখতে হচ্ছিলো বামপন্থী বিপ্লববাদের ক্রমাগত বিপর্যয়, ঘরে এবং বাইরে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর ধ্বসে পড়া ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ক্রমাগত প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করছিল মার্কসবাদকে, তাঁর বিশ্বাসের কাঠামোর সবচেয়ে বড় খুটিটাকে। স্বভাবতই তাঁর গদ্যের কোন উপায় ছিল না তাঁর কবিতার মতো অপাপবিদ্ধ থেকে যাবার।

১৯৯৪ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবেশ রায় একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সহ নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি কথোপকথন প্রকাশ করেন *প্রতিক্ষণ* পত্রিকায় মে মাসে। ২০০৪ সালে *মল্লার* পত্রিকায় নবারুণ একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেটির শিরোনাম ছিল: 'দুনম্বরী একটা সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি'। ১৯৯৮ সালে *তথ্যকেন্দ্র* পত্রিকায় জুন সংখ্যায় 'উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমি লিখি না' শীর্ষক সাক্ষাৎকারেও তিনি নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে কিছু কথা বলেন। সম্প্রতি *অক্ষরেখা* পত্রিকা তাঁদের নবারুণ সংখ্যায় এই সমস্তগুলিকে একসঙ্গে প্রকাশিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এগুলিতে একাধিকবার নবারুণ বলেছেন যে কবিতা এবং গদ্য, উভয়ের প্রতি তিনি সমান অনুরক্ত এবং দুটিই তিনি সমানে লিখছেন, যদিও কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি একটু শিথিলতা দেখিয়ে ফেলেছেন। সেটা সংশোধন করে নেওয়া দরকার। তবু তাঁর প্রথম প্রেমকে কুর্নিশ জানিয়েও আমাদের বলতে হবে লেখক জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে নবারুণ মূলত গদ্যশিল্পী। আমি তাঁর দুটি সত্তা নিয়ে আলাদা করে কথা বলার অনুমতি চাইছি।

দেখো, আকাশের উত্তোলিত হাতে সূর্যের গ্রেনেড

নবারুণ প্রধানত সত্তর আর আশির দশকের কবি। সেটা শুধু এই কারণে নয় যে ওই সময়েই তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। সেটা এই কারণেও যে ওই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকেই তাঁর কবিতাগুলি উৎসারিত। ওই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে বোধহয় কেবল দুরকম আগুন দিয়েই কবিতা লেখা যেত। ভালবাসার আর বারুদের। সেরকমটাই লিখছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিলেন রাম বসু আর মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। জটিল আগুনের অক্ষরমালা আঁকছিলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য, রাগ আর শ্লেষের কিরিচ শানাচ্ছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিপ্লবের কুহক আর রোমাঞ্চ ডাক দিচ্ছিল মৃদুল দাশগুপ্তকে, জেলখানার দেওয়ালে বড় হরফের কবিতা ফুটিয়ে তুলছিলেন সমীর রায়, জেলের মধ্যেই দ্রোণাচার্য ঘোষ পুলিশের লাঠিতে নিহত হচ্ছিলেন কবিতা লেখা অসমাপ্ত রেখে। জেলের মধ্যেই খুন হচ্ছিলেন তিমির। সেই শোকের আঁচ পর্বান্তর ঘটাচ্ছিল তাঁর শিক্ষক শ্রী শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতায়। আর কবিতা এবং বিপ্লবের সর্বক্ষণের কর্মীদের প্রথম পুরুষ সুভাষ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করছিলেন, 'ছেলে গেছে বনে'। এই কবি কমরেডদের মিছিলেই অকুতোভয়ে তাঁর হালাল ঝান্ডা তুলেছিলেন নবারুণ। না ভুল বললাম। লাল ঝান্ডা তুলেছিলেন। হালাল ঝান্ডার জন্যে আমাদের তাঁর গদ্য অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। আমি আগুনে কবিদের এই অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করছি এটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে যে বেপরোয়া হিম্মত নিয়ে কবিতার গ্রেনেড হাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসার সময় নবারুণকে একাকীত্ব সইতে হয়নি। নতুন কোনও লব্‌জও তাকে তৈরি করে নিতে

হয়নি। বিশ্বাস এবং চিত্রপ্রতিমার একটি সাধারণ ভাণ্ডার ছিল, যে অনন্ত উৎসে ফিরে যেতে কোনও বাধা ছিল না। সেই কবিতার ঋতু প্রতিস্পর্শী মেজাজের, কিন্তু বিপ্লবের রক্ত তখনও কলুষিত হয়নি। ফলে সেই প্রতিস্পর্ধায় একটি কিশোরসুলভ কমনীয়তা ছিল, চোয়াড়েপনা ছিল না।

তাঁর বিখ্যাততম কবিতায় নবারুণ যখন বলেন 'যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়/আমি তাকে ঘৃণা করি', তাঁর সেই উচ্চারণে সমপরিমাণ মর্মবেদনা মিশে থাকে ওই অসহায় পিতার প্রতি। এই কবি যে নিকানো, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত দেশের স্বপ্ন দ্যাখেন তাতে একটিও রূঢ় শব্দ নেই।

আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব
বুকের মধ্যে টেনে নেব কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল ও ভাসান
সমস্ত শরীর ঘিরে জোনাকি না পাহাড়ে পাহাড়ে জুম
অগণিত হৃদয় শস্য রূপকথা ফুল নারী নদী
প্রতিটি শহীদের নামে একটি তারকার নাম দেব ইচ্ছেমত
ডেকে নেব টলমলে হাওয়া রৌদ্রের ছায়ায় মাছের চোখের মতো দীঘি
ভালবাসা— যার থেকে আলোকবর্ষ দূরে জন্মাবধি অচ্ছুৎ হয়ে আছি
তাকেও ডেকে নেব কাছে বিপ্লবের উৎসবের দিন

এমনকি শাসকের সমস্ত নিষ্ঠুরতার প্রত্যুত্তরে তিনি যে যুদ্ধঘোষণা করছেন তার মধ্যেও কোনও কর্কশতা নেই। মানুষের ভালবাসা তখনও তাঁকে আর তাঁর প্রিয় কমরেডদের ঘিরে রেখেছে অভেদ্য কবচকুণ্ডলের মতো। তিনি জানেন, মারা গেলে বাংলার সব কটি মাটির প্রদীপে শিখা হয়ে ছড়িয়ে যাবেন। বাংলার উপকথা আর বাংলার সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাপনের নানা মাঙ্গলিক চিহ্ন তখনও ছড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায়। তাঁর মজ্জার মধ্যে থাকা রোমান্টিকতাকে তিনি প্রাণপণে বারুদরচিত করতে থাকেন যাতে কবিতার মলোটভ ককটেল আগুনের আকাঙ্ক্ষাতে আছড়ে পড়তে পারে, যাতে একটি কুড়ি বারুদ গন্ধে মাতাল হয়ে ফুটতে পারে। তখনও তিনি ভিয়েতনামের ওপর এমন একটা কবিতা লিখতে চাইছেন যেখানে কতগুলো বাচ্চা ছেলে একটা খোলা জীপে বসে হো চি মিন নগরে ঢুকছে, হাতে তাঁদের একটা ফ্ল্যাগ আর সাবমেশিনগান। ২০১১ সালে কিষেণজি নিহত হওয়ার পরও যখন কবিতা লিখবেন নবারুণ তাঁর শহিদের পবিত্র শোক প্রকাশের জন্যে তাঁকে নিসর্গের নৈকট্য চাইতে হবে। একটি অশিষ্ট শব্দ দিয়ে শহিদের মৃত্যুকে তিনি লঘু হতে দেবেন না। এই বুলেটপ্রুফ কবিতাই তাঁর অভিজ্ঞান। এই আমলে সেলিব্রেটিদের নিয়ে বা ছোট্ট ফাসিস্তকে নিয়ে তিনি দু-চারটি শ্লেষ-বিষাক্ত কবিতা যে লেখেননি তা নয়। কিন্তু তাঁর কবিতা জামার বোতাম খুলে সিনা টান করে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতেই অভ্যস্ত। মানুষের পক্ষ নিয়ে দ্রষ্টার গলায় কথা বলে যে কবিতা সেই কবিতাই তাঁর উত্তরাধিকার। বন্ধ কল-কারখানা নিয়ে লেখা কবিতায় নবারুণ বলছেন—

কবিতার কারখানায় আমিও একজন সাধারণ মজুর
মেঘের ওভারল পড়ে বাড়ি ফিরি
তাই পার্থ, ছেপে দিও ম্যানিফেস্টোতে
বন্ধ কল-কারখানা নিয়ে কবিতা যদি লিখতেই হয়
তাহলে পাঠিয়ে দেব— কালো পাতা, মর্গের রোদ্দুর
জেলের বিকেল, বাতিল টিকিট, ক্রাচ, ফাঁকা স্কুল
টিবি-র রক্তশূন্য মুখ, মরছে পড়া ব্লেড

আর এইসব হাহাকার ও দুঃখী চিত্রকল্পের এক্স-রে করলে দ্যাখ্যা যাবে—

পুঁজির ফুসফুসে এক হিংস্র ঘাতক ক্যানসার
ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষিপ্রতায় সমাজব্যবস্থার দেহে
এবং এই অমোঘ ও নিশ্চিত মৃত্যু আমি
গভীর, গভীরতম আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছি।

দুষ্ট, দীর্ণ, নিষ্প্রভ এই জীবনকেও কিন্তু নবারুণ বর্ণনা করছেন যেসব টুকরো ছবি দিয়ে প্রত্যেকটিতে লেগে আছে বিষণ্ণ মমতা। আর এর মধ্যেই তাঁর চোখে পড়ছে এই ব্যবস্থাটা ধ্বংস হবার একটা আশ্বাস যা দ্রষ্টা কবিদের ঐতিহ্য।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যেমন বলেছেন তেমনি ব্যক্তিগত ম্যানিফেস্টো কবিতায় বলেছেন তাঁকে মুছে ফেলার বা সরিয়ে দেওয়ার যে সরকারি উদ্যোগই হোক না কেন

...হঠকারী, বেহিসেবী, গোল্লায় যাওয়া, খতরনাক
বেপাত্তা, হাঘরে, ফেরার, স্বপ্নচারী—
এদের পাশ থেকে আমাকে
কোনোদিনও তুমি সরাতে পারবে না।

এই হাঘরে, ফেরার স্বপ্নচারীদের যে দুনিয়ার কথা নবারুণ আমাদের বলবেন তা এক অন্য পাঠক্রম, লক্ষ্যও সম্পূর্ণ আলাদা।

লেখক নবারুণ আরেকটি যাত্রা সম্পন্ন করেছেন প্রায় অলক্ষ্যে। তাঁর কবিতার যে বক্তা বা তাঁর প্রথম দিকের গল্প উপন্যাসের যেসব চরিত্র তারা আমাদের মধ্যবিত্ত বৃত্তেরই। তাদের আর আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ একই। আমরা মোটামুটি একই ইতিহাসের বাসিন্দা। এমনকি হারবার্ট-এর পৃথিবীও সম্পূর্ণ আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। গোটা আখ্যানে একটিও চরিত্র পাওয়া যাবে না যে আমাদের একদম না দ্যাখা। ভোগী-তে আমরা প্রথম একটা দুনিয়ার আভাস পেলাম যা আমাদের গোটা হয়ে ওঠাটাকে প্রশ্ন করে। ভোগী তার সহজিয়া জিজ্ঞাসায় শুধু আমাদের শহুরে ভোগবাদকে যে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তা নয়, আমাদের যুক্তিবাদকেও একটা সংশয়ের দিকে ঠেলে দেয়। *অটোতেও* নবারুণ আমাদের মধ্যবিত্ততার ঠিক তলায় কাহিনীটিকে স্থাপন করেন। মনুষ্যত্ব ঠিক কতখানি নিষ্পেষিত হবার পর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে তা রাষ্ট্রযন্ত্রের জানা না থাকলেও নবারুণ জানেন। কিন্তু এই চন্দনও পুরোপুরি আমাদের বৃত্তের বাইরে নয়। আমাদের আর চন্দনদের জীবন কখনও কখনও পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়। কিন্তু বড়িলাল, মার্শাল ভদি বা বেচামণি নরকের সেই বৃত্তে রয়েছে

কোনও দর্শনার্থী সেখানকার খবর নিয়ে অদ্যাবধি আমাদের কাছে নিয়ে আসেনি। সেখানে জীবনের প্রবল শারীরিক অস্তিত্ব অমিতবিক্রমে কদর্যতার মধ্যে থেকে আনন্দিত হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগাড় করছে প্রতিনিয়ত। আমরা আমাদের শালীন রুচিবোধ থেকে আমাদের ভণ্ড সভ্যতা দিয়ে যেসব সুভদ্র উষ্মা প্রকাশ করা নিয়ে ইতস্তত করছিলাম, হতভম্ব হয়ে দেখলাম মার্শাল ভদিরা নির্দ্বিধায় সেইসব ভণ্ডামির মুখে পেচ্ছাপ করছে। আমাদের আত্মার একটা অংশে সুখের বাতাস বয়ে যায়। কিন্তু একটা অংশ কণ্টকিতও হয়ে থাকে। নবারুণ বলেছেন কেন তিনি হারবার্ট বিস্ফোরণে শেষ করতে চাননি। তাঁর শ্রদ্ধার ঔপন্যাসিকদের থেকে তিনি শিখেছেন আখ্যানে জীবনের চলমানতার একটা বোধ থাকা দরকার। কাঙাল মালসাট নিয়ে আমার একটা অস্বস্তি, যেখানে কাহিনী শেষ হলো তারপর আমরা কোথায় যাব?

আমার আরেকটা অস্বস্তি এই প্রবল রোলারুলি এবং খিস্তিখাস্তার তোড়ে কি তাহলে ভেসে গেল যুদ্ধ পরিস্থিতি? হারবার্ট লেখার মাত্র দু বছর পরেই তো লেখা হয়েছিল এই উপন্যাস? রণজয় মেধাবী ছাত্র। সত্তর দশকের মেধাবী ছাত্রদের একটা বড় অংশ যেমন সেও তেমনি চারু মজুমদারের আহ্বানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াইয়ে নামে। ধরা পড়ার পর কুৎসিত অত্যাচারের ফলে পাগল হয়ে যায় রণজয়। ১৯৯৪ সালে যখন শুরু হচ্ছে এই আখ্যান, তখন তার ছেলের বয়স চব্বিশ। স্তালিনের ছদ্মনামে ছেলের নাম রেখেছিল রণজয়। রণজয় আটকে রয়েছে তার ধরা পড়ার আগের সময়টিতেই। কালী পূজার রাতে এসাইলাম থেকে পালায় রণজয়। লক্ষ্য তার লুকিয়ে রাখা দুটি রাইফেল সংগ্রহ। কোবা আর রণজয়ের স্ত্রী মেখলা বাদে চারটি মুখ্য চরিত্র। রণজয়ের গেঁজিয়ে যাওয়া বন্ধু পার্থ, রণজয়ের শিষ্যপ্রতিম কৌশিক, ডক্টর দাম— অ্যাসাইলামের মরমী প্রধান, এবং বসাক— প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, যে রণজয়ের পীড়নকারীদের অন্যতম, এখন সফল ব্যবসায়ী। স্মৃতিভ্রষ্ট হলেও রণজয় একবার ডাক্তারের চেম্বারে অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়ার পর একটা নিড়ানি দিয়ে আক্রমণ করেছিল বসাককে। রণজয়ের পালানো আর কৌশিকের তাকে খুঁজে পাওয়ার পরিসরটুকুতে সেই সংক্ষুব্ধ দশকের গল্পের একটা টুকরো বলেন। শুধু ঐ দশকের নয়, তার আগের সোভিয়েত বিপ্লবের দিনগুলো আর চীন বিপ্লবেরও। এক শতকের মুক্তিকামনার গানের অনুরণন দিয়ে গাঁথা হয় মুহূর্তগুলি। এ আখ্যানে যে কবিতাগুলি ব্যবহার করেন নবারুণ সেগুলি তাঁর 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' সংকলন থেকে নেওয়া। নির্মাণের দিক দিয়ে চমৎকার। সেই দশককে মোহহীন অথচ গভীরভাবে দেখার এমন খুব বেশি চেষ্টা হয়েছে বলে তো মনে পড়েনা।

কে আমাদের বেশি বিচলিত করে, কাঙাল মালসাট না যুদ্ধ পরিস্থিতি? নবারুণের মতোই আমিও পক্ষাবলম্বনের পক্ষে। কাঙাল মালসাট আমাদের ভণ্ডামিগুলি নিয়ে বটকেরা করে। যুদ্ধ পরিস্থিতি নবারুণের কবিতার মতোই সরাসরি আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করে— কমরেড আপনি কোন দিকে?

বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি

১২০ পৃষ্ঠার পর

—আমার বাড়ি ওটা। আসবে তুমি।

সে দরাজভাবে বলে আনন্দ পেত। বরং বাবা আমার বাড়িতে শেষজীবনে সংসার পেতেছিল বলে রেগে থাকত সর্বদা। বাবা ওর বাড়িতেই মারা যায় বলে খুব খুশি হয় ও।

বাবা মারা যাবার পর মা একথাই কেঁদে বলছিলো একদিন— তোরা একভাই বোনের মুখ দেখবি না, বোন ভাই-এর নাম শুনলে গম্ভীর হয়ে উঠবি। অন্যজন সবার বড়ো, নির্বিকার, নির্লিপ্ত। আমি এখন কোথায় থাকি? কার-কার বাড়িতে ঘুরে বেড়াই? বাবার জমি তো পড়েই রইলো, আমার কোনো বাড়ি হলো না।

শুনে আমি চুপ। দাদা, মেজদা দুজনেই সমস্বরে বললো— ওসব ঝামেলা মিটে যাবার পরও তোমরা অনেক সময় পেয়েছিলে, আমরা বাড়ি করে ফেললাম, তোমরা পারলেনা? এসব কাঁদুনির কোনো মানে নেই।

মা চুপ করে গেলেন।

বাবার জমিতে যে বাবা-মা বাড়ি তুলে যেতে পারেন নি, সেটা তাদেরই দোষ, প্রতিষ্ঠিত হলো।

আমি তখন বাবার পায়ে প্লাস্টার করা পুলিশ হাসপাতাল ফেরত বিধ্বস্ত মূর্তিটিকে মানসচক্ষে দেখছিলাম।

আমার যে বাবাকে রণে গুহ তুলে নিয়ে গেছিলো, তাকে আর আমি কখনও ফেরত পাইনি— একথা আমি জানি।

আমার সেই স্নেহদুর্বল আদর্শবাদী ভাইদেরই কি ফেরত পেয়েছি, না আমি সেই আগের আমি? যে দিন যায়, তা একেবারেই যায়। দিনের সব তারা রাতের অন্ধকারে থেকে যায়, একথা রবি ঠাকুর বললেও সত্যি নয়। রাত কখনো এত অন্ধকার, যে সেখানে তারা থাকে না। থাকলেও এত দূরে, সেখান থেকে আলো এসে পৌঁছায় না।

চার

বাবা মারা যাওয়ার পর মেজদা চেয়েছিল সবার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে জমিটা প্রেমোটারকে দেবে। আমি সই দিইনি পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে, হয়তো সবাইকে অসন্তুষ্ট করেই। বদলে দেখতে এসেছিলাম বাবার সেই জমি। ঠাকুর্দারা বাড়ি ভেঙে যার যার বাড়ি তুলে সুখে আছে। বাবার জমি পড়ে আছে পরিত্যক্ত, একা। আগাছা আর নোংরায় ঢেকে গেছে জমি। লোকে কিছু কিছু সীমানা বাড়িয়ে দখলও করেছে। আগাছায় ভরা সেই জমিকে পনেরর বদলে পাঁচ কাঠার মতো ছোটো দেখাচ্ছে। গাছ নেই, পুকুর বুজে গেছে, কদমগাছ মরে গেছে, জাম গাছের চিহ্নও নেই— একটা পাখিও নেই।

একদিন বিপ্লবের জন্য এ জমি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো মা-বাবা— সে জমিতে এত আগাছা জন্মেছে? আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো ভাবতে ভাবতে। ভাবছিলাম, এই কান্না কি আর ওই বুজে যাওয়া জলাশয়কে আবার ভরে তুলতে পারবে? দুৎ, তাই কি হয় নাকি?

ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে-র জীবনের উপলব্ধি

মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত

ডঃ অমলেন্দু দে একজন প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ ছিলেন। চলে গেলেন ৮৫ বছর বয়সে। ইতিহাস-চর্চায় ওনার ভূমিকার বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ অমলেন্দু দে-কে যেভাবে দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলব। ওনার বেশ কিছু উপলব্ধি যা আমি ওনার কাছে শুনেছি, তা বলব।

গত ১৮ জানুয়ারি অর্থাৎ মৃত্যুর চার মাস আগে ওনার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলেছিলাম। উনি শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলেন। আমি তা ভিডিও রেকর্ড করছিলাম। ওনার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে উনি বলছিলেন যে সারা জীবন কঠোর সংগ্রাম করেছেন। লেগে থেকে সততা নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। মানুষের জন্য লেগে থেকে কাজ করলে সাফল্য আসে।

ইতিহাসবিদ অমলেন্দুবাবুকে আমি দেখেছি একজন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। অমলেন্দুবাবুর জীবন অনেকটাই তো কেটেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। পড়াশোনা চালাবার সংগ্রাম, চাকরি পাবার সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সব সংগ্রামের ক্ষেত্রে ওনার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ওনার যেমন আকর্ষণ ছিল তেমনি অনেক প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে মনে ক্ষেদ ছিল, যা উনি ১৮ জানুয়ারির সাক্ষাৎকারে বলেই গেছেন।

সাক্ষাৎকারে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যৌবনে মার্কসবাদী আদর্শ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাম আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সক্রিয় ছিলেন। এখন এই বয়সে এসে কী মনে হয়? উনি উত্তরে বললেন, যে উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই বাম আন্দোলন সফল হয় নি। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, এখন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সূত্রগুলো নেই। সমাধানের উপায় হিসাবে বললেন যে মানুষের জন্য কাজ করা দরকার, প্রো-পিপ্‌ল কাজ। শুধু কর্তব্য নয়, ভালোবাসা থাকতে হবে।

উনি মনে প্রাণে কমিউনিস্ট ছিলেন বলেই বাম দলগুলোর নানা ভ্রান্তি ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে নানা উপলব্ধি বলতেন। আমার মনে হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শের বিচ্যুতি, বামপন্থী দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আদর্শগত বিচ্যুতি ওনাকে পীড়িত করেছে। তার ফলেই বাম দলগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব আচরণ করেছে সে সম্বন্ধে একান্ত আলোচনায় আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন যে ''আমাদের দেশের বাম পার্টির কাজ হল ক্লাস স্ট্রাগল্ উইথ ফ্রেন্ডস্ আর ফ্রেন্ডশিপ উইথ এনেমিজ'। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার নিরিখে সখেদে এই কথাগুলো বলেছিলেন।

ওনার যৌবনে, সম্ভবত ১৯৪৯-৫০ সালে, উনি পার্টির কাছে বলেছিলেন যে পার্টি থেকে যেন কয়েকশো যুবককে চীনে পাঠিয়ে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসা হয়। উনিও সেই দলে থাকতে চেয়েছিলেন। সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপ পায় নি। জীবনের শেষ প্রান্তেও এই ইচ্ছা সফল না হওয়ার আক্ষেপ আমি ওনার মুখে শুনেছি। এই ভাবনার কথা উনি বলতেন, কারণ উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের দেশে বাম দলগুলি যেভাবে চলছে তাতে তারা যে কোন মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। একটা কথা বলতেন '৯০-এর দশকের সময়। তা হলো, রাজনীতির যা অবস্থা হচ্ছে তাতে যদি ৪-৫ জন সশস্ত্র গুন্ডা কোন দলের হয়ে বাঘা যতীন মোড়ে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে দেখবেন সবাই ছত্রখান হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পকেটে অস্ত্রের সম্ভার এবং অস্ত্রসজ্জিত দুষ্কৃতি এবং মৌলবাদী শক্তির দাপটে বামপন্থীদের ফোলানো ফাঁপানো অবস্থা খুব সহজেই চুপসে যেতে পারে, এই রকমই পূর্বাভাস দিতেন।

ইতিহাসের শিক্ষা কীভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সাহায্য করতে পারে তার বিশ্লেষণ ওনার কাছে শুনতাম। যেমন উনি আমাকে বলেছিলেন, যদি দেখেন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী আর জ্যোতি বসু উপপ্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তাহলে অবাক হবেন না। এটা '৮০-র দশকের শেষের কথা। অর্থাৎ আমাদের দেশের রাজনীতির গতিমুখ সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল— যা ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সঙ্গে অনেকটাই সাযুজ্যপূর্ণ। আর একটা কথা মনে পড়ছে। ২০০৬ সালের ৯ ডিসেম্বর থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে কোটনিস দিবস অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঐ সময় সিঙ্গুর নিয়ে মমতা ব্যানার্জীর অনশন চলছিল। হল থেকে বেরিয়ে উনি আমাকে বললেন, সিঙ্গুর সিপিএম-এর ওয়াটারলু না হয়ে যায়! কেমন এক ভবিষ্যৎবাণীর মতন মনে হয়।

তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় রাখার ব্যাপারে ওনার স্পষ্ট মত ছিল। এ ব্যাপারে উনি শিবনারায়ন রায় ও অন্যান্যদের সঙ্গে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে উনি বলিষ্ঠভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি পদক্ষেপ সম্বন্ধে একেবারেই একমত হতে পারেননি। আজ তো আমরা বুঝি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কী হাল হয়েছে আমাদের দেশে এবং রাজ্যে।

উনি আর একটা বিষয়ে মাঝে মাঝে বলতেন। সেটা হলো, বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ ঘটছে। উদ্দেশ্য হলো বমপন্থী শক্তি এবং চিন্তাকে ক্রমশ দুর্বল করা এবং আঘাত করা। এই ব্যাপারটা ঘটানো হচ্ছে ৩০-৪০ বছর ধরে। এই কথাগুলো আমি অমলেন্দু বাবুর কাছে শুনেছি '৮০র দশক থেকে। তখন

অত বুঝতাম না। কিন্তু এখন বাস্তবে যা ঘটছে তা বোধ হয় ওনার আশঙ্কার মূর্ত রূপ। উনি আফশোস করতেন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই বিষয়ে ভাববার বা বিশ্লেষণের কোন সুনির্দিষ্ট সেল বা উদ্যোগ নেই।

চীনের আধুনিক কিছু বিষয় নিয়ে উনি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মেটেরিয়াল সভ্যতার পাশাপশি স্পিরিচুয়াল সভ্যতার কথা ওনার মনে ধরেছিল। এই আধ্যাত্মিক সভ্যতা'-র কথা যা চীন বলছে সে বিষয়টাকে উনি সমর্থন করতেন। এই বিষয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম যে 'আপনি কি আধ্যাত্মিক সভ্যতা' বলতে অতীন্দ্রিয় কিছু বলতে চাইছেন।' উনি বললেন যে অতীন্দ্রিয় নয়, মূল্যবোধভিত্তিক উন্নত মানের সভ্যতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে চাইছেন।

চীনের আধুনিক কিছু বিষয়, যেমন দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে উনি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চীনের প্রতি ওনার দর্বলতা ছিল। সম্ভবত সমাজতান্ত্রিক আশ্রয় হিসাবে চীনকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন।

ভারত-চীন মৈত্রীর ব্যাপারে তো উনি ছাত্রাবস্থা থেকেই উৎসাহী ছিলেন। এমএ পড়ার সময় চীন ওনার উৎসাহের বিষয় ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন (১৯৩৮-১৯৪৩) বিষয়ে যে বইটি উনি লিখলেন তা ভারত-চীন মৈত্রীর ইতিহাসের আধুনিক যুগের এক ঐতিহাসিক দলিল। ভারত-চীন মৈত্রীর দীর্ঘ ইতিহাসের ভিত্তি অতীতে ছিল ধর্ম আর বাণিজ্য। আর মেডিকেল মিশন ছিল দুই দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বইটি উনি কোটনিস কমিটির সদস্যদের উৎসর্গ করেছিলেন। বইটি ইংরাজিতে অনুবাদ হওয়া উচিত। উনি চেয়েছিলেন করতে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তা আর করে যেতে পারেন নি। এমনকি আমাকে বলেছিলেন যে যদি অনুবাদ করি, তাহলে উনি দেখে দেবেন। যদি কেউ এ বিষয়ে কাজ করেন তাহলে অমলেন্দুবাবুর একটা অপূর্ণ ইচ্ছা বস্তবায়িত হবে।

বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভায় ডাঃ কোটনিসের প্রসঙ্গে উনি কোটনিসের জীবনের একটি বিষয়ে বহুবার জোর দিতেন। তা হলো, কোটনিস চীনে থাকার সময় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস গ্রন্থের সেই অংশটি বারবার পড়তেন যেখানে স্ট্যালিন গ্রিক পুরাকাহিনীর বীর অ্যান্টিউসের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন যে যতদিন অ্যান্টিউসের পা মাটিতে ছিল ততদিন তাকে কেউ হারাতে পারেনি, তেমনি কমিউনিস্টরা যতদিন জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ততদিন তারা অজেয় থাকবে। কোটনিসের এই ভালো লাগা অংশটি বলে অমলেন্দুবাবু আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণ-সংগঠনগুলিকে তার শিক্ষা নিতে বলতেন।

আমি যে কথাগুলো বললাম তার অনেকটা অংশ কোথাও লিখিত আকারে নেই। কিন্তু অমলেন্দু দে-কে ৩৫ বছর ধরে খুব কাছ থেকে দেখে, আলোচনা করে যা বুঝেছি তাই বললাম।

(৪ আগস্ট, ২০১৪ ইন্দুমতী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় পঠিত ভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ)

বিপন চন্দ্র : ১৯২৮-২০১৪

১৩১ পৃষ্ঠার পর

ইন্ডিয়া আফ্টার ইনডিপেন্ডেন্স প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁকে অনেকেই কংগ্রেসের তাঁবেদার ইতিহাসবিদ হিসেবে দেখতে শুরু করেন। বৌদ্ধিক অড্ডায় তাঁকে ব্যঙ্গ করে লেফট অফ সেন্টার অ্যান্ড সেন্টার অফ লেফট বলতেও শোনা গেছে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করার কারণ ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বিপনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা তাঁকে কেমন বিচলিত করেছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্পূর্ণ বিপ্লবের যে ডাক এসেছিল তাকেও তিনি ঐতিহাসিক হিসেবে কঠোর মূল্যায়নের মাপকাঠিতে এনেছেন, কারণ তার ফলে এদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির সংঘবদ্ধতা এসেছিল এই আন্দোলন সমর্থনের বিনিময়ে— বস্তুত *জেপি মুভমেন্ট এন্ড এমার্জেন্সি* গ্রন্থকে এমার্জেন্সি সমর্থনে বিপনের প্রয়াস ভাবাটা ভুলই হবে। এই বিষয়ে *ইন্ডিয়া আফ্টার ইনডিপেন্ডেন্স*-এর অষ্টাদশ পরিচ্ছদও প্রণিধানযোগ্য।

শেষ সময় পর্যন্ত তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে গেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর শিখ বিরোধী দাঙ্গা থেকে শিখদের বাঁচানোর জন্য ছাত্রদের সঙ্গে পথে নেমেছেন।

২০০৪ সাল থেকে বিপন ছিলেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান— পাঞ্জাবী ও পাহাড়ি ভাষায় রচিত সাহিত্যকে সারা দেশের মানুষের কাছে আনার জন্য তাঁর প্রয়াস লক্ষণীয়। অনুবাদ সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশের জন্য তিনি সাংগঠনিকভাবে প্রচুর কাজ করেছেন।

ভগৎ সিং-এর উপরে গবেষণা করেছিলেন তিনি, যা অপ্রকাশিত। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ভগৎ সিং-এর প্রচুর অপ্রকাশিত লেখা ছেপে বেরোয়, যার মধ্যে 'হোয়াই আই অ্যাম অ্যান এথিস্ট' উল্লেখযোগ্য।

শেষ করি কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার। ২০০৬-র প্রথম বসন্তে (বিপনের ভাষায়) বিপন এসেছিলেন মেদিনীপুরের প্রান্তে আমাদের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য ভূপেশ মুখার্জী স্মৃতি বক্তৃতামালায়। দায়িত্ব পড়েছিল তাঁকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়ার। ঐ আড়াই ঘণ্টার আলাপচারিতা দীর্ঘ হয়েছিল দুবার টায়ার পাংচারে। আজ বলতে পারি কিছুটা পুলকিতই হয়েছিলাম তাঁর সাথে বেশি সময় কাটাতে পারার সুবাদে। অনেক কৌতূহল ছিল রাস্তার দুপাশে গ্রাম বাংলা সম্পর্কে। অপারেশন বর্গা থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, মেয়ে পাচার— সব বিষয়েই জানতে চাইছিলেন। বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার ৩০ বছর নিয়ে কিছু লেখার কথা ভাবছেন— যা রয়ে গেল তাঁর ইচ্ছের মাঝারেই।